শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ।

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়"।

'আমি বিশ্ব-নাগরিক'

'এই বিশ্বই আমার স্বদেশ'

CALCUTTA

সম্পাদিকা—বেণু মিত্র

UJJWAL BHARAT

Form—IV

See Rule 8

1. Place of Publication	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, Calcutta-59 West Bengal
2. Periodicity of its publication	Bi-monthly.
3. Printer's Name	Bimal Kumar Chakravarty
Nationality	Indian
Address	Rabindra Pally P. O. Jaugra, 24 Pargs.
4. Publisher's Name	Bimal Kumar Chakravorty
Nationality	Indian
Address	Rabindra Pally P. O. Jaugra, 24 Pargs.
5. Editor's Name	Renu Mitra M. A.
Nationality	Indian
Address	Naranarayan Ashram P. O. Ashwininagar, Calcutta-59 West Bengal
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total Capital.	Naranarayan Ashram P. O. Aswininagar Calcutta-59 West Bengal

I. **Bimal Kumar Chakravarty**, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. **Bimal Kumar Chakravarty**

Signature of Publishe

উজ্জ্বলভারত

মাঘ-ফাল্গুন ১৮৮৩ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৭ | ত্রিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকা মাঘ ১৩৮৩ হইতে তাহার ৩০-তম বর্ষ আরম্ভ করিল। পূর্ণ যৌবনে যে যৌবন তাহার থাকা উচিত ছিল, উজ্জ্বলভারতের সে যৌবন আজ নাই—তবু সে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। আজ তাহার ৩০-তম বর্ষের যাত্রাপথে সে তাহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে এবং তাহার প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীনিতাই-গোপালদেবকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণতি জানাইতেছে; আর যে 'মানুষ'-এর কথা বলিতে এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই 'মানুষ'কে সে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে।

'উজ্জ্বলভারত' ক্ষীণকায় কেন? তাহার কারণ উজ্জ্বলভারত যাহা বলিতে চাহিতেছে তাহা কোন ঐকদেশিক চিন্তাধারা নয়—সমগ্র মানুষের সামগ্রিক চেতনা যাহা বাস্তবে দেখি, যাহা আদর্শে দেখিতে চাই, যাহা অতীতে মানুষ উপলব্ধি করিয়াছিল নানা রূপে নানা রসে, যাহা আজিকার মানুষ উপলব্ধি করিতেছে বা করিতে চায় নূতন ভাষায় নূতন পথে—বাস্তব আদর্শ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলাইয়া সকলের সকল উপলব্ধির যথা মান, ও যথা স্থান নির্দেশ করিয়া, সকলের মর্যাদাদানের মধ্যদিয়া সামঞ্জস্য আনিয়া যে একটি বিরাট ব্যাপক গভীর জীবন-চেতনা, তেমনই একটি সর্ব উপাধিমুক্ত সর্ব সংস্কারমুক্ত সামগ্রিক জীবন-চেতনা উজ্জ্বলভারত মানুষের কাছে উপস্থিত করিতে চাহিতেছে। এই কারণেই উজ্জ্বলভারত টিকিয়া আছে, আবার তাহার প্রচারও এই কারণেই সীমাবদ্ধ। তবু একথা সত্য—দিবালোকের মতই সত্য—যে, আজিকার মানুষ এই উপাধি-মুক্ত জীবন তাহার অন্তর দিয়া চায় যদিও জীবনের আচরণে আনিতে পারে না; সেখানে ঐকদেশিকতাই, যাহারই আর এক নাম যেন তাহার প্রিয়, তাহার আচার আচরণে চলাফেরা কথাবার্তার ছোট্ট পরিধিটুকুতে সে যেন নিজেকে ঘিরিয়া রাখিতেই ভালবাসে। এজন্য তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে—কিন্তু দ্বিধা নাই। তাই যে কারণে এই দীর্ঘ বৎসর উজ্জ্বলভারত জীবিত, সেই কারণেই সে সীমিত। তাই অপেক্ষা করিয়া আছি উজ্জ্বলভারত-প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীনিতাই-গোপাল কি ভাবে কোন্ পথে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠেন তাহারই উপর। সেই অপেক্ষা লইয়াই আবার এই ৩০-তম বর্ষে উজ্জ্বলভারত যাত্রা করিল।

উজ্জ্বলভারতের ব্যাপক গভীর সামগ্রিকতার চিত্রটি উদ্ভাসিত করিলে দেখা যাইবে ধনিকের গদীতে শ্রমিককে বসাইয়া, নরের গদীতে নারীকে বসাইয়া, কুলীনের গদীতে অকুলীনকে বসাইয়া, শিক্ষিতের গদীতে অশিক্ষিতকে বসাইয়া সে সমস্যার সমাধানের নামে অন্তহীন শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের

ব্যবস্থা দেয় নাই সে বলিয়াছে, আপাত বিরুদ্ধ ধর্মের এই ধর্মিত্ব প্রমিতির, সহস্র নারীর প্রভূত পরস্পর-বিরুদ্ধ-ছুইয়া ও বিপরীত পরিপূরক —ইহারা উহাতে মিলিয়া একটি সমগ্র সত্তা— প্রত্যেকে নিজের এই সমগ্র সত্তাকে প্রস্ফুটিত করিয়া অপরের সমগ্র সত্তার সহিত মিলিত হইবে—প্রতিটি অপর তাহার অপরার্ধ এই বুদ্ধিতে অপরকে দেখিবে—তাহা হইলেই ব্যক্তি ও সমাজ-মানুষের যে চিত্রটি ধরা পড়িবে তাহার মধ্যে মানুষের সভ্যতার এক নবতর রূপের সন্ধান মিলিবে। সেখানে সকলেই স্বাধীন, সকলেই মানুষে মানুষের সম্পর্কের এ হেন একটি অবস্থায় মানুষোচিত সর্বতুষ্টির—ধর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের—সুসমঞ্জস প্রকাশ-প্রচেষ্টাই আজি-কার দিনের সভ্যতা। উচ্চতর সেই সভ্যতাকে মানুষের কাছে উপস্থিত করিবার প্রচেষ্টা লইয়া নূতন বৎসরে নূতন করিয়া যাত্রা হইল। ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সকলকে ইহার সহযোগিতায় আগাইয়া আসিতে সে আবেদন জানাইতেছে। আর যাঁহারা ইহার স্রষ্টা ও প্রেরণা-দাতা সেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ও শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গকে পুনরায় প্রণাম জানাইয়া সে চলার পথে যাত্রা হইতেছে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের

দিনপঞ্জী

১৯৫৫

ঠাকুর যাহা কিছু পাইয়াছি সাধন করিয়া পাই নাই। বেদান্ত দর্শনের নূতন ভাষ্য, দুর্জয় সাহস, একটা নূতন কিছু বলিবার মত তেজস্বিতা, মত প্রকাশে নির্ভীকতা,—কিছুই সাধন করিয়া পাই নাই। আমার কথা আমি 'আমতা' 'আমতা' করিয়া বলি নাই, কাহারও দোহাই দিয়া বলি নাই, বলিয়াছি নিজের দায়িত্বে সকল রক্ত দিয়া। তাই মানুষ বলিত, আমি অহঙ্কারী। লবন আইন আন্দোলনের বার বরিশাল জেলে থাকাকালীন দুর্গা-মোহন সেন শীতল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার কথা বলিয়াছিলেন, 'শরৎ বাবু দাম্ভিকের মত কথা কন'। শীতলবাবু উত্তর দিয়াছিলেন 'দেখুন দুর্গামোহনবাবু শরৎ ঘোষ আমা হইতে বয়সে ছোট, বিদ্যায় ছোট, টাকায় ছোট, কুলে ছোট; তথাপি সে-ই নেতা, আমরা নই। সে যখন যাহা বলে সকল দেহ প্রাণ দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া বলে। তাই উহার অত জোর। সে জেলে আসার সময় আমার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, 'দাদা, আমি জেলে চলিলাম। আপনি রহিলেন আন্দোলন রহিল। তাই জেলে আসিয়াছি। শরৎ ঘোষের বক্তৃতার এক একটী লাইন অবলম্বন করিয়া অনেক কিছু বলা চলে'। আমি গীতার নূতন ভাষ্য বলিতাম, জগদীশবাবু স্নেহের সঙ্গে শুনিতেন। আমি তো তাহারও মুখ চাহিয়া কিছু

বলিতাম না। আমার ব্যাখ্যা ছিল স্বাধীন, সর্ব বিশেষ বিশেষ মত-নিরপেক্ষ। শাস্ত্রগ্রন্থের মত উদ্ধার করিয়া কিছু বলিতাম না। ঠাকুর, তোমার কৃপায় যে নূতন জিনিষ আমি পাইয়াছি, যে দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সকল জটিল ঘটনা face করিয়াছি তাহা কি কোন সাধন-সিদ্ধের থাকে? পণ্ডিত গণিয়া পাকেলি নাই ঘটনাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছি ঘটনা আমাকে বিব্রত করিতে পারে নাই, ঘটনার উপর দিয়া চলিয়াছি

ঠাকুর, শুধু তোমার, শুধু তোমারই শক্তি ইহার মধ্যে [illegible] সম্মুখে [illegible] পণ্ডিত [illegible] সামনে বেদান্তদর্শনের নূতন ভাষ্য [illegible] হীরেনবাবু বলিয়াছিলেন, 'বক্তৃতার মধ্যের ভিতর এক নূতন সৃষ্টি খুলিয়াছে'। সন্ধ্যার পর ক্ষিতীশবাবু ও সাহিত্যিকাবাবু আসেন মহানির্বাণ মঠের পাঠদ্বারা যে ঠাকুরের কোনও প্রতিষ্ঠা হয় না তাহা তাঁহাদের দিয়া বলি। ক্ষিতীশবাবু নাকি আগামী মহাষ্টমীর দিন গৈরিক ধারণ করিবেন মঠের সাধনহীনতার কথাও বলি। সমস্তদের বিষয়ে ইহারা পড়িয়াছেন। তুমুর চিঠি আসিয়াছে। তাহারা রবিবার দুপুরের পর আসিবে মহানবমীর দিনে নীরোদবাবুর পূজা দেখিতে যাইবার কথা চলিতেছে। ২১ শে অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার মত তাহাকেও দেখিতেছি না! সকলের কথা জানিনা। কিন্তু যাহাদের কথা জানি তাহাদের হইতে তুমি কত গভীর, কত ব্যাপক, কত সুন্দর। তোমার তুলনা নাই, তোমার দর্শন অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। এমন তোমার কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কেহ তোমার সঙ্গে লয় না। বড় কষ্ট কে তোমার দর্শন! অতীতের সম্পূর্ণ বিপ্লব ইহার মধ্যে; অথচ ইহাই অতীতের সার্থক পরিণতি। তুমি সর্ব ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইয়া রাখিয়াছ। ভারতীয় সংবিধান তোমারই ইঙ্গিতে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম-অধিকার স্বীকার করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দেশ ডিঙাইয়া গিয়াছে। 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি'—ইহার প্রতিবাদ রহিয়াছে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-স্বীকৃতির মধ্যে। কিন্তু এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা থাকে যদি তাহার অন্ধ চক্ষু মুক্তির চক্ষু পুরুষোত্তম-স্পর্শে খুলিয়া যায়, স্বামী-নির্বাচনের ক্ষমতা, পথ চলিবার মত অতীত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। নারী যদি সমগ্র দৃষ্টি লাভ না করে, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সব অধিকারের ফল কোথ করিবে কাপুরুষের দল, নারীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইবে। তুমিই একমাত্র পরিত্রাতা। তোমাড়া এই বিপদে রক্ষা করিবার কেহ নাই। কোন্ সন্ন্যাসী কোন্ দেশে আছেন যিনি স্ত্রীলোকের নিজ মঠে স্থান দিয়াছেন সমস্ত নিন্দাগ্লানি সহ্য করিয়া? তুমিই বৃন্দাবনের মদনমোহন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আকুল ভিতের শুধু ঠাকুরের সহ স্বামী প্রসন্ন সরকার আসেন প্রায় ১ ঘণ্টা আলোচনা হয়—সহ শিক্ষার সমস্যা, গিরি বাবুর, দার্শনিক বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ে কবিরাজ শৈলেশ সেন আসেন 'দেবদেবী'র উৎসবে যোগদান সম্ভব কিনা জানিবার জন্য। যাইব না বলিয়া দেই। সন্ধ্যার পর চন্দ্রবিহারীর শীতল ও একটি মেয়ে ও তাহার কিছু পরেই বি. কে. পাল আসেন। তাহাদের সঙ্গেও ২ ঘণ্টা

কথা হয়। আমি নিতাগোপাল-দাদের পড়িয়াছি। মানুষের কাছে তাঁহার দর্শন বলিয়া যাইতে পারিলে আমি দায়মুক্ত হই। 'ভাবকালি বেচিবারে আইলাম কাশীপুরে' ইত্যাদি। রমেন্দ্র ঘোষ আসে।... ললিত দত্ত আসেন। কুমারের ২ পুত্র আসে। তাহাদের জামা কিনিয়া দেওয়া হয়। বি সরযূকে ও রামলালকে কাপড় দেওয়া হয়। এবার আর যমুনাকে কুসুমকে কাপড় দেওয়া হইল না। অর্থাভাব। ২১ শে অক্টোবর

দুর্গাপূজা। মা, তুমি প্রাণশক্তি, বিশ্বের সমস্ত নারীসত্তার মাঝে তুমিই বিরাজিত তোমার কৃপায় সারা জীবন আমি নারীর মর্যাদার জন্য প্রাণপাত করিয়াছি। নারীই মূর্তিমতী ধন। এ-দেশের অধিকাংশ শাস্ত্র, মহাপুরুষ, সাধুগণ যেখানে নারীর বীভৎস রূপের ছবি আঁকিয়াছেন, সেখানে আমি ব্রতগ্রহণ করিয়াছিলাম পূজা করিবার। একটা কলমের আঁচড়ও তাহাদের বিরুদ্ধে দেই নাই, দিব না। আমার ব্রত যেন রক্ষিত হয়। নারী তো আমার জীবনে দিনকা মো চলী হাতকা বাঁধনী নয়। নারী যে আমার মোক্ষদা, জীবনের অগ্রগমনের পক্ষে সহায়িকা। কেউ আমাকে পিছনের দিকে টানে নাই। শৈশবে মায়ের স্পর্শ, পরে উমাঙ্গিনীর প্রাণস্পর্শ, পরে শত শত মেয়ের প্রাণ আমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। যেখানে সাধক নারী-ভয়ে ভীত, সেখানে আমি তোমার কৃপায় ভয়হীন। তোমার কৃপায় বুঝিতেছি একই পুরুষোত্তম-সত্তার এই দুই অর্দ্ধ (two halves), দুই-ই যে দুয়ের আত্মা। সাধারণের ধারণা প্রাণের কোনও অর্থগত মূল্য (economic value) নাই; কিন্তু আমি দেখিতেছি বুদ্ধিরই কোন পারমার্থিক অর্থনৈতিক মূল্য নাই। বুদ্ধিতে যে অর্থ আসে তা বিনশ্বর। প্রাণের টানে যে অর্থ আসে, তাহা অক্ষয়। বুদ্ধি 'অর্জন' করে, আর প্রাণের টানে অর্থ 'আসে'। এ দেশ যে 'স্বয়ং প্রসিদ্ধাতি'-র দেশ। প্রাণের কাছে অর্থের 'easy flow'—সহজ প্রবাহ। ইহাই pure. খাঁটি। বুদ্ধির আনা 'অর্থ' শোষণময়। ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি জীবন ভরিয়া। প্রাণস্পর্শ যদি থাকে, টাকার 'আসা' অব্যাহত ভাবে চলিবে। মা আমার, কামাখ্যা আমার, দুর্গা, তোমার জয় হউক। ফুলুরের আগ হইতেই বৃষ্টি নামে। নীলু ও পরিমল আসে আমি যখন খাইতে বসিয়াছি তখন। নাড়ু ও তরকারী আনে। ৩টার পর চিনু ও দাশরথি চৌধুরী (ভূতপূর্ব টাঙ্গাইল কংগ্রেসের সেক্রেটারী) আসে। চিনু ৫ টাকা তাহার মাহিয়ানা হইতে প্রণামী দেয়, দাশরথিবাবু তখন দেন ২ টাকা। পরিকল্পনার জন্য রসিদ বই নিয়া যান। মাস মাস কিছু দিবেন বলেন। সভার শেষ পর্যন্ত থাকেন। শীতল আসিয়াছিল। খুব বৃষ্টি সারা রাত্রি। চিনু একজন গ্রাহকের টাকা দেয় সুধাংশু পাঠে ছিল। ২৩ শে অক্টোবর

মা, তোমার আশীর্বাদে তোমার 'সর্বাত্মিকা' মূর্তি আমার জীবনে প্রকাশ করিয়াছ। একটা সমগ্রের লালসা ও তাহারই ছাঁচে সব গড়িবার উন্মাদনা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। যাহার সঙ্গে একদিনের মিত্রতা হয়, তাহাকেই আমার 'সমগ্রের ভিতর টানিয়া আনিয়া পাইতে চাই। একটা অনন্ত না-ছাড়ার মনোভাব গড়িয়া ওঠে। তখন যদি তাহারা আমাকে ছাড়িয়া যাইতেও চায়, আমার হয় নিদারুণ যন্ত্রণা। একটা সমগ্রতার

চাপ আমাকে ভোগ করিতে হয়। না পারি ভাঙিতে, না পারি ছাড়িতে। কি যন্ত্রণা দায়া-জীবন ভোগ করিতেছি, তুমি তাহা জান। যাহারা একদিন আসিয়াছিল, আজ আর নাই। তাহারা যে আজিও আমার ধ্যানের বিষয় তাহা কি তাহারা জানে? হয়তো তাহাদের প্রাণ জানে। আমার তো তাই মনে হয়। ইহাই সঙ্ঘ-গঠনের মূল সূত্র। হয়ত এই প্রাণ-সূত্র ধরিয়াই মানুষ একদিন এখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। তুমি সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপে তুষ্টিরূপে, কান্তিরূপে, শান্তিরূপে, বুদ্ধিরূপে আমার সকল প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তিতে; তোমাকে নমস্কার। আমার সকল বৃত্তিতে তুমি, তোমাকে নমস্কার। মা, এই বৎসর যেন তোমার পূজার মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া যাইতে পারি। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, বিজয়া মা আমার, তোমাকে সকল জীবন দিয়া বরণ করিব। তোমার জয় হউক। ১টার পর বৃষ্টির মধ্যে কালীচরণ সিংহ আসেন সন্দেশ লইয়া। 'কালীরমন', 'গিরিবাহী' আলো; চনা হয়। আমার পরিকল্পনা দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের কাছ হইতে অর্থ সংগ্রহের কথাই হয়। ৫টার মঠে যাই। ক্ষিতীশ নৈষ্ঠিক পরিধান করিয়াছে। শ্যামসুন্দরানন্দ, যগেশবাবু প্রভৃতির সামনে ঠাকুরের অবশ্যস্থাপী প্রতিষ্ঠার কথা ও মঠে ঠাকুরের গ্রন্থ পাঠ না হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পাঠ হওয়ার সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা করি। ক্ষিতীশ কাল এখানে প্রসাদ পাইবে। ললিত সরকার আসে। সকালে তব ও তাহার পুত্র আসে। সে ১০৲ টাকা পরিকল্পনা বাবদ আদায় করিয়া দিয়া যায়। রামগোপাল কয়েক দিন পূর্বে আসিয়াছিল। সে ২০৲ টাকা দিয়া গিয়াছে। ২৪শে অক্টোবর

মা, পরাবুদ্ধিরূপিণী. Creative intelligence (not calculating intelligence), তোমার কৃপায় প্রাণ-প্রজ্ঞার সমন্বয়-রস আস্বাদন করিতেছি। Abstract intellect (বুদ্ধি)-এর উপাস্য G. C. M. বায়ার ভিতর আছে মাত্র নির্বিশেষ একত্বের জ্ঞান, বিশ্লেষণের জন্য কোনও কুঠুরী নাই। কিন্তু হৃদয় L. C. M.-এর উপাসক বলিয়া উহার ভিতর আছে অনন্ত বিশ্লেষণের জন্য পৃথক পৃথক কুঠুরী, অথচ নির্বিশেষ একত্বের জ্ঞানও সেখানে আছে। আমি ইহা উপলব্ধি করিতেছি। আমার জীবনের সঙ্গে যাহারা যুক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক স্থান রহিয়াছে। প্রত্যেককে সেই সেই হৃদয়ের চাবি আমি দিয়াছিলাম সেখানে দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য। কেহ কাহারও মত নহে, তাই পৃথক পৃথক মন্দির। আমার হৃদয়ে এইরূপ কত মন্দির রহিয়াছে! যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের মন্দির তাহাদের জন্য আজিও আছে, তবে রুদ্ধদ্বার। তাহারা চাবি লইয়া গিয়াছে! সুধা চলিয়া যাইবার জন্য একদিন ঘুমের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া জাগিয়া পড়িলাম মনে হইতেছিল, সুধা আমার মন্দিরের চাবি লইয়া গিয়াছে। বলিতে-ছিলাম, সুধা, পূজারিণী আমার, আমার ঠাকুরের মন্দির কে রুদ্ধ করিল, তোমার চাবি? কে উহা খুলিবে? অনেক পূজারী পূজারিণী জীবনে আসিয়াছিল, প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্দিরের চাবি দিয়াছিলাম। কত চলিয়া গিয়াছে, কিছু কিছু আছে। কি বেদনার আছি, কামাখ্যা, প্রেমময়ী মা আমার, তুমি জান। রাজরাজেশ্বরী আমার, হৃদয়ের সকল মন্দিরে তুমি প্রতিষ্ঠিত

হও। পরিমল আসে। ··কুমার কুসুম যমুনা বাগুইআটি যায় ২।০ টায় পর, ফেরে প্রায় রাত ১০।০ টায়। প্রতিমল প্রতিভা মঠে যায় ৩।০ টায়। সত্যব্রত সাবিত্রী আসে সন্ধ্যার পর। বলদেবাবাদের জায়গায় সেবায়েত করিয়া দিবার কথা ঠিক হয়। সন্ধ্যায় সুর্য সেন আসে, রমেন্দ্রও। পরিমলের কাছে ঠাকুর সম্বন্ধে বাবার উক্তি 'যেই কালাচাঁদ সেই নিতাগোপাল, যেই নিতাগোপাল সেই কালাচাঁদ' ও ঠাকুরের বিশ্ব-খণ্ডেরা, নিতাগোপাল বড় প্রত্যক্ষ দেবতা প্রভৃতি আলোচনা করি। আমি যে ঠাকুরকে রহস্য করিয়া বলিয়াছি তাহা বলি। ঠাকুর ও আমাকে এক করিয়া দেখিতে বলি। রাত্রিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে একটা সিঁড়ি বাদ দিয়া আছাড় খাই। বেশী ব্যথা পাই নাই।

২৫শে অক্টোবর

বিজয়া দশমী। মা, তোমার ভাবে ভাবিত শ্রীনিতাগোপাল-কৃপা জীবনের প্রতি স্তরে উপলব্ধি করি। বিজয় আমার জীবনে নিত্য বিরাজিত। সংগ্রামে আমি জয়ই লাভ করিয়াছি। সব ঘটনাকে পরাজয় করিয়া ঘটনার ভর্তা হইয়াছি। সঙ্গে ছিল ভাবদৈবত সিদ্ধি, ক্রিয়াদৈবত সিদ্ধি, দ্রব্যাদৈবত সিদ্ধি। সাধনা আমার করা হয় নাই। সর্ব সিদ্ধিদাতা গণেশের কৃপায় আমি সর্বসিদ্ধি অনায়াসেই লাভ করিয়াছি। শাস্ত্রের মর্মে সহজ দৃষ্টি লাভ করিয়াছি। তোমার কৃপায় বহু শাস্ত্রের প্রবেশদ্বার তাঁহাদের আশীর্বাদে খুঁজিতে সক্ষম হইয়াছি, যুগোপযোগী তাঁহাদের রূপের খবর পাইয়াছি। সর্ব মত, সর্ব দেবদেবী, সর্ব তত্ত্ব আমার কাছে সমন্বিত মূর্তিতে উদ্ভাসিত। একি জয় বিজয়! তুমিই বিজয়া, শ্রীনিতাগোপাল আমার বিজয় মূর্তি। বিজয়া আমার জীবনের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করুন। আমি সংসার-বিজয়ী, সন্ন্যাস-বিজয়ী, ইহলোক-বিজয়ী, পরলোক-বিজয়ী, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিজয়ী। আমি মাতৃস্নেহে আপ্লাবিত, শ্রীনিতাগোপাল-স্নেহে নিতুই নব নব রসে সঞ্জীবিত। আমি নিত্য বিজয়ার সন্তান, যখন যে ক্ষেত্রে বিবদন করিয়াছি, বিজয়ীর বেশে বিচরণ করিয়াছি। আমি কখনও হারি নাই। যাহা ভাঙিয়াছি তাহা আবার গড়িয়াছি। আজও বাঙ্গালাকে নিয়া ঠেলাঠেলি করিবার মত শক্তি বুকের ভিতর অনুভব করি। মা, মা বিজয়া, আশীর্বাদ কর। রাবণ বিজয় করিব, মধু-কৈটভ-মহিষাসুর-শুম্ভনিশুম্ভ বিজয় করিয়া ধরার বুকে পুরুষোত্তম-রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য আমি বদ্ধ-পরিকর। তোমার জয় হউক। সকল সমস্যার সমাধান-মূর্তি শ্রীনিতাগোপালকে যখন পাইয়াছি, তখন সকল সমস্যা আমার শিছনে পড়িয়াছে। আমি সর্ব সমস্যা বিজয়ী। তোমায় নমস্কার। প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লেখা আমার জীবনে তোমার বিজয়ামূর্তির ঘন আশীর্বাদ, চরম বিজয়। বিজয়া বিজয়া বিজয়া।···সন্ধ্যায়-যাত্রা করি। সুরেন ঘোষ সুধীর ব্যানার্জী প্রভৃতি আসে দেখা করিতে। এবার আর জয়া-হরিদাসী আসিল না। যতক্ষণ উপরে প্রার্থনা করি, রেণু নীচে পায়েস দিয়াছে, পরে আসে। চিনু নীলু ১০টার পর আসে।

২৬শে অক্টোবর

মা দুর্গা, ১৩১২ সনের ১০ই অগ্রহায়ণ (৫০ বৎসর পূর্বে) তোমার মন্ত্র শ্রীনিতাগোপাল-জীবন হইতে পাইয়াছিলাম। এত বৎসর ধরিয়া তোমার মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী রূপের অর্চনা

প্রাণ ঢালিয়া বুকের রক্ত দিয়া করিয়াছি। মহাকালীর অর্চনায় পাইয়াছি মধু-কৈটভ অসুর, অর্থাৎ অতীতের সু ও কু সংস্কার হইতে মুক্তি, নূতন পুরুষোত্তম-জীবন আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। সংসার-সংস্কার, সন্ন্যাস-সংস্কার, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রচলিত সংস্কার, আস্তিকতা-নাস্তিকতা, দ্বৈত অদ্বৈতের সংস্কার-মুক্তি আমার হইয়াছে। মহালক্ষ্মীর অর্চনায় লাভ করিয়াছি সর্বাত্মিকা তোমার স্পর্শ, সকলকে লইয়া পুষ্টি তুষ্টি লাভের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। সকলের মুক্তিই আমার মুক্তি, সকলের স্বার্থই আমার স্বার্থ। মহা সরস্বতীর অর্চনায় লাভ করিয়াছি, শিবোঽহম্-হংস আস্বাদন ও 'যো মাং অভিতি'র পূর্ণ আস্বাদন। তারপর লভিয়াছি বিজয়ার স্নেহ-আলিঙ্গন। আজ আমি আবার নূতন করিয়া বিজয়যাত্রা করিব 'উজ্জ্বল ভারত' গঠনের জন্য। যাহারা একদিন ছিলেন, যাহারা আজ আছেন এবং যাহারা আসিবেন, তাহাদের বুকে লইয়া এই যাত্রা করিব। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য আমার হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ কোঠা রহিয়াছে। হয়ত 'মণি যে ন চাহং দ্বেষু অবস্থিতঃ'। সকলের জন্য অপেক্ষা আমি চির জীবন করিব। আমার এই 'বিজয়' যাহারা রক্ত সম্পর্কে আছেন এবং যাহারা ভাবের সম্পর্কে আছেন তাহাদের সকলের হউক— এই প্রার্থনা কাল 'যাত্রা' করিবার সময় বলিয়াছি। মা, তোমার জয় হউক। 'নিবেদিতা-র কিছুটা পাঠ রেণু করে। রেণু ও আমি বাহির হই ৩।০ টার পর। রেণু প্রিয়রঞ্জন ও সুহৃৎ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া মঠ হইয়া ফেরে। আমি মঠে যাই, আমি একাই ফিরি। কুসুমের সঙ্গে রেণুর অনেক কথা হয় কুসুমের এখানে না আসার সম্পর্কে। মঠ হইতে ফিরিয়া দেখি বাসন্তী ও তাহার দুই পুত্র আসিয়াছে। কুয়াশের সঙ্গে আমার দীর্ঘ কথা হয় তাহার আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে। সে দেহ ও মন দিয়া আমার জীবনে একাত্ম না হওয়ার ফলে সে আজ ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। এখন তাহার হরিদ্বারের দিকে চেষ্টা করা উচিত। এখানের দুয়ার খোলা রহিল। রেণু ৯।০ টায় শঙ্খ লি সাহার ওখানে যায়। ডাক্তার Sabal Serrulata 12 ব্যবস্থা করেন। বসন্ত ঘটকের পুত্র অজিত ঘটক সন্ন্যাস পত্র আসে। দীক্ষার পর গুরুর 'আত্মদর্শন' করানোর ফলে তাহার সংসারও গেল না, আত্মাও পাইল না। সে আজ কিছুই করিতে পারিতেছে না। আমার কাছে আসিতে বলিলাম। ২৭শে অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার কি ইচ্ছা জানি না। বৃন্দাবনে শান্তিকে প্রথম আমি দীক্ষা দেই। তোমার প্রচারের সহায়িকারূপে তাহাকে জীবনে তুলিয়া লই। গীতা শিখাই আমার পূর্ব পর্যন্ত। সমস্ত বই শেষ করিয়া দেই। তাহাকে আশ্রয় করিয়া তোমার প্রতিষ্ঠার কল্পনা করি। সেদিন কোথায় ছিল সুধাংশু প্রতিভা কুসুম রেণু প্রভৃতি। ১৫ বৎসর শান্তির খোঁজ ছিল না। আমি খুঁজিয়াছি, তাহার প্রতীক্ষায় আজিও আছি। আমার জীবনে তাহার প্রথম আসন পাতা রহিয়াছে। সন্ধ্যের সে-ই প্রথম শুরু হইতে পারিত। কাহাকেও তো সমস্ত গীতা পড়ানো হয় নাই। উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী পড়াইয়াছি। আজ কোথায় সে? তাহার সুখ দুঃখ সবই তাহার। আমি তো তাহা কল্পনা করি নাই। সে আমার সঙ্গে সমভাগী হইবে

ইহাই তো চাহিয়াছিলাম। কাল সে এক চিঠি দিয়াছে। তাহার মা-ও দিয়াছেন। তাহার মা (মোহিত কুমারী) অবশ্য ইতঃপূর্বেও চিঠি দিয়াছেন। শান্তির অভিযোগের সুর, অভিমানের সুর। আমি তাহাকে দূরে রাখিয়া শান্তি পাই নাই। বুকের কাছে থাকিলেই শান্তি পাইতাম, আজিও পাই। কি করি করিতে পারি? প্রাকৃতিক-বিধান যতদিন না আসে, অপেক্ষার থাকিব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। আমার নিতাগোপাল-প্রতিষ্ঠা আজিও হয় নাই। শান্তি, তোমার অপেক্ষা আমি এতদিন করিয়াছি, আর আমার বেশী দেরী নাই। যদি আসিবার প্রয়োজন থাকে, সময় চাহিয়া থাকে, আসিও। আদরেই গ্রহণ করিব। অতীতের কথা, ২৫ বৎসরের কথা তুলিব না। আগে যেমন ছিলে, তেমনি আমি লইব। আমি সেদিন যাহা ছিলাম, আজও আমি তেমনি আছি। নিতাগোপাল অন্তর্যুক্ত হউন। বেণু আনন্দবাজার ও যুগান্তরে রবিবারের সভার বিজ্ঞাপন ছাপিবার জন্য দিয়া আসে। হরিদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করে। সন্ধ্যার পর বীরেশ গুহ, জিতেন, বীরেন আসে। তাহার পর আসে হরিদাসী, জয়া ও দেবু। মিষ্টি নিয়া আসে, ১৲ টাকা দেয়। সকালে চিত্রাঙ্গী, তাহার বাবা ও অভি-মুন্টু আসে। মুন্টু থাকিয়া যায়। কাল বিকালে যাইবে। শুধু খাইয়া বৈকালে বোধহয় একটু ভাল ছিলাম। 'সাধনা কি পরিমাণগত (quantitative), না গুণগত (qualitative)?' দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া ইচ্ছা করি। চিদানন্দ সকালে আসিয়াছিল। বীরেন ডাক্তার সকালে আসে। বীরেন ব্যানার্জী আসেন। ২৮শে অক্টোবর

ঠাকুর, বৃন্দাবনেই প্রথম মেয়েদিগকে লইয়া সঙ্ঘ গড়িবার প্রেরণা লাভ করি। বৃন্দাবন নারীদের মর্যাদাদানের ক্ষেত্র। 'জয় রাধে' ধ্বনি-দ্বারা মুখরিত ব্রজধাম। মেয়েরা প্রাণপ্রধান বলিয়া প্রজ্ঞাপ্রধান সমাজে 'ন স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি'। স্বাতন্ত্র্যের অনধিকারী চক্ষুরাদ্ধ ফলে তাহারা কোণঠেসা। এই নারীশক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম। তিনিই প্রকৃতি-পুরুষকে, নারী-নরকে সম মর্যাদার সম আসনে সমকক্ষতায় স্থাপন করিয়াছেন। তাই আমি স্বরাজ-আন্দোলনে মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতাম, 'মা, স্বরাজ যেন মেয়েদের হাত দিয়া আসে'। তাহা হইলে মেয়েরাও পুরুষের সম স্তরে আসিয়া দাঁড়াইবে। তাই মেয়েদের আমি পথে নামাইয়াছিলাম, রাজনীতিতে সমান অংশ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাদের দ্বারা হাটবারের দিন চরকাজাত পর্যন্ত পিকেটিং করাইয়াছি। উষাঙ্গিনীকে রাজনীতিতেও সাধনার অর্ধাঙ্গিনী করিয়াছিলাম, মেয়েদের জেলে পাঠাইয়াছি। ১৯৩০-এর লবন আইন অমান্যের সময় আমরা যে ২৫ জন মুক্তাকাল্পুর সল্ট-বেডে যাইবার পথে লবন আইন ভঙ্গ করিয়া যাইতেছিলাম, তাহাদের মধ্যে উষাঙ্গিনী ও নিতাম্বরিনী ছিল, হরপ্রসন্ন কলের স্ত্রীও ছিল। শান্তিকে লইয়াই প্রথম এই সঙ্ঘ-রচনার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। কোথায় সে আজ? মেয়েরা 'দায়' বলিয়া নিন্দিত। অথচ তাহাদের পথেই ভগবানের সহিত ভাবাদ্বৈতসিদ্ধি, ক্রিয়াদ্বৈত-সিদ্ধি, দ্রব্যাদ্বৈতসিদ্ধি লাভ সহজ। তাহাদের প্রাণশক্তিকে যদি কেহ সুপরিচালিত করিতে পারে, তবে তাহারাই শক্তিশালী সঙ্ঘ রচনা করিতে পারে। তাই নারী-সঙ্ঘ রচনার লোভ

আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ঠাকুর, আমার স্বপ্ন বাস্তব হউক, সফল হউক। মায়া-ভব আসে, ২৲ টাকা দেয়, মিষ্টি আনে। ঠাকুরের কথা বলি। যেণু হরিদাসবাবুর, নলিনীবাবুর বাসায় যায়। মিনুর ইনভেলাপ আসে বিভূতির প্রণাম জানাইয়া। প্রেসের ৩জন কর্মচারী আসে সকাল ১০টার পর। বৈকালে আশা বিনয় পুলিন আসে। সন্ধ্যায় ইন্দুলেখা আসে মিষ্টি সহ। তাহার কাছে 'নিবেদিতা' হইতে কিছু পড়িয়া শোনান হয়। হরেন্দ্র আসে। সকালে বীরেন মজুমদার (চাকুরিয়া) আসেন। ৬ মাসের গ্রাহক হইয়া ১ টাকা দেন। শীতলবাবু গীতাপাঠ বিষয়ের নিন্দা করেন সে সম্বন্ধে আমার কথা স্পষ্ট ভাবে বলি।

২৯শে অক্টোবর

ঠাকুর, তোমার 'ময়ি তে' (আমাতে তাহারা)-বাণীই জীবের নিশ্চিন্ত হইবার একমাত্র মন্ত্র। তোমার মনে যখন আমি স্বতঃসিদ্ধরূপে আছি (fact), তখন ইহাকে task রূপে বুঝিবার যোগ্যতাও নিশ্চয়ই আছে। নিজের দিকে চাহিয়াও তোমার বাণী অনুমান করিতে পারি। আমার মত স্বল্প অধিকারীরই যখন নিজ জীবনের মধ্যে আমার সম্পর্কে আগত মানুষগুলির জন্য আসন পাতা রহিয়াছে, যখন আমি বুকের ভিতর তাহাদের পাইতেছি এবং বাহিরে পাইবার জন্য টা-টা করি, তখন তোমার অগাধ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের মধ্যে যে এই বিশ্ব কেমন করিয়া আসন পাতিয়া কায়েম হইয়া বসিবার অধিকার পাইয়াছে, তাহা ভাবিলে বুক সাহসে, নিশ্চিন্ততায়, উৎসাহে, আনন্দে নাচিয়া উঠে। আমি তোমার জীবনে আছি ইহা হইতে সত্য কি আর হইতে পারে? আমি তোমার বুকে আছি, তোমার বিশ্বে থাকিব, আমার বুকে তোমাকে পাইব, আমার বুকে বিশ্বকে পাইব, অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, স্থূলে অস্থূলে, অণুতে অণুতে পাইব, অন্তর বাহিরের, অন্তর্মুখী বহির্মুখীর দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া সহজ হইব। একান্ত অন্তর লইয়া থাকিলে বাহির থাকে উপবাসী, সে তখন দ্বন্দ্বের, সমস্যার সৃষ্টি করে। আবার বাহির লইয়া থাকিলেও অন্তরে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই ভাবে অন্তর-বাহির সমন্বয়দ্বারা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বিশ্বজনীন দ্বন্দ্বের হাত হইতে মুক্তি মেলে। এখানেই তো সমাধান। শরণাগতি ছাড়া অন্তর বাহির সমন্বয় সম্ভব নয়। অহঙ্কার হইতে রওয়ানা হইলে হয় অন্তর, নয় বাহির লইয়া থাকিতেই হইবে। অন্তর্দ্বন্দ্ব তাই অনিবার্য। তোমাময় হইব। ৫টা—৭।০টা পাঠ হয়। ললিত সরকার গান করেন। অজিত ঘটক ও বিনোদবাবু উপস্থিত ছিল। নীলরতনবাবু আসেন। ৯টার পর যান। কেমন করিয়া বরিশালের বেণ্ডারা আমায় ভালবাসিতেন, কি শ্রদ্ধার চোখে আমি দেখিতাম, ঠাকুরের কৃপায় নিদর্শনরূপ বাবার দিবা অবস্থার উল্লেখ করি। আরও কত কথা বলি। মঠ হইতে ফুল নিয়া আসে কুমার। ঠাকুরকে মালা করিয়া দেওয়া হয়। শ্রোতাদের মাড়ু দেওয়া হয়। ৩০শে অক্টোবর

ঠাকুর, সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হইবার দুঃসাহস, লোভ ও আনন্দ তোমার স্পর্শে আমার জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তোমার পাদস্পর্শ করিয়াছে ঘরের বধূগণ, দানীবাবুর অসুখ ও তাহার কন্যা খুশীও করিয়াছে। অথচ সে স্পর্শ তোমার পায়ে সিং মাছের মত কাঁটা বিদ্ধ করে

নাই। ··বেশ্যাদের 'বাজারে মা' বলিয়া অভিহিত করিতাম, তাহাদের উপর একটা গভীর শ্রদ্ধা আমার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল—'শ্রদ্ধা আবিবেশ'। একদিন আমি ও নিতাইবাবু 'জনা' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সে আজ অনেক বৎসরের কথা। 'জনা' তেমন ভাল লাগিল না। ইহার পর একটা কমিক। চুপ দিন উঠিলে দেখিলাম একদল সুসজ্জিতা মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে। আর আমি যাই কোথায়! সবেমাত্র বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছি। বৃন্দাবনের রাসনৃত্যের স্ফুরণ হইল। আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। শ্রোতারা বিব্রত হইলেন। নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? নিতাইবাবু বলিলেন, লোকটার মাথা খারাপ, এই রকম মাঝে মাঝে হয়। ইহার পর কোন রকমে উঠিয়া চলিয়া আসি। নিতাইবাবু বলেন, আর তোমাকে নিয়া আসিব না। শেষে কি তোমার জন্য আমি মার খাইব? বাজারে মা'দের উপর শ্রদ্ধা আরও বাড়িল। আর একদিন রাত ১১/১২ টার মধ্যে সোনাগাছির মধ্য দিয়া বন্ধু প্রসন্ন কবিরাজের কলেরার খবর পাইয়া দেখিতে যাই। কোনও বাড়ীতে বাজারে মা'দের নৃত্য-গীত-নূপুর-ধ্বনি হইতেছিল। আমি আধ ঘণ্টা যাবৎ মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। ব্রজের স্ফুরণ। শ্রদ্ধা আরও বাড়িল। অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালে ও বরিশালের বাহিরে সর্বত্র উহাদের সঙ্গে সভায় মিলিত হইয়াছি। জগন্নাথের পবিত্র আন্দোলনে যুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছি। বরিশালে উহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করিয়াছি, অর্থসংগ্রহ করিয়াছি। তোমার কৃপা জয়যুক্ত হউক। বৈকালে অজিত আসে। ৮টায় বিমলা আসে মিষ্টি লইয়া, ৫ টাকা পরিচালনা বাবদ দেয়। সারাদিন আজ আলোচনা করি। আত্মসমর্পণের 'মাত্রা' আছে। ঘটনা যেখানে সরল, সেখানে চালকা শরণাগতি ও একান্ততা চলে; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্যা সমাধান করিতে প্রয়োজন হয় পুরুষোত্তম-জীবনে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। আমার এখানে জটিলতম সমস্যা সমাধানের জন্য আসা। কাজেই চাই শরণাগতির intense রূপ। কুমারের যাওয়া স্থির। এবারেও তাহার থাকা হইল না। আরও একান্ততা চাই। ৩১শে অক্টোবর

ঠাকুর, বরিশালের বারনারীদের বাড়ীতে আমি ভিক্ষার (কংগ্রেসের টাকা আদায়) ছলে জগন্নাথ, পতিতপাবন, অনাথের নাথ, 'কেহ নাই যাহাদের তাহাদের' আশ্রয় তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতাম। তুমি ছাড়া তাহাদের কে কোলে তুলিয়া লইবে? তবে আমি একাই যাইতাম, কোনও স্বেচ্ছাসেবক যাইত না। সেখানে আমার অবাধ গতিবিধি ছিল। তাহাদের মধ্যে ভাগবত পাঠ করিয়াছি। সমাজ তাহাদের ঘৃণা করে। আমি তাহাদের সমাজের সঙ্গে সভাসমিতিতে মিশিতে দিতাম না। বলিতাম, 'আমি বরিশালের শ্রদ্ধার পাত্র। আমি তোমাদের কাছে আসিব। যাহারা তোমাদের ঘৃণা করে, কেন তাহাদের সঙ্গে মিশিবে?' মহাত্মাজী যখন বরিশালে যান তখন একদল 'কেন আমি উহাদের কাছ হইতে কংগ্রেসের জন্য টাকা, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করি' এই অভিযোগ করিলে তাহার উত্তরে আমি বলি যে, মহাত্মাজী, তোমার আন্দোলন জগন্নাথের আন্দোলন; ইহারা

জগতের বাহিরে নয়। ৪ লক্ষ মানুষ ছাড়িয়া তোমার স্বরাজ হইবে কি'? মহাত্মাজী হাসিলেন। ঠাকুর, তোমার স্পর্শে আমি নির্ভীক। আমি সকলের মধ্যে তোমার আস্বাদন করিব। ইহারাও আমাকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। যেদিন প্রথমবার আমি বরিশালে কারা বরণ করি, জেলের দরজায় বরিশালের সহস্র সহস্র নরনারী ভাঙ্গিয়া পড়ে, ইহারা আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। 'বাবা, তোমাকে জেলে যাইতে দিব না'। জনসাধারণের মধ্যে কি বিপুল উত্তেজনা। বুঝি বা তাহারা আমাকে ছিনাইয়া লইবে। Armed পুলিশ সেখানে প্রচুর। কোনও সঙ্ঘর্ষ না হয় তাই আমি পুলিশ সাহেবকে অনুরোধ করিলাম যাহাতে পুলিশদিগকে সরাইয়া নেয়। কোনও গোলমাল হইবে না বলায় তিনি সরাইয়া লইয়া গেলেন। জেলার ভয়ে দুয়ার খুলিতেছেন না পাছে সহস্র লোক জেলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। আমি অভয় দেওয়ায় গেট খুলিলেন, আমি বিজয়ীর মত জেলে প্রবেশ করিলাম। বাহিরে চীৎকারের রোল ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠিল। একে বলে বিজয়। সকালে অজিত ঘটক ও অজিত চক্রবর্তি আসে। তাই কটু কথা বলিয়াছে। কি করিবে আসিতে আসে। মহিম ডাক্তার স্ত্রীটের খুকুরাণী, মনু ও সুধীরজনের স্ত্রী আসে। প্রেমে অগ্রহায়ণের কপি দেওয়া হয়। ললিত সহকার আসে। রেণুপদ আসে। রামকৃষ্ণ-মিশন করে দারীরিক রোগার্তদের সেবা, নিতাগোপাল-মিশন করিবে মানসিক রোগীদের সেবা। ১লা নভেম্বর

ঠাকুর, অজিত ঘটককে লইয়া, আমার আবার এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি তো ডাকি নাই। সে নিজে আসিয়া শরণাগত হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি তোমার কাছে উহার সমাধান আছে। তুমি ইহাকে সুস্থ কর। প্রতিভাও এমনি একদিন গুরুচরণগত সমস্যা লইয়া আসিয়াছিল। তাহার শান্তি মিলিয়াছে। অজিত আত্মা অনাত্মার দ্বন্দ্বে পীড়িত। আত্ম-দর্শনের নেশায় সে অনাত্মার সহিত স্পর্শ খোয়াইয়াছে। ফলে বিকৃত অনাত্মা—স্ত্রীকন্যাসংসার—সব মিলিয়া বাসা-বাড়ির রাস্তার লোকেদের কথা যেন তাহাকেই ইঙ্গিত করিয়া বলা হয়। বাহিরের সব কিছু ভূতপ্রেতের মত বিভীষিকার কারণ হইয়াছে। সে ঘরে একরকম থাকে, বাহির তাহার কাছে ভয়ের বস্তু। কোনও কাজে মন দিতে পারে না, ভিতরে সে ঢুকিয়া যায়। এই অন্তর বাহির বিরোধ তাহাকে পীড়া দিতেছে। সাংসারিক কর্তব্য-বোধ তাহার আছে, সে স্ত্রীকন্যার ভরণপোষণ করিতে চায়। অথচ রাখিতেও পারে না, ছাড়িতেও পারে না। কর্ম করিতে গিয়া সে পারে না। তাহাকে জড় অজড় সমন্বয়, আত্মা অনাত্মার সমন্বয়ের কথা শুনাইতেছি। ৩ বৎসর হইল সে বেকার মা-ভাই-স্ত্রী-পুত্র আজ কিপ্ত। কাল সকালে ছোট ভাই, যে তাহার স্ত্রী, কন্যার ভরণপোষণের জন্য ১০০ টাকা দেয়, সে কটু কি করিয়াছে। কাল সকালে বেদনা পাইয়া অজিত তাহার শ্যালক অজিত চক্রবর্তী সহ আসে। তাহার উপর বিধিষ্ট না হইয়া যাইতে বলি। তাহাকে Kali Phos 6× খাইতে বলি। আমার কাছে আসিতে বলি। একটা

প্রাণপূর্ণ আবেষ্টন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাইত ওখানে খাওয়া বন্ধ হইলে আমি লিখ বলিয়াছি। ঠাকুর, তুমি সুস্থ কর। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতে চাহে। ঠাকুর, তুমি আসিয়াছ মানসিক রোগাতুরদের সেবা করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ হইতে পাইবে দৈহিক রোগীরা ঔষধ ও পথ্য। তুমি দিবে মানসিক রোগের ঔষধ ও পথ্য। অজিতকে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' পড়িতে দেই। পরে রেণুর সমালোচনা পড়িবে। আগের বারের উজ্জলভারত হইতে 'ছোটর মূল্য' প্রবন্ধ নকল করিতে দেই। তাহার সঙ্গে ৭.৮ ঘণ্টা তাহার মনস্তত্ত্বের কোথায় কোথায় গলদ তাহা আলোচনা করি। সে তাহার বাসাতেই খায় ও শোয়। ঔষধ টাকা ২টী এখানে রেণুর কাছে। Nat Mur 30 x একবার ও Kali Phos 6 x দুইবার তাহাকে দেই। তাহাকে সুস্থ করিয়া দিতে পারিলে আমি দায়মুক্ত হই। ঠাকুর, তুমি তাই কর। ১০টার গাড়ীতে মীরা ও মাখন পালের স্ত্রী আসে। রেণু একবার বাহির হয়। স্ত্রী যেমন করিয়া স্বামী-বরণের পর লোহার সিন্দুকের চাবি পায়, ভক্তও তেমন করিয়াই ভগবানের কাছ হইতে সব পায়। ২রা নভেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন 'মরি তে তেরু চাপাহম্' তোমার এই বাণীর সাধনা করিয়াছি। আমার সব কিছু আমার আপন জনদের দিতে এবং তাহাদের সব কিছু দায়িত্ব পর্যন্ত নিজে নিতে প্রাণপণ করিয়াছি। আমি বলিতে চাহিয়াছি 'নাহং নাহং তুহু তুহু'। কিন্তু তাহারা তো তাহা বলিতে পারে নাই। আমি নিজকে তাহাদের মধ্যে হারাইতে চাহিয়াছি, তাহারা তাহা চাহে নাই। আমার উপাসনা 'মমস্তভ্যং নমো মহ্যম্ তুভ্যং মহ্যম্ নমো নমঃ'। তাহারা আমার জীবনে বিশ্রাম করুক, আমি তাহাদের মধ্যে বিশ্রাম করি— ইহাই তো ছিল সাধ। দো-ওয়ক্তা বুঝি আর হইল না। তাহাদিগকে আমার বুকে করিয়াই হয়ত: চলিয়া যাইব। তাহাদের বুকের মধ্যে আমাকে হয়ত তাহারা রাখিবে না। মানুষ লইয়া এত ঠেলাঠেলি কে করিয়াছে জানিনা, আমি করিলাম। আমার দায়িত্ব তাহারা বহিবে, আমি তাহাদের দায়িত্ব বহন করিব— ইহার জন্য কি ঝগড়াই না করিলাম! প্রফেঃ এন্ এন্ ঘোষ Ethics পড়াইতেন। একদিন ক্লাসে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেখ, তোমার একটী রসগোল্লা আছে, আমার একটী রসগোল্লা আছে। আমারটি আমি খাইলাম, তোমারটি তুমি খাইলে; কিম্বা তোমারটী আমায় দিলে আমি তাহা খাইলাম, আমারটি তোমাকে দিলাম তুমি তাহা খাইলে। প্রথম বারেও আমরা একটী রসগোল্লা খাইলাম, পরের বারেও খাইলাম। এই দুইবার একটী করিয়া রসগোল্লা খাওয়া কি একই খাওয়া?' না, আকাশ পাতাল তফাৎ। বিনিময় খাওয়ার ভিতর দিয়াই সত্য বাস্তব অদ্বৈতাস্বাদন হয়। পূর্বের বারের অদ্বৈত স্বার্থপরতাপূর্ণ, দ্বিতীয়বারের অদ্বৈত প্রেম পরিপূর্ণ। দুই মালা বদল করিয়া এক হইবে ইহাই না ঠাকুর, তোমার প্রকৃত অদ্বৈতবাদ? ইহাই আমি সারা জীবন চাহিলাম। অজিতের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বন করিয়া মিথ্যাজ্ঞানের অপায়, মিথ্যাজ্ঞানের অপায় দ্বারা দোষের অপায়, ক্রমে প্রকৃতির অপায়, জন্মের অপায়, দুঃখের অপায়, শুদ্ধ না বুঝিলে ভুলকে ভুল বলিয়া বুঝিবে কি

ক'রয়া'— এই সব আলোচনা হয়। শেষে ডাঃ মুখার্জীর ওখানে যায়। ৫০৲টাকা ও ভিনকোলো দেন। একুলেশ্বর বাবু আসেন, অনেক আলোচনা হয় মঠের কোনও এক ভক্তের সঙ্গে তীব্র আলোচনা হয় কেন মঠে আমার স্থান হইল না তাহা লইয়া। একদল গুণ্ডা আসিয়া নিত্যাত্মকে মারিয়া যায় রাত্রি ৯টায় পর কুমারের বাড়ে। ...৩রা নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার প্রেরণা, তোমার আদর্শ তোমার শ্রীপাদপদ্ম বুকে লইয়া চলিতে চাই। কোনও পরিকল্পনা আমার নাই, পরিকল্পনা করার বুদ্ধিও আমার নাই। চলিতে চলিতে যাহারা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে বুকে তুলিয়া লই। তোমার সেবায় তাহাদিগকে লাগাইতে প্রাণপণ করি। আমার আকর্ষণে তাহারা তো আমার স্তরে উঠিল না। আমার বুক বেদনায় ভরিয়া উঠে। কত এল, কত গেল! পাষাণ বলিয়া এত সহিতে পারিতেছি। 'বাসুদেবের ভিক্ষা কোন্ পাষাণেতে দিয়া কেমনে গড়িল সে'। তোমায় দর্শন আলোচনা করিয়া সব ভুলিয়া থাকি। মানুষ মনে করে বেশ আছি। শত শত বিচ্ছেদের বেদনা আমার বুকে। তোমার সেবার জন্য যাহাদের সঙ্গে সব-স্বার্থ হইতে চাহিলাম, তাহারা চলিয়া গেল। কাহারও দোষ দিব না। তোমারই ব্যবস্থা'। আমাকে কি একাই চলিতে হইবে? প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লিখিয়া গেলাম. হয়ত এই পর্যন্তই আমাদ্বারা হইল। সর্বসংস্কার বর্জিত হইবার দিকে আমার জীবনের গতি। কে আমার সঙ্গে থাকিবে? আমার বিশেষ কোন মতবাদ, কোন সম্প্রদায় নাই। আমি সব কিছুর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। তুমি আছ আছ— ইহাই জানি। সকালে সুধা দেন আসে, ১০৲টাকা পরিকল্পনাবাবদ দেয়। কুমারকে মাহারার খরচ বাবদ ৭০টাকা ও ৮০টাকা মাতিয়ানা দেওয়া হয়। যে ১২টাকা পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া রাখা হয় না। সি. টি. ও, পাইলেও পুরো ছাড়া দেওয়া হইল। ইহা হইতে আমি আর বেশী কি করিতে পারি? আমি রিক্ত হইলাম। বৈকালে নিত্যাত্মকে ঘড়ীর ব্যাপারে বিধুভূষণবাবুকে বলি, তিনি উহাদের ডাকিয়া মীমাংসা করিবেন। ১০০৲টাকার স্পিরিটের কথা হইল। কাল বৈকালে টাকা দিব। খানার ডায়েরী করা হয়। অতুল রায় ও সুজিত মুখোপাধ্যায় আসে। ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ বাঁধাইবার নীতি প্রথম হইতেই পীড়া দিতেছিল। সাম্যের পথ ইহারা চেনে না! অথচ আছে ভদ্র সমাজে। নৈতিক স্তর হইয়াছে। পথে ঘাটে অতুল রায়ের স্ত্রীকে ধমকাইয়া বেড়ানোর তীব্র আলোচনা হইয়াছে। সুব্রত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছে। বিধুবাবু আমার অতীত জীবনের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। সঙ্ঘবদ্ধের পথে গেলে আমিও অনেক দূর যাইতে পারি, কিন্তু সে পথ আমার পথ নয়। ৪ঠা নভেম্বর

ঠাকুর, যতক্ষণ তুমি এক আমার অগ্রে, আমি একাগ্র, ততক্ষণ আমি সকলের অগ্রে থাকিব, সব থাকিবে আমার পিছনে। আমার সব কিছুর আগে থাকিবে তুমি—আমি থাকিব পিছনে। 'আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মদলে'। তোমার সঙ্গে আমার অপ্রয়োজনের সম্বন্ধ, তাই জীবনের সকল প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অনুসরণ করিয়া কত সহজ। ভগবানের সঙ্গে যাহাদের

অপ্রয়োজনের সম্পর্ক নাই. তাহাদের প্রয়োজনের আর অন্ত নাই, প্রয়োজনের চাপে তাহারা জর্জরিত। প্রয়োজন তাহাদের পাইয়া বসে। গুরুর সঙ্গে যাহাদের অপ্রয়োজনের সম্পর্ক নাই, তাহাদের সংসারের প্রয়োজন পূরণ করিয়া অবসর মত গুরুর মুখের দিকে তাকায়, তখনই সংসার তাহাদিগকে গ্রাস করে। শ্রীগুরুদেব তখন গৌণ। শ্রীগুরু কিছু চান না কি না, তাই কাহারও তাঁহাকে দিবার কথা মনে থাকে না। আবার অনেক গুরু আছেন যাহারা অপ্রয়োজনের সম্পর্কটা প্রয়োজনের মধ্যে টানিয়া আনিয়া গুরু-শিষ্যকে মলিন করেন। আমি সে দলের গুরু নই। ঠাকুর, আমি গুরুগিরি করিব না, স্বামী-গিরি করি নাই, বাবা-গিরি করি নাই। তোমার অপ্রাধিকার আমার জীবনে নিত্য বিরাজ করুক। ...মণীন্দ্র গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপ হয়। সে ও আমি ১৯৪১-এ বরিশালে জেলে ছিলাম। মহিম হালদার স্ট্রীটের বৌরা আসে। সকালে আমি মহিম হালদার স্ট্রীটে যাই। জীবেনদ্বারা ঘড়ির নগদ ১০০৲ টাকা দিবার প্রস্তাব রসিদটি লিখাইয়া আনি। সন্ধ্যায় উচুমপুরের (বরিশাল) গোবিন্দ দাস ও তাহার ভাইরাভাই আসে। গোবিন্দ প্রণবানন্দ মহারাজের শিষ্য। সে পূর্বেই উজ্জ্বল ভারতের গ্রাহক ছিল। তাহাকে সপ্তবার্ষিকীর ২টি অভিভাষণ দেই, আশ্বিন কার্ত্তিকের পত্রিকাও দেই। পার্ক সার্কাস হইতে ৩জন ভদ্রলোক আসেন, কালী পুজোর বক্তৃতার জন্য। সোমবার যাইব বলিয়া দেই। বিষয় কালীতত্ত্ব। ৬ মাসের গ্রাহকের ২৲ টাকা দিয়া যায়। পুরুষোত্তম-দর্শনের 'ভাষা' সম্বন্ধে অজিতের সঙ্গে আলোচনা হয়। 'তবে তুমি আমাকে পাইবে' ইত্যাদি। 'Clean examples have the curious method of multiplying themselves'. আজ ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত ঘুমাই।

৫ই নভেম্বর।

ঠাকুর, আত্মা অনাত্মার, জগৎ ঈশ্বরের, নর, নারীর, যে কোনও খণ্ড দুইটীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ব্যতীত কিছুতেই উহাদের যষ্টি সমস্যার, যৌথ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বিশ্ব আইন বা law কিছুই উহাদের মধ্যে সুস্থ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারে না। ছত্রখানা হইতে হইবে 'সমগ্র' (whole) হইতে, যদি অংশদ্বয়ের মিলন প্রয়োজন হয়। আত্মার খুঁটিনাটি, অনাত্মার খুঁটিনাটি দাবী সম্পূর্ণভাবে কিছুতেই পূরণ হইবে না সমগ্রের মধ্যে যদি উহারা মিলিত হইতে না চায়। এতকাল 'সমগ্র' হইতে ছত্রখানা হইবার কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই। এইবার তুমি আসিয়াছ 'সমগ্রে'র মধ্যে অংশদ্বয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়া করিতে, পারস্পরিক মিলন ঘটাইতে, একটা সুস্থ সমাজ রাষ্ট্র বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে। অতীতের ভাবা চিন্তাধারা সব বদল হইবে। তুমি এক মহানুভবের সৃষ্টির ভার লইয়া আসিয়াছ। পারস্পরিক অবিশ্বাস কোনও বিধিদ্বারা দূর হইবার নয়। পিতার মধ্যেই পুত্রদের পারস্পরিক মিলন সম্ভব, পিতার বাহিরে পুত্রদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়। আমি সারা জীবন সমগ্রের ভিতরে ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়াছি। মনে পড়ে বরিশাল স্টীমার স্ট্রাইক উপলক্ষে ৭ দিন হরতালের কথা। তুমি সমগ্র মূর্ত্তি। ভগবানকে জীবনে সৃষ্টি করিবার সাধনাই ভক্তি-সাধনা। আজ এই আলোচনা ই

বেশী হয়। সারা দিন টিপটিপ বৃষ্টি হয়। হাবড়া হইতে চিনু আসে ৪টার পর দাশরথিবাবু ১৲টাকা পাঠাইয়া দেন। বাসুর মেয়ের সম্বন্ধ সুবোধের ভাগিনেয়ের সঙ্গে স্থির হইয়াছে। সে ৫৲টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। ৫টার আলোচনা সুরু হয়। চিনু গান গায়। 'মাটিতে যে থাকে তার থাকা ভাল মাটিতেই'—ইহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। 'যে অন্তে অন্তর্বিদ্যাক্ষ' শ্লোকটী ব্যাখ্যাত হয়। জীবনের ঘটনাসমূহকে এমনভাবে গুছাইয়া লইতে হইবে যাহাতে সেখানে তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন। এক হিটারার্ড প্রফেসার আসেন। কুসুম ৫৲টাকা দেয়।....আমার জীবনে সব ঘটনার শেষ ফল শ্রীনিতাগোপাল। তাঁহার দিকেই চাহিয়া থাকিব। নিষ্প্রয়োজন হওয়াই নির্বিকারত্ব। ৬ই নভেম্বর

ঠাকুর, তুমি ভাগবত ধর্মের, ভক্তি সাধনার সত্যিকার রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছ। তোমার মতে 'God is not an already-made thing. He is constant life, action, freedom'। তিলে যেমন তৈল আছে, দুধে যেমন মাখন আছে, ভগবান তেমনি সর্বভূতে আছেন। ভক্তের জীবনে ঈশ্বর ও সর্বভূতের মধ্যের ভিতর ভগবান জন্মগ্রহণ করেন, সর্বভূত ভগবানকে সৃষ্টি করে। যিনি ছিলেন আমার স্বরূপে পাওয়া ধন, তাঁহাকে দ্বিতীয়বার রূপরসগন্ধের ক্ষেত্রে সকল নিংড়াইয়া পাওয়াই চরম সিদ্ধি। আমি অনন্ত ঘটনার ভিতর দিয়া চলিয়াছি। সেই সব ঘটনার সঙ্গে আমার জীবন ও বিশ্বজীবনের যখন মৈথুন হইবে, তাহা হইতেই ভগবান জন্ম লইবেন। ভগবান আকাশেই বসিয়া নন, 'Deus ex-machina' নন। তিনি জীবনমন্থন ধন। জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে। সৃষ্টিতেই মানুষ পরম মোক্ষ লাভ করিবে। ভগবানকে সৃষ্টি করাই সৃষ্টির চরম সার্থকতা। ব্যষ্টি ও বিশ্বজীবনের ঘটনাসমূহকে এমন করিয়া ছন্দে গড়িয়া তুলিবার সাধনা করিতে হইবে যাহাতে ভগবান ফুটিয়া উঠিতে পারেন। বসুদেব হইয়া বাসুদেবকে নিজ জীবনে সৃষ্টি করিতে হইবে। যাওয়া পরা চলাফেরা সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির মাঝে ভগবানকে সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রতিটি কর্মের মধ্যে তিনি অনুপ ও অতিপ বর্তমানে আছেন। তিনি জড়ের একান্ত বাহিরেও নন, একান্ত অন্তরেও নন। এই জড় জগৎই অজড় জগৎ। তুমি ধন্য। আজ সারাদিন টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অতুল রায়ের কোন খোঁজ নাই। অজিত আসিতেছে। বোধহয় ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছে। একদিকে আত্মানাত্ম সম্বন্ধের দর্শন, অপর দিকে কর্মে লাগানো, উচ্চ চিন্তায় যোগ দেওয়ানো, একটী প্রাণের পরিবেশের মধ্যে রাখা—ইহাই হইল অজিতের সুস্থ হইবার জন্য প্রয়োজন। উর্বাশীর আমার জীবন-সাধনার পথে যেমন করিয়া অপরিহার্য, তাহার প্রাণঢালা একান্ততা না পাইলে আমি যে অগ্রসর হইতে পারিতাম না, আমি আমিই হইতাম না, তাহা সন্ধ্যার পর অজিত প্রতিভা, কুসুমের সামনে বলি। কুমারের পুত্র দুপুরে আসে, রাত্রিতে খায় ও শোয়। ৭ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে A priori reasoning-এর (from cause to effect) পথে যেমন পাইয়াছি A posteriori-র (from effect to cause) পথেও তেমনি পাইতেছি। তুমি বিশ্বের 'আদি', তোমাকে বুকে লইয়া বিশ্ব রওয়ানা হইয়াছে,

তুমি 'অহং', তোমাকে বুকে লইয়া বিশ্ব 'ever becoming'-এর পথে ছুটিয়াছে। তুমি বিশ্বের 'অস্তু', তোমাকেই বিশ্ব final cause-রূপে গড়িয়া তুলিবে। যাহাকে আদিতে পাইয়াছি স্বতঃসিদ্ধ (fact) রূপে, তাঁহারই সঙ্গে মৈথুনরত হইয়া অন্তে গড়িয়া তুলিব আত্মিরূপ রূপে, 'Begotten God' রূপে। তোমাতে কার্য কারণ উপাধি গলিয়া গিয়াছে; তাই কারণ যেমন কার্যকে গড়িয়া তোলে, কার্যও তেমনি কারণকে গড়িয়া তোলে। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন কার্য-বিশ্বকে, কার্য-বিশ্ব সৃষ্টি করিবে কারণ-ঈশ্বরকে। এই চক্র পূর্ণ না হইলে মানুষের 'পরা মুক্তি' লাভ হয় না স্রষ্টা সৃষ্টি করেন সৃষ্টকে, সৃষ্ট সৃষ্টি করেন স্রষ্টাকে। তখন স্রষ্টা, সৃষ্টি-শক্তি, সৃষ্ট সকলই উপাধিবিধুর সহজ প্রেম-সম্বন্ধে যুক্ত হয়। তখন স্রষ্টাও কেবল, সৃষ্টিশক্তিও কেবল, সৃষ্টও কেবল। কেবলানন্দের যোগই ব্রহ্মধর্ম। বর্তমান বিশ্ব এই আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া উঠিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। তুমি ঠাকুর, এই আদর্শের ঘনীভূত রূপ। এত বড় ব্যাপক ও গভীর আদর্শ বহন করিবার দায়িত্ব আমাকে দিয়াছ, শক্তিও দিও। 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দেও শকতি'। তোমার জয় হউক। সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ। কবিতের সঙ্গে আলোচনা হয়—ভিতরে স্ট্রাক্চারমূলের কমতি থাকিলে যেমন কাঁচা (raw) লবন যায়, অথচ সে ন্যূনতা ধরে না, খাইতে হয় সূক্ষ্ম বায়োকেমিক স্ট্রাক্চারমূলর, তেমনি জীবনে রাধাভাবের কমতি হইলে বাহিরে raw নারী লইয়া টানাটানি করে, কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় না। রাধারাণী হইলেন নারীর ব্রহ্মত্বের রূপ, জীবনে তাঁহার আবির্ভাব হইলে কাম মোহিত হয়। উজ্জল ভারতে উজ্জল বিশ্বে ডাক্তার উকিল ও মাস্টার হইবেন ত্রিশনারী। সন্ধ্যার পর অবনী সরকার আসে। উল্টাডিঙ্গিতে সর্বজাতীয় কালীপূজার উদ্বোধন করিবার জন্য অনুমতি লইতে। নীরোদবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়া শনিবার ঠিক করিতে বলি। আমার সেবার জন্য ৫৲ টাকা দিয়া যায়।

৮ই নভেম্বর

ঠাকুর, বরিশালে যখন জগদীশবাবুর আশ্রমে ছিলাম, তখন বড় রাস্তার পাশে আমার থাকার ছোট কুড়ে ঘরের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি আম গাছ আমাকে 'মুক্তি'র স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়াছিল। তাহাকে নমস্কার। সেই গাছটিকে আমি ভালবাসিতাম। আম বৃন্তচ্যুত হয় কখন? বৃক্ষ হইতে মুক্ত হয় কখন? আম পাকিলে সে মুক্ত হয়। পাকে কখন? রঙ লাল হইলেই বা নরম হইলেই আম পাকে না। তখন আমও লাল বা নরম হয়। তখনই আম 'পাকা আম' যখন যে-আমগাছের সে আম, সেই রকম একটী আম-গাছ নিজের বুক চিরিয়া সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা অর্জন করে। শিশুর মায়ের বুক চুষিয়া বড় হইবার মত আম যখন আমগাছটিকে নিজ জীবনের মধ্যে potentialityরূপে আনয়ন করে, তখন তাহাকে পুতিলেই চারিদিকের মাটি জলের সহায়তায় একটি আম গাছের সৃষ্টি হয়। আম গাছের সম্ভাবনা যখন আমের বুকের মধ্যে আসে, তখনই আম পাকে, আম পাকিলেই বৃক্ষ-মুক্ত হয়। কাঁচা আম পুতিলে তাহাতে গাছ হয় না। মানুষও তেমনি বিশ্ব-বৃক্ষের ফল। সে যখন বিশ্বের রস চুষিয়া চুষিয়া বিশ্বকে নিজ জীবনে নেয়, তখনই

সে আর একটী বিশ্ব সৃষ্টি করিবার যোগ্য হয় এবং তখনই সে পাকে, মুক্ত হয়। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের অমৃত রস সমন্বয় করিয়া মানুষ পরিপক্ক হইবে, মুক্ত হইবে, দিবা বিশ্ব সৃষ্টি করিবে। কৃষ্ণরূপে তোমার জয় হউক। কুমার ২৯০টার পর ট্যাক্সীতে খিদিরপুর যায়, ৮৫০-এর গাড়ীতে হরিদ্বার যাইবে। তাহার মায়ের জন্য চিঁড়া ও আমসত্ত্ব দেই। যাওয়ার পূর্ণ খরচ ৭০৲ ও বেতন ৮৫৲ টাকা দেওয়া হয়। ৭ সেট উজ্জলভারত দেওয়া হয়। ১ খানা সমন্বয়মূর্তি ও ১ খানা নারীপ্রগতি শান্তিকে দেওয়া হয়। এই দশ মাসে কুমারের জন্য প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। তাহারা আমার অনেক কিছু সেবা বৃন্দাবনে করিয়াছে। সে ঋণ আমার আছে। প্রেম মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ছিলাম। দিনের বেলায় কুমারদের বাসায় খাইয়া আসিতাম। রাত্রিতে কুমার খাবার নিয়া আসিত। পাশের বিছানায় শুইয়া থাকিত। বৃন্দাবনে কালিকানন্দ, মাধবানন্দও আমার মাধুকরীর রুটি দিয়া সেবা করিয়াছে। আমিও কিছু দিন মাধুকরী করিয়াছি। প্রথম যে দিন মাধুকরীতে বাহির হই, সেদিন আমার কুলীনের হক যেন প্রতিবাদ জানাইল! 'জয় রাধে' বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর টালিগঞ্জের সুধা ও তাহার পুত্রকন্যা এবং তাহার পিতা আসেন। জল খাওয়ানো হয়। অজিত শ্রীযুত প্রমথ সরকারের অযাচিত স্নেহের কাহিনী বর্ণনা করে। খুব ভাল লাগিল। যেখানে এই করুণা স্পর্শ করে, সেই স্থানই তো তীর্থক্ষেত্র। সেখানেই বার বার যাইতে হয়। ১ই নভেম্বর

[illegible] আসিয়ে। অজিত বলে, আই এফের ওপারে. আমার মুক্তি বন্ধনেরই 'অভিগা' দিক। বন্ধনকে মুক্তির ভাবে গড়িয়া তোলাই আমার মুক্তি। মুক্তি 'ভাব', বন্ধন রস। বাষ্টি 'রস', সমষ্টি ভাব। অন্তর 'ভাব', বাহির 'রস'। ভূর: স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত ভাবুকতার স্তর-ভেদমাত্র। মাটির আদর্শের দিক ভূর: হইতে সত্যলোক পর্যন্ত। মাটিতে পা রাখিয়াই সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, যেমন পায়ের উপর ভর করিয়াই মাথা দাঁড়াইতে পারে। 'পাদ: অস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাৎ অস্য অমৃতং দিবি'। এই বিশ্ব ব্রহ্মের এক পাদ, অমৃত ত্রিপাদ স্বর্গে রহিয়াছে। পা ব্যবহারিক সত্য, মাথা পারমার্থিক সত্য—ইহা হয় না। পা ও মাথার সমন্বয়েই সমগ্র মানুষ। মাথাহীন পা বাঁচিতেই পারে না, পাহীন মাথা কোন রকমে বাঁচিতে পারে, যেমন দীর্ঘ যুগের জড়বাদরহিত একান্ত অধ্যাত্মবাদ ভারতবর্ষে আজও টিকিয়া আছে। মোক্ষের দাঁড়াইবার ভূমি হইল ধর্ম অর্থ কাম। ধর্মসাধনা, অর্থসাধনা, কামসাধনার সমন্বয় ব্যতীত মোক্ষসাধনা হয় না। ধর্ম-অর্থ-কাম সাধনাহীন মোক্ষ-সাধনা ভিত্তিহীন অবাস্তব utopia মাত্র। ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের লাঞ্ছনার জন্য দায়ী ঐ utopia-র ধারণা। আজ ঠাকুর, তুমিই তো জড় অজড় সমন্বয়, আত্মানাত্ম সমন্বয়, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সমন্বয় আনিয়াছ। আজ ভারতবর্ষ সর্বাঙ্গীণ মুক্তি আস্বাদন করিবে, উজ্জল ভারত হইবে। বৈকালে অজিতের মা আসেন। অজিত যাহাতে সুস্থ হইয়া তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যার ভরণ-পোষণ করিতে পারে, তেমনটী করিবার জন্য নিবেদন করেন। ঠাকুরই উত্তম বৈদ্য। আমি তাঁহার নিকট অজিতের কল্যাণ প্রার্থনা করি।

গোপার জন্ম হয়। অশ্বিনীবাবুর প্রয়াণ-দিবস ৭ই নভেম্বর, জগদীশ বাবুর ১০ই নভেম্বর। এই দুইজনের স্মৃতিসভা গীতাভবনে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে। আমি অজিত হিল্লার যাই, কিরি বাসে। আমি বলি, 'It is as true to say that God creates the world as that world creates God'! বরিশাল বাঙলা ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে অশ্বিনীবাবুকে, অশ্বিনীবাবু সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদিগকে। উহা যেন তাঁহার যোগাভিত। ইহা তিনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সৃষ্টি সবসময়ে সামগ্রিক হয়। তাঁহার সৃষ্টি সর্ব ক্ষেত্রকে—আত্মা-অনাত্মা ক্ষেত্রকে, ধর্ম-শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতিকে—স্পর্শ করিয়াছিল। 'Little brothers of the poor' তাঁহারই সৃষ্টি, ব্রজমোহন বিদ্যালয় তাঁহারই সৃষ্টি। আমরাও তাঁহার প্রেরণা বুকে লইয়া নূতন বাংলা, নূতন ভারতবর্ষ গড়িব। হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ঘোষ, পরে সভাপতি বলেন।....১০ই নভেম্বর।

নিস্তরঙ্গ প্রেম কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য প্রভৃতির স্পর্শে তরঙ্গায়িত হয়, বিচিত্রতা প্রাপ্ত হয়, ঐশ্বর্য লাভ করে। যে প্রেমে মোহ নাই, তাহা প্রেমঘন নহে। প্রেম দোষে গুণ দর্শন করে, তাই প্রেম মুগ্ধ করে। তবে এ মোহ কামুকের মোহ নহে। কামুকের মোহে অদ্বৈত-ভাব নাই। এ মোহে মানুষ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু প্রেমজ মোহে প্রেমিক প্রেমাস্পদের সহিত একাত্মতর হয়, ঘন মিলনে মিলিত হয়। প্রেমে কাম আছে, তাই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি আছে, স্বার্থ নিহিত হয়। প্রেমের ক্রোধে অদ্বৈতভাব ঘন করে, সে তো অদ্বৈত-ভাবের ঘন আস্বাদন, হৃৎসায়ন। প্রেমের ক্রোধ প্রেম-কোন্দল প্রেমজ লোভ প্রেমাস্পদকে সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা পরিপাক করিতে চায়। প্রেমের মত্ততা প্রেমিককে আপন-পর ভুলাইয়া দেয়, প্রেমাস্পদের জীবন-রস-সুধা পানে বিভোর করে। প্রেমের মাৎসর্য প্রেমাস্পদের সঙ্গে কে বড় কে ছোট ইহা লইয়া কোন্দল করে, স্ব স্ব উৎকর্ষতা স্থাপনে সোৎসুক হয়। তোমার কৃপায়, ঠাকুর, এই প্রেম আমার হউক, তোমার প্রতি, বিশ্বের প্রতি, সর্ব জনের প্রতি। সর্বজন এই প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করিবার যোগ্য হউক। অযোগ্যের সহিত, সমস্তরের না হইলে এক তরফা এই প্রেম হয় না। তএক তরফা আসক্তি হয়, প্রেম হয় না। ক্রমশঃ

'স্যাৎ' বাদ

শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কতকগুলো অন্ধ ব্যক্তি একটি হাতির কাছে জড় হয়েছে। উদ্দেশ্য 'হাতি' কি রকম তা তারা বুঝবে। প্রথম ব্যক্তি এগিয়ে এল—তার হাতে ঠেকল হাতীর পা, মোটা থামের মত। দ্বিতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এল—তার হাতে ঠেকল হাতির একটি কান, কুলোর মত। তৃতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এল—তার হাতে লাগল শুঁড়, সাপের মত। এইভাবে আরও সকলে এগিয়ে এসে হাতি সম্বন্ধে নিজের নিজের ধারণা, যা তারা প্রত্যেকেই সার্বিক ও অভ্রান্ত বলে মনে করেছিল, তৈরী করল। এবার সবাই আলোচনায় বসল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রত্যক্ষণ (perception)-এর উপর জোর দিতে লাগল। ফলে ঝগড়া বেধে গেল।

প্রত্যেক অন্ধ ব্যক্তিই হাতির এক একটি অঙ্গ স্পর্শ করে 'হাতি' সম্বন্ধে একটা আংশিক ধারণা করেছে, অথচ সেইটা তারা সার্বিক সত্য বলে চালাতে চাইছে। জগতের বিভিন্ন মতবাদের লড়াই অনেকটা এই রকম। প্রত্যেক মতবাদ তার নিজের কথা বলে; কিন্তু তা যদি সত্য হয়ও তবে তা আংশিক ভাবে। কাটা হীরের মতো থেকে তার দ্যুতি বিভিন্ন দিকে প্রতিফলিত হয়, কোনও বিশেষ মুহূর্তে তার হয়ত দু একটা ছটা দর্শকের চোখে পড়ে অত্যুজ্জ্বল মিলিক রূপে। অথচ হীরের বিভিন্ন পিঠ আর কোণ থেকে কতই না রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়—একজন দর্শকের পক্ষে একই সঙ্গে সেগুলো দেখা অসম্ভব। কিন্তু মানুষ সহজে একথা স্বীকার করে না, বলে আমিই অভ্রান্ত। যে যার নিজের বিশ্বাসে অন্ধ।

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বোধ হয় জৈনেরা সবচেয়ে উদারপন্থী। তাঁরা বলেন—কেউই ভুল নয়, কেবল প্রত্যেকেই আংশিকভাবে সত্য মাত্র। সত্য বহু ভাবে প্রকাশিত হয়। তাই এঁদের মতে প্রত্যেক বিচার (judgment)*-এর আগে 'স্যাৎ' (অর্থ—হয়ত, কোন ভাবে) যোগ করতে হবে। যেমন 'ভাঁড়টি ঘরে আছে' না বলে বলা উচিত—কোনও ভাবে ভাঁড়টি ঘরে আছে। এতে সুবিধে হচ্ছে এই যে,—ভাঁড়টি ঘরে কোন ভাবে থাকতে পারে—এই প্রতীতি হবে এবং 'সর্বকালে ও সর্ব সময়ে ভাঁড়টি রয়েছে'—এ রকম ভুল হবে না। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত ছিল—'কোনও ভাবে হাতি থামের মত'।

---

* 'বিচার (judgment)' কথাটি এখানে তর্কবিদ্যা (logic)-এর পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হল মানুষের সহজতম চিন্তা, যেমন, একটি ফুল দেখে মনে হ'ল—'ফুলটি (হয়) লাল' অথবা 'ফুলটি লাল নয়।'

জৈনেরা তাঁদের এই চিন্তা সাতটি বিচারের মধ্যে রেখেছেন। এই সাতটি বিচারের আকার (form) হল—

(১) কোনো ভাবে ক হয় খ।
(২) " " ক নয় খ।
(৩) " ক হয় খ এবং ক নয় খ।
(৪) " ক হয় অবাক্ত (অর্থাৎ বর্ণনার অতীত)।
(৫) ক হয় খ এবং অবাক্তও।
(৬) " ক নয় খ এবং অবাক্তও।
(৭) ক হয় খ, ক নয় খ এবং অবাক্ত।

ভাঁড়ের ক্ষেত্রে এই form গুলির প্রয়োগ করলে হবে—

(১) কোনও ভাবে ভাঁড়টি আছে
(২) " " নেই
(৩) আছে এবং নেই
(যেমন ভাঁড়টি কাঁচা অবস্থায় মেটে রঙের পোড়ালে মেটে রঙের নয়)
(৪) কোনও ভাবে ভাঁড়টি আছে এবং অবাক্ত
(যেমন, ভাঁড়টি কাঁচা অবস্থায় ছিল মেটে এখন লাল—তবে এর প্রকৃত রঙ কি? —তা বলা যাবে না)

এই ভাবে ৫, ৬, ৭-এর প্রয়োগ করা যাইবে।

জৈনদের এই চিন্তা 'স্যাৎ' দিয়ে আরম্ভ বলে তা 'স্যাৎ বাদ' অথবা সাত পদের চিন্তা বা 'সপ্তভঙ্গীনয়' নামে পরিচিত। একটা জিনিস এখানে লক্ষণীয় যে সাতটি পদের প্রত্যেকটি দিয়ে প্রকৃত সত্যের একটি অংশ উদ্ঘাটিত হয় বলে এঁরা মনে করেন, এরা এগুলো কোন ব্যক্তিগত মনের ব্যাপার বলে মনে করেন না। ফলে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা জৈনদের আঙিনায় শুধু ঠাঁই পায় যথাযোগ্য মর্যাদা।

জৈনেরা বহু সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক সত্যেরও আবার বহুত্বকে তাঁরা মানেন (যার অন্য নাম 'অনেকান্তবাদ'), আবার তাঁরা এও বলেন যে, সব বলার পরও একটা দিক অবাক্ত থেকে যেতে পারে। একটা টাকা এক ভাবে দেখলে বৃত্তাকার, অন্য ভাবে ডিম্বাকার আবার আর এক ভাবে দেখলে সরল-রেখাকার। তাহলে টাকাটির প্রকৃত আকার কি? বলা মুস্কিল (অবাক্ত)।

চিন্তার স্তরে এত বড় উদারতা দেখান সহজ কথা নয়। আচার্য শঙ্কর পর্যন্ত তাঁর যুক্তি জালের বেগ ও প্রসারতায় সকলের যুক্তিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছেন। তবে জৈনদের ত্রুটি ছিল এই যে, তাঁরা এত করেও শেষ পর্যন্ত মুক্তিকেই জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে ধরলেন এবং বন্ধন কাকে বলে তার একটা নির্দিষ্ট ('সাংযুক্ত নয়') ব্যাখ্যা দিলেন। অর্থাৎ তাঁরা স্যাৎবাদকে চিন্তার একটা বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ রাখলেন। 'জৈন দর্শনের বিশেষ দান ছিল—বিশ্বের বুকে বাস্তব বহুর (Pluralistic realism-এর) প্রতিষ্ঠা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই। সপ্তভঙ্গীনয়কে চিন্তা-প্রণালীর সর্বস্তরে প্রসারিত করিতে না পারার ফলেই জৈনগণ এই অনেকান্তের দেশ ছাড়িয়া আলোকের দেশে ঊর্ধ্ব গতিদ্বারা মোক্ষের জন্য ব্যাকুল হইলেন'। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ—ব্রহ্ম-সূত্রের ২য় অধ্যায়ে।

আরও একটা কথা, এই বহু সত্তাবিশিষ্ট বিশ্বের কোন সমন্বয় জৈনেরা দিতে পারেন নি। আচার্য

শঙ্করের আঘাত হানার এটা একটা স্থান। 'ইহা আস্বাদন করিতে পারিলে জৈন দর্শন ও পুরুষোত্তম-বেদান্ত দর্শন এক হইয়া যায়'।— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য। বর্তমান যুগের তীর্থঙ্কর শ্রীনিত্যগোপাল এই খুঁতটুকু সংশোধন করে লিখেছেন—'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীতও বটেন' 'একই বহু, বহুই এক—এই প্রকার বোধ হইলে অভেদ-বোধ ও প্রভেদ-বোধ দুইই থাকে' সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ (ন একস্মিন অসম্ভবাৎ) অর্থাৎ এক ভিন্ন বহুর অস্তিত্ব অসম্ভব এবং তদনুরূপ শঙ্কর-ভাষ্য শ্রীনিত্যগোপালদেবের যুক্তিতে ধার হারিয়ে ফেলে।

সাময়িকী

ধর্ম ও বিজ্ঞান :

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে মৌলিক কোন তফাৎ নেই এই শাশ্বত সত্যটি নূতন করে কলকাতার বিদগ্ধ শ্রোতাদের কাছে ব্যাখ্যা করেন বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ্ ডঃ ডি. এস. কোঠারী। ধর্ম ও বিজ্ঞান এই বিষয়ে বলতে গিয়ে নিউটনের যুগ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতির তুলনা-মূলক আলোচনা করে ডঃ কোঠারী বললেন, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া, আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। ...বিজ্ঞান যদি শুধু জড়ের দিকটা আঁকড়ে ধরে তাহলে তা হবে সংকীর্ণতা। পাশ্চাত্ত্য দেশে মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রগতির কোন মিল নেই, তাই সেখানে এত হতাশা। তিনি বলেন পারমাণবিক যুগে মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। তাই বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মিক উন্নতির কোন সম্পর্ক স্থাপন না করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে সভ্যতার সংকট আসন্ন। ডঃ কোঠারী আশা করেন এই আসন্ন কালে ভারত পৃথিবীকে পথ দেখাবে।'

ইনস্টিটিউটের সভাপতি রাজ্যপাল এ. এল ডায়াসও তাঁর ভাষণে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত ক্ষয়, পরিবেশ দূষিতকরণ প্রভৃতি একটার পর একটা সমস্যার সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন ধর্ম মানব-জীবনে শৃঙ্খলা দেয়; তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

গত ৩০-১-১৯৭৭ তারিখের আনন্দবাজারে প্রকাশিত ডঃ কোঠারীর উপরিউক্ত ভাষণ খুবই যুগোপযোগী। জীবনের লক্ষ্য পৌঁছাতে ধর্ম ও বিজ্ঞান সমভাবে প্রযুক্ত না হলে মানুষের পরিপূর্ণাঙ্গ সার্থকতা আসতে পারে না। উভয়েরই যদিও লক্ষ্য বিশ্ব-রহস্যকে জানা ও সত্যের অনুসন্ধান করা, তথাপি উভয়ের চলার পথ এত দিন ছিল ভিন্ন। আদি ও মধ্যযুগে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোন না কোন ধর্ম-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞান ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার আর প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু একান্ত বিচার কিংবা একান্ত বিশ্বাসের মানদণ্ডে পরিচালিত হয়ে বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয় ক্ষেত্রেই যে সব সমস্যা আত্মপ্রকাশ করেছে ও করছে এ দেশে ও দেশে অনেক চিন্তাবিদের কাছেই তা ধরা পড়েছিল। ধর্ম-বিজ্ঞান সমন্বিত জীবনের স্তরে দাঁড়ানো সহস্র-মূর্তি ভগবান

সমস্যা উপলব্ধি করেই জড় অর্থাৎ প্রকৃতি তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের সঙ্গে এবং অর্থাৎ চৈতন্য ব্রহ্ম বা মনের ক্ষেত্রের সমন্বিত চিন্তাধারাই যে জীবন-ব্যাখ্যান ও সমাধানে অপরিহার্য হয়ে পড়বে একথা বলে গিয়েছিলেন, বহু লেখায় লিখেও দিয়েছিলেন তাঁর জীবন ও দর্শনের যোগাচার্য প্রবক্তা শিষ্য শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁরই সূত্রের ভিত্তিতে দর্শনকে বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞানকে দর্শনের সঙ্গে সমন্বিত করে মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ কি করে সাধিত হয় তার খোঁজ রেখে গেছেন তাঁর বেদান্ত-উপনিষদ-গীতার ভাষ্যে ও অন্যান্য বহুবিধ লেখায়। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার সম্পাদকীয় মন্তব্যেও এই বক্তব্যের কিছু আভাস ছিল যে দর্শনের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত না হলে সমাজের সকল অঙ্গ সংস্কারগুলি অপনোদনের যতই চেষ্টা করা না কেন, স্থায়ী সমাধান কিছুতেই মিলবে না। এই কথাই তো শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর বেদান্ত-উপনিষদ-গীতার ভাষ্যগ্রন্থে, অগণিত প্রবন্ধ ও ভাষণে দৃঢ়ভাবে প্রস্থাপন করে তাঁর তীব্র দর্শনে এক নূতন আলোকের সন্ধান রেখে গেছেন। ডঃ কোঠারীর কাছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে সমস্যা ধরা পড়েছে, তার সমাধানের বার্তা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের চিন্তাধারার মাধ্যমে কার্যকর রূপ লাভ করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি।

বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আদিম যুগের অনেক দৈন্য ও অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নিত্যই বিস্ময়কর। আবার সেই বিজ্ঞানেরই দান পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং আরও কিছু যে মানুষের অস্তিত্বের পক্ষেই আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাকে ঠেকাবে কে? এই দানবীয় শক্তি যে কোন মুহূর্তে প্রাণী-জগৎকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে এই ভীতি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকের মনে। হিরোশিমা নাগাসাকী বিজ্ঞানের কোন্ মূর্তিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে রেখেছে? আবার একথাও মানুষের সুস্থ চিন্তা ভুলে যায় নি যে, সৃষ্টির আদিম তথাকথিত ধর্ম মানুষের জীবনে কত দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল বা করে থাকে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই আসে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-অতীত বিশ্বজনীনতার ব্রহ্ম-বোধ তথা নৈতিকতা বা আত্ম-জ্ঞান বা ধর্ম- এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের কথা। এই দুটি—দুইকে দুই পরিচালনা করে এক তৃতীয় সুন্দর জীবনাদর্শ উপস্থাপিত হবেই—এমনতর ভাবনা বহু পূর্বে আবির্ভূত এবং ছিয়াত্তর বৎসর পূর্বে পরলোকগত শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব সম্পর্কে-আসা যাঁর কাছে আমরা হাজার হাজার বছর ধরে অবহেলিত হয়ে গিয়েছিলাম তাদেরই সমন্বয়ের কথা ঘোষণা করে গেছেন। এই চিন্তাধারাই দিকে দিকে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পাচ্ছে— ডঃ কোঠারীও ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করতে বলে সেই ইঙ্গিত করেছেন। ধর্মের তথা বিশ্বাসের কুসংস্কারকে বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত করবে, বিজ্ঞানের আত্মধ্বংসী উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রিত করবে নৈতিকতার, বিশ্বজনীনতার আত্মবোধ। ধর্মের গ্লানি আর বিজ্ঞানের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মিলনে মানুষের সভ্যতা নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তার পথরেখা এঁকে রেখে গেছেন। আমরা তাই প্রতীক্ষায় আছি।

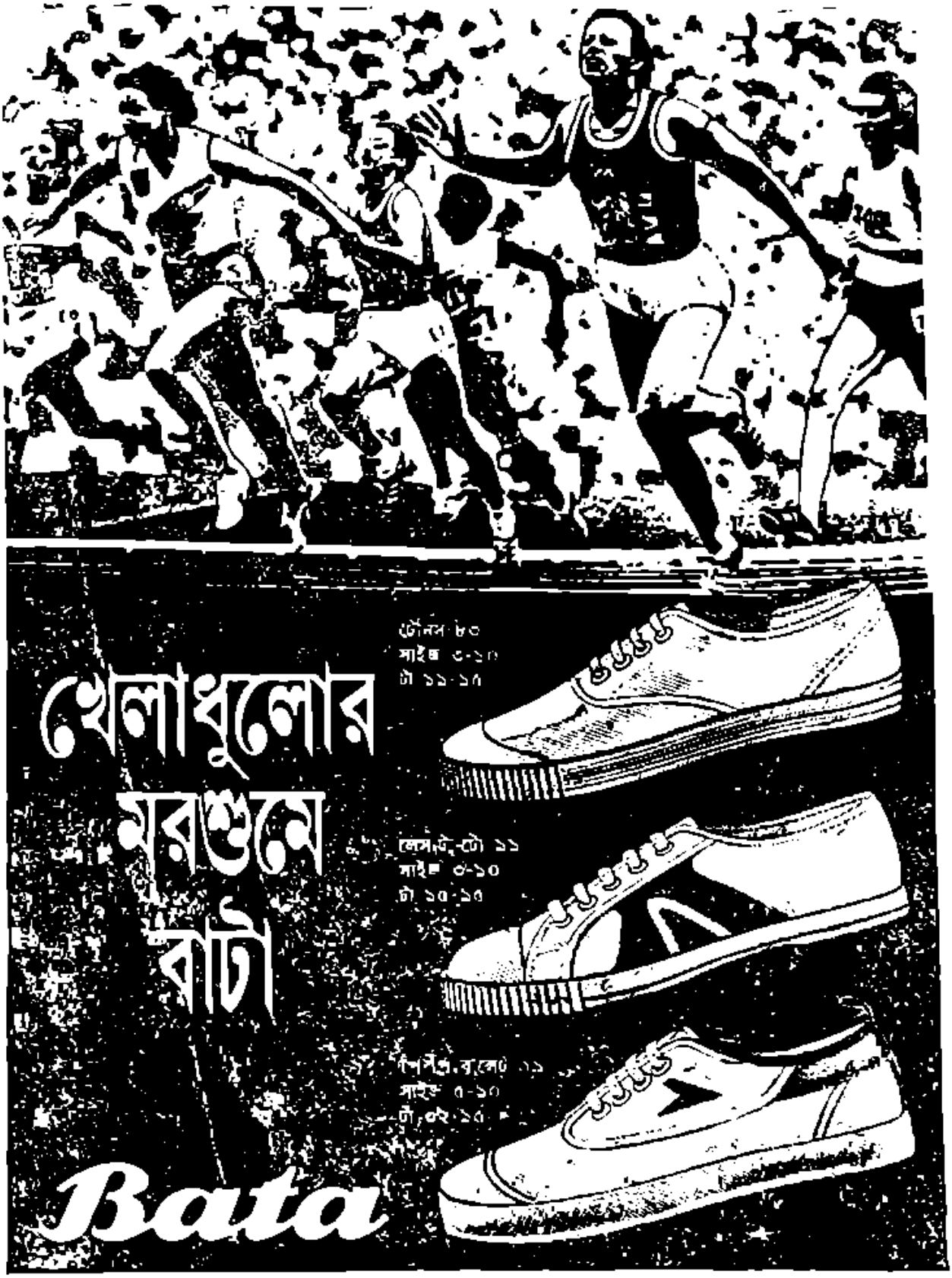
খেলাধুলোর
মরশুমে
বাটা
জোনস-৮০
সাইজ ৩-১০
টা ১১-১৫
জেসাল্ট-টো ১১
সাইজ ৩-১০
টা ১০-১৫
Bata

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য হরস্থাদি ও বিস্তৃত মূলাধার ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনাপূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও যুক্তিমূলক উপসংহার। জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাষ্টিকের জ্যাকেটসহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষার শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা" "যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে"— ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	১·৫০	সদাপাঠ্য গীতা	২·০০
পদ্য গীতা	২·৫০	ঐ প্লাষ্টিক জ্যাকেটসহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৪·৫০
বাণী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী		শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম, এ.		শ্রীনীলিমা ঘোষ এম, এ, বি, টি	
ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিজ্ঞানে বাঙালী	২·০০	বঙ্কিমের গল্প	১·৫০
বাংলার ঋষি	৬·০০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৪·৫০	ব্যায়ামবীর শ্রীনীরোদ সরকারের	
বাংলার মনীষী	৩·০০	শরীর ও শক্তি	৩·০০
জীবন-গড়া	০·৭৫	নীরোগদেহে দীর্ঘজীবন	২·৫০
রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০	সরল যোগ-ব্যায়াম	২·৫০
আচার্য জগদীশ	৪·০০	যোগি-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০
রবীন্দ্রনাথ	৪·০০		

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য সমাসাকৃতি অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

আজই সঞ্চয় করুন আয় বৃদ্ধি করুন

"স্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্পগুলি জানুন"

১, ২, ৩ ও ৫ বৎসর মেয়াদী পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিট প্রকল্প :-
বার্ষিক সুদ যথাক্রমে ৮%, ৮½%, ৯% ও ১০%

* জাতীয় সার্টিফিকেট ২য় এবং তৃতীয় পর্যায়ে ৭ বছর মেয়াদী সুদের হার ৬% (করমুক্ত) জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ৪র্থ এবং ৫ম পর্যায়ে ৭ বছর মেয়াদী সুদের হার যথাক্রমে ১০·১৫% এবং ১১% সরল।

* পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট করমুক্ত বার্ষিক ৫%

* ৫ বছর মেয়াদী রেকারিং ডিপোজিট প্রকল্প সুদ ৯·১৫%।

* ১০ বছর মেয়াদী কিউমুলেটিভ টাইম ডিপোজিট প্রকল্প করমুক্ত বার্ষিক সুদের হার ৬·২৫% (চক্রবৃদ্ধি হারে)।

১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্প করমুক্ত সুদ ৭%।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোষ্ট অফিস বা জেলা সঞ্চয় আধিকারিকের ৮০ দি ডাঃ সুধীর বোস রোড কলিকাতা-১৩, ২২ ইউ, কে, দত্ত রোড দমদম কলিকাতা-২৮, ৩১ রিভার সাইড রোড ব্যারাকপুর, অতিরিক্ত জেলা শাসকের অফিস, উত্তর ২৪ পরগণা (বারাসত) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও জন-সংযোগ সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত।

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

(Occasional Speeches -Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে এক-জগৎ-চেতনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে অগ্রণী হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের

॥ মুদ্রিত ॥

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
ছান্দোগ্য-পরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্রীবিভাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৫·০০
অবতারের পূর্ণরূপ ০·৫০
গীতাজয়ন্তী
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ০·৫০
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে
পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীভগবদ্গীতা ১২·০০

॥ পাণ্ডুলিপি ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী, ভাষণ ইত্যাদি।

॥ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ॥

নারী-প্রগতির অন্তরায়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য
বিভাগোপাল ও শিষ্য সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীযুক্তা রেণু মিত্রের ॥

সচলপ্রতিমা শ্রীবিভাগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষ-প্রশ্ন

ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত

৪। রবীন্দ্র-হৃদয়
৫। প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম: বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর, (তারা-দেববন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী; পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o কে, বি, লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার।
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
"আমি বিশ্ব-নাগরিক" আকার-নিরাকার সমন্বয়। এই বিশ্ব-ই আমার মহামঠ
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

চৈত্র-বৈশাখ সম্পাদিকা-রেণু মিত্র ত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

গীতামাহাত্ম্য মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য রহস্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিরসাত্মক উপসংহার। জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাস্টিকের জ্যাকেট সহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীর আতীব, সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। "যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"— ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সদাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	১·৫০	ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবৎ ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·০০
বাংলার ঋষি	৫·০০
বাংলার বিদুষী	৩·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

শ্রীবিভিন্না ঘোষ এম, এ, বি, টি,

ছোটদের গল্প গুচ্ছ	৩·০০
মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বঙ্কিমের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০
নীরোগদেহে দীর্ঘ জীবন	২·৫০
সহজ যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৫·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মহামনীষী অভিনব অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৯ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

উজ্জ্বলভারত

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, খ্রী: ১৯৭৭

সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

বাংলার ভাগ্যাকাশে সেদিন এক ম্লান সন্ধ্যা। তমসায় আচ্ছন্ন দিগবলয়। সমাজে নানা অনাচার। ঈশ্বরের নামে উৎসব অনুষ্ঠানে উচ্ছৃঙ্খলতা। জনমন আত্মদহনের বেদনায় মুহ্যমান। কেঁদে ওঠে ভক্তবৃন্দের অন্তর। সেই কাতর কান্নায় আবির্ভূত হন ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। তাঁরই প্রতিমূর্তি হয়ে অনেক দিন পরে আসেন শ্রীনিত্যগোপাল। সেদিন আকাশে বাতাসে বুঝি ধ্বনিত হয়েছিল—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়—
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।

বঙ্গের অঙ্গনে গঙ্গার কূলে গৌরাঙ্গ যেমন নানা রঙ্গ করেন, নিত্যগোপালও তেমনি দেখান ইন্দ্র লীলা। তাঁর জীবন-কাব্যের প্রথম পর্ব খুলে ধরি—নিত্যগোপাল তখন শিশু। নিতা গঙ্গা স্নানে যান। একদিন এক বাবাজী গঙ্গায় গাহন করেন। নিত্যগোপালও তাঁর পাশে পুণ্য সলিলে স্নানরত। কিন্তু এ কি তাঁর আঁখি যুগলে আভাসিত? এ তো নিত্যগোপাল নয়, এ যে তাঁর হৃদয়-দেউলের আরাধ্যদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ। কনক বরণ শিশু মিটি মিটি হেসে যেন বলেন—

নিরবধি ভাব তুমি আমারে দেখিতে
অতএব আমি দেখা দিলাম তোমাতে।

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

এর অনেক দিনের পরের ঘটনা—১৯৪৯ সালের মাঘ মাস। হিমেল বায়ে ছেয়েগাঁও নিত্যগোপাল চলেন চৈতন্যের লীলাভূমি নবদ্বীপে চারিদিকে সুরভিত চন্দনের বাস। শচীনন্দনের মূর্তি দেখে দেখে ফেরেন ঠাকুর। হরিসভার অঙ্গনে গৌরাঙ্গ দর্শনে যখন হাজির তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মন্দির-সেবাইত মথুরনাথ ইষ্ট দেবতার ধ্যানে রত হঠাৎ চমকে উঠেন সেবাইত। আলোর আলোময় দেউলাঙ্গন। কি দেখতে পান সেবাইত নয়ন মেলে?—ত্রিভঙ্গঠামে প্রেমের ঠাকুর দাঁড়িয়ে "আবার কি গৌর এলি রে!"—বলে মথুরনাথ হন মূর্চ্ছিত। যখন সম্বিৎ ফিরে আসে তখন দেখেন নিত্যগোপাল। সেবাইত

তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোত্থায় সাদরম্
ননাম ভূবি কায়েন দণ্ডবৎ প্রীতি-বিহ্বলঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত

ঠাকুর গৌরাঙ্গ-দর্শনে এসেছেন জেনে সেবাইত দেউল-দ্বার খুলে দিতে চান। ঠাকুর বলেন—"থাক, দুপুরের শয়ন-নীতি ভঙ্গ করা কি ঠিক হবে?" মথুরনাথ ব্যাকুল চিত্তে জানান—"আপনি নিজেকে নিজে দর্শন করবেন তাতে আবার নিয়ম কি?" মন্দিরের দ্বার হয় মুক্ত। ঠাকুর অপলক নেত্রে দর্শন করেন গৌরাঙ্গ-মূর্তি। মথুরনাথ ভোজনের আয়োজন করতে চান, কিন্তু নিত্যগোপাল কালবিলম্ব না করে কলকাতার পথে পা বাড়ান। সেবাইত ঢেলে দেন নিত্যগোপালের উদ্দেশ্যে নয়নের নয়নাঞ্জলি।

ঠাকুরের গৌরাঙ্গ ভাবের আর একদিনের চিত্র চিত্রিত করি—নবদ্বীপের হালদার সাহার গৃহে ঠাকুর তখন সমাসীন। সেখানকার রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞাত হন তাঁর জামাতা অত্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করেছে। শ্বশুর মশায় ক্রোধে হন অগ্নিশর্মা। জাতিচ্যুত করার জন্য সাহার বাস ভবনের দিকে বায়ুবেগে হন ধাবিত। মৃদঙ্গ করতালে সাহার গৃহাঙ্গন তখন মুখর। চক্রাকারে কীর্তনে রত শিষ্য মাঝে ঠাকুরের নয়নাভিরাম নৃত্য। তাই তো চৈতন্য-লীলায় আদি ব্যাসের বাণী মনে পড়ে—

হেন মতে আর আছে দুই অবতার।
কীর্তনানন্দ রূপ হইবে আমার॥

রঘুনাথের কণ্ঠনাদ কিন্তু কারও শ্রুত হয় না। ঠাকুর দোর খুলে দিতে বলেন। রঘুনাথ কীর্তন ও নৃত্য দেখে কাতরিয়ার কান্নায় ভেঙে পড়েন। জামাতাকে আর শাস্তি দেওয়া হয় না। নিতাগোপালের প্রসিদ্ধ প্রচ্ছাবে যেন নিজেও আত্মহারা। প্রেমের ঠাকুরের আগমনে নবদ্বীপের বালুচরে যেমন একদিন নেমেছিল প্রেমের জোয়ার, সেই দৃশ্যই বুঝি ফুটে উঠল আবার। কত তপ্ত প্রাণ তৃপ্ত হ'ল প্রেমসিন্ধুর অতলান্ত নীরে স্নান করে।

ঠাকুর নিতাগোপাল যে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? উভয়ের অঙ্গেই তো কাঞ্চনের আভাতি। প্রেমের ঠাকুর, আপামর জনের হাতে বিলিয়েছেন প্রেমামৃত। নিতাগোপালের সান্নিধ্যে এসে পাপী তাপী কি সুধা আস্বাদ পেয়েছে? তাঁর জীবন নাট্যের দু-একটি অঙ্ক খুলে ধরি—হুগলীতে গোলাপ গোয়ালিনীর বাস। মেয়েটি দুশ্চরিত্রা। ঠাকুর কিন্তু ঐ গোয়ালিনীর কাছেই দুধ কিনতেন। মধের নেশায় বিভোরা গোলাপ দুধ আনতে প্রায় ভুলে যেত। একদিন দুধ না আসায় ঠাকুর ভক্ত হরিবাবুকে বলেন, "দুধ তো এল না; মধের নেশায় গোলাপ বুঝি দেখ প্রলাপ বকছে। অবলা জীব শুরু কি না খেয়ে মরবে? ঘর থেকে কিছু গুড়ের মুখে দিয়ে এসো।" ভ্রষ্টা গোয়ালিনীর প্রতি ঠাকুরের কি মমতা! তাই তো অন্তরে ছন্দের ঝঙ্কার তোলে—

সত্যবাই লক্ষ্মীকে দিল ছায়া যাহা বাঞ্ছা করয়ে চৈতন্য
পতিতা হয়েও, গৌরি কৃপায়, বৈষ্ণব রূপে ধন্যা;
মহীচি মালী চণ্ডালের ঘরে
প্রভাত হলেই আলো দান করে—
নিতাগোপাল কৃপায় গোলাপ হইল তেমনি ধন্য।

তারাপদ নামে এক ভদ্রলোক একদিন কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে পরমহংসদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হন। রামকৃষ্ণ কিন্তু সেমিষ্টান্ন স্পর্শ করেন না কারণ ভদ্রলোক ছিলেন ব্রাহ্ম। তারাপদ চলে গেলে সেখানকার মৃত্তিকা তুলে ফেলে দেওয়া হয়। গোবর গঙ্গাজলে সে স্থানটি শুদ্ধও করা হয়। ভদ্রলোক এ বার্তা জ্ঞাত হয়ে আত্ম হত্যায় উদ্যোগী হন। পণ্ডিত পাবন নিতাগোপাল তারাপদকে আহ্বান জানান। সেদিন বুঝি খৃষ্টের বাণীই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"Come unto me, all ye that labour ard are heavy laden, and I will give you rest."—এসো তোমরা যারা আর্ত, আমি তোমাদের শান্তি দেব। এ ঘটনা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "নিত্য তা পারে। আমি বেছে গুছে নেব, নিত্য কি

আর বেছে গুছে নেবে ?" নিতাগোপালের প্রাণের ঐশ্বর্য্য পরমহংসদেবের উক্তিতেই ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গের জগাই মাধাই উদ্ধারের মত আমাদের ঠাকুরের এ এক লীলা। সেদিনকার তারাপদের বুকের কথা রবীন্দ্র-বাণীতে বলা যায়—

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর !
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর !

শ্রীচৈতন্য তাঁর জননীকে জানিয়েছিলেন তিনি আরও দুইবার অবতীর্ণ হবেন। নবদ্বীপ থেকে তাই আবির্ভূত হয়েছিলেন পানিহাটির মাটিতে। শ্রীগৌরাঙ্গের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য আমাদের ঠাকুরের শুভাগমন। মহাপ্রভু মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে ঠিক স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। যবন হরিদাসকে তিনি হিন্দু করে তবেই মুক্তি পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। গোপাল স্বয়ং তোরাপ আবাসন শ্রবণে সন্তাবিষ্ট, মুসলমানকে আল্লাহ নামে দীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রতিটি ধর্ম্মের মূলা নিজে স্বীকার করেছিলেন সেইজন্য তাঁর দ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় ঘটেছিল।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবন-ভূমিকে আশ্রয় করে মায়াবাদের ধারা পৃথক দুই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। শ্রীনিতাগোপাল তাকে এক খাতে বহিয়ে অপরূপ সমন্বয় সাধন করেছিলেন। শচী-নন্দন ছিলেন নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী। কিন্তু সে সন্ন্যাস-নিষ্ঠা আধুনিক যুগে একেবারে অচল। গৃহী ও সন্ন্যাসীর সমন্বয়ও তিনি করে গেছেন। বস্তুতঃ মহাপ্রভু যুগোপযোগী যে দর্শনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, নিতাগোপাল সলিল-সিঞ্চনে তাকে তরু লতায় পল্লবিত করেছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় শ্রী নিতাগোপাল শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রম-বিবর্ত্তিত রূপ।

"পুরুষোত্তম পূর্ণ, বিশ্ব পূর্ণ ; তাহাকে খুন করিয়া কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও ? 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে'। খুন তো কেহ হইবে না, খুন হইবে তোমার আস্বাদনের একদিক, খুন হইবে তুমিই ; তাহাও একদিন রক্তবীজের মত 'খাই খাই' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিবে। প্রকৃত যোগী ব্রহ্মকে নিতাতার সঙ্গে একট জগৎ কেন, সপ্ত জগৎ যোগ করিলেও ভয় পান না। তুমি জগৎহীন ব্রহ্ম, কীলকহীন শক্তির পূজা করিও না।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

বিপরীতের সমন্বয়ের চিত্রপট
শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীবৈদ্যনাথ মিত্র

সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের ১২৪-তম শুভ আবির্ভাব বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ১৪ই চৈত্র ১৫৮৩ (২৮শে মার্চ ১৯৭৭) সোমবারে। এই বিশেষ দিনে তাঁকে আমাদের প্রাণের প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীনিত্যগোপাল খুবই অল্প পরিচিত। শ্রীনিত্যগোপাল অবধূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। "আদি এই অবধূত সম্প্রদায় বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাই ঋষভদেব কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত হইয়া ছিল। জৈন সম্প্রদায়ের আদি তীর্থঙ্কর এই ভগবান ঋষভদেব; ইনিই ভাগবতমতে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। ঋষভদেবের জীবনে বেদান্ত ও জৈন মতবাদের সমন্বয় ঘটায় ফলেই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের যোগসূত্ররূপে, উভয় সম্প্রদায়ের গুরুরূপে পূজিত হইয়াছেন। ঋষভদেবের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম কেবলানন্দ। এই কেবলানন্দ হইতে ৯১-তম পুরুষ হইতেছেন যোগাচার্য শ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব বা ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল। পুনরায় বিলুপ্ত হইতে এই শ্রীনিত্যগোপাল কর্তৃক অবধূত সম্প্রদায় বর্তমান যুগে উজ্জীবিত হইয়াছে। এই অবধূত সম্প্রদায়ের মধ্যে রহিয়াছে তিনটি ধারার সমন্বয়—শিবধারা জৈন ধারা ও বিষ্ণুধারা। শ্রীনিত্যগোপাল নিজ জীবনে ও দর্শনে এই জৈন-বেদান্ত সমন্বয় আকারই ধারণ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল জৈন-বেদান্ত সমন্বয় মূর্তি।"— শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ। এই শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও তত্ত্ব অতিশয় ব্যাপক ও গভীর বলিয়াই তিনি তাঁহার এই ১২০ বর্ষ পার করিয়াও এত স্বল্প পরিচিত। তাঁহার জীবনে পরস্পরবিরুদ্ধের সমন্বয় রহিয়াছে বলিয়াই তিনি এত স্বল্প পরিচিত। যে তত্ত্ব বিজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে শ্রীনিত্যগোপাল সেই তত্ত্বকে জ্ঞানের কথায় আর জীবনের ভাষায় রূপ দিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি এত স্বল্প পরিচিত। জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়া দেখিতে সক্ষম চিন্তাবিদ বলিয়াছেন, 'He is a true creator, who knows, who can, and who wills, all together'—শ্রীনিত্যগোপাল এই সঙ্গে knows, can & wills, তাই তিনি true creator—তাই তিনি এখনও এত স্বল্প পরিচিত। শ্রীনিত্যগোপালের জীবন এমন এক সুরের যেখানে 'intelligence is united to feeling and in an indissoluble union'—তাই তিনি এত স্বল্প পরিচিত! তাঁহার জীবন, কবির ভাষায়, 'বোঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য', তাহা 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া', তাঁহার জীবনের মধ্যে প্রাণ বলে উঠেছে সুখে দুঃখে কাজে বিশ্রামে জন্মে মৃত্যুতে জয়ে পরাজয়ে লোকে লোকান্তরে জয় এই 'আমি আছি'-র জয়, জয় এই আনন্দময় 'আমি আছি'-র জয়'—তাই তো শ্রীনিত্যগোপাল আজও দুর্বোধ্য, অপরিচিত।

এই দুর্বোধ্য অপরিচিত শ্রীনিতাগোপালের তত্ত্ব-জীবনকে যে বর্তমান যুগের বহু সমস্যাপীড়িত মানুষের প্রয়োজন একথা উন্মোচিত করিলেন তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ। শ্রীনিতাগোপালের পবিত্র দেহ সমাহিত আছে কলিকাতা বালীগঞ্জস্থিত যে মহানির্বাণ মঠে, সেখানে তাঁহার অন্তর্ধানতিথিকী উপলক্ষে ২৪ বৎসর পূর্ব হইতেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জনসাধারণের মধ্যে শ্রীনিতাগোপাল-তত্ত্ব প্রচারে অধিকতর তৎপর হওয়ার সুযোগ পাইয়া ছিলেন। তাহার আগে পরেও অবশ্য এই শ্রীনিতাগোপাল-তত্ত্ব-প্রকাশ প্রয়াসই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-মহারাজের সাধ্য জীবনের সাধনা। শ্রীমৎ স্বামীজী শ্রীনিতাগোপাল-জীবন ও তৎ-রচিত গ্রন্থাবলীতে প্রস্থানিত চিন্তাধারার আলোকে ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের—বেদান্ত, এগারখানা উপনিষৎ ও শ্রীমৎ ভগবদ্গীতার—অবধূত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীনিতাগোপালের জীবনী ও তত্ত্ব-সহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং সেই আলোকেই মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিয়া বহু প্রবন্ধ ও হাজার হাজার ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাত্মবাদী তথা জগৎ-মিথ্যাবাদী ভারতবর্ষ কমুনিজমের সাক্ষাৎ পাইয়া প্রতিক্রিয়ায় কি বীভৎস রকমের অনাধ্যাত্ম-বাদী বা জড়বাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেখানে আত্মগত সুবিধাবাদ বা ভোগবাদ ছাড়া আর কিছুই নাই, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যায়। এ হেন বিকৃত জড়বাদ ও বিকৃত জীবন হইতে মুক্তি দিবার জন্যই শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-জীবন এক নূতন-তর সামগ্রিক জ্যোতি লইয়া বর্তমান যুগের মানুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি মুক্ত সহজ জীবন তাঁহার। "মায়া-ব্রহ্ম সমন্বিত, আত্মা-অনাত্মাসমন্বিত, সর্বদৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত ও উপলব্ধ পুরুষোত্তম শ্রীনিতাগোপালই সত্য বাস্তব ব্রহ্মবস্তু।...তিনি ভাবময় হইয়াও ভাবাতীত, রসময় হইয়াও রসাতীত।...অবতীর্ণ পুরুষোত্তম-দর্শনে, পুরুষোত্তম-স্পর্শে দেহমনপ্রাণও অধ্যাত্ম নিত্য সত্তা।...'গো'-র নিত্যত্ব যিনি প্রদান করেন, তিনিই নিত্য-গোপাল।...ব্রহ্মের নিত্যগোপাল-মূর্তিই আমাদের বর্তমান যুগে বরণীয়।...'গো' অর্থ ইন্দ্রিয়, 'গো' অর্থ পৃথিবী। ইন্দ্রিয়-পালন এবং তাহাদের গোষ্ঠ ঐ পৃথিবী-পালন আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। অথচ এইখানেই রহিয়াছে ব্রহ্ম-বিদ্যার মর্ম আস্বাদন। আমরা ব্রহ্ম-কৃষ্ণ গোপালের গোষ্ঠকে আমাদের শুষ্ক কথা যুক্তির এক খোঁচায় একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছি।...গোষ্ঠ-লীলার পুনরুদ্ধার করাই নিতাগোপাল-মূর্তির বিশেষ তাৎপর্য।...অবধূত-জীবনে সব সংস্কার আছে, আবার কোনটাই নাই। মহানির্বাণতন্ত্র অবধূতের লক্ষণ দিতেছেন :

ন যোগী ন ভোগী ন চ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন বীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ
রাজতেঽবধূতঃ দ্বিতীয়ঃ মহেশঃ ॥

অবধূত-ধর্মই সমগ্র বেদধর্ম; ইহাই সমন্বয় ধর্ম। এই সমন্বয় ধর্মেরই বিগ্রহ অবধূত শ্রীনিতাগোপাল। কালধর্মে শূদ্র-কলিযুগে যখন সর্ববর্ণ সর্ব সংস্কার-চ্যুত, প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ যখন একেবারে সংস্কারবর্জন করিয়াছে, তখন প্রাকৃতিক এই সব সংস্কার-বর্জনকেই দিব্য সংস্কার-পরামর্শ ও দিব্য

সংস্কারাভাবের সমন্বয়ে দিব্য ভাগবত সমাজ গড়িয়া তোলাই অবধূত শ্রীনিত্যগোপাল-অবতারের নিগূঢ় প্রয়োজন।··· এই গৌরাঙ্গ-অবতার শ্রীনিত্যগোপালদ্বারাই বর্তমানে সকল ধর্ম, সকল মতবাদ, সকল সম্প্রদায় ব্যাখ্যাত হইবে। যীশুকায় শ্রীগৌরাঙ্গই কলাকারে বর্তমানে শ্রীনিত্যগোপাল। ইনিই বর্তমান যুগপ্রদীপ; সকল জগৎ আলো করিয়াই ইনিই নিত্যসূর্যরূপে দেদীপ্যমান। সর্বধর্ম স্ব স্ব বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া এইবার মহামিলনলীলা আস্বাদন করিবে। সর্ব সম্প্রদায়ই হইবে প্রত্যেকের সম্প্রদায়; কাহারও এক সাম্প্রদায়িক হইবার যো নাই। প্রত্যেকের জীবনেই সর্ব সম্প্রদায় ব্যাখ্যাত হইতে হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন, 'সমন্বয়। নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়।' এই শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনদ্বারাই বিপরীতধর্মী সব কিছুর ব্যাখ্যা হইতেছে, ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয় অসমন্বয়েরও সমন্বয় বিধান করিয়া বর্তমান যুগের law of uncertainty-র মহিমাই ঘোষণা করিয়াছেন।"—শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের—তাঁহার ব্রহ্মসূত্র দ্বিতীয় খণ্ডের।

এই শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্ব মানুষের সর্ব দ্বন্দ্বের মীমাংসক। বিশ্বে যুগে যুগে কত তত্ত্বই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—কিন্তু সকলেই আমিই প্রথম কিংবা আমিই একমাত্র এই কথাই বলিতে চাহিয়াছে। কেবল পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছেন আমি সমগ্র—তাই তিনি সর্ববাদবিষয় প্রতিরূপশীল; সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে হজম করিয়া তিনি প্রত্যেকটি হইয়াও প্রত্যেকটির অতীত। তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন, 'আমি কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত নই। আমার ইষ্ট যখন শিব হন, আমি তখন শৈব, তিনি যখন বিষ্ণু হন, তখন বৈষ্ণব, তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হন, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই।''আমি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান।·· I am a cosmopolitan....প্রকৃত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ তাঁহার সকল সম্প্রদায়'। এই মানসিক স্তর বিশ্বে আসিতে চাহিতেছে, শ্রীনিত্যগোপাল তাহার পথরেখা তত্ত্বে ও জীবনে রাখিয়া গিয়াছেন। সীমিত একটি ধারণাকে বোঝা ও গ্রহণ করা যেমন সহজ, একটি ব্যাপক ও গভীর ধারণাকে গ্রহণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিন—তাই শ্রীনিত্যগোপালকে আজও গ্রহণ করা কঠিন হইয়া আছে। সবকে স্বীকার করিয়া আত্মগত করিয়া তাহা হইতে উর্দ্ধে থাকার কথা বলিয়াছেন বলিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল তত্ত্ব দ্বন্দ্ব-মীমাংসক। চিদ্বৃত্তিই হউক কিংবা দেহবৃত্তিই হউক তাহাকে অস্বীকার করিয়া দাবাইতে চাহিলেই তাহা বিকৃত হইবে, জীবনের উপর চাপ দিবে—বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিবে। এ বিশ্বে কাহাকেও অস্বীকার করা চলিবে না—কিন্তু কাহার কতটুকু স্থান ও মান সেইটি বাহির করিয়া সেইখানে তাহাকে স্থাপনা করিলেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়। এই ব্যবস্থায় শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন অনুসরণ করিলে জীবনে যে স্থিতি, তৃপ্তি, শান্তি, আনন্দ মেলে তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতির

বহু ঘটনার মধ্যে থাকিয়াও স্থিতি তৃপ্তি নষ্ট হয় না—সীমা অসীম, অন্ত অনন্তের সামঞ্জস্য আস্বাদনই হয় সেই বহু ঘটনার মধ্য দিয়া। শ্রীনিতাগোপালে জীবন উৎসর্গ করিলে এই জন্যই অভয় হওয়া যায়। বস্তু-বিজ্ঞান আর ব্রহ্ম-জ্ঞান দুইতেই তিনি পাইতে বলাতই অভয় হওয়ার সম্ভাবনা মূর্ত হইয়াছে এবং এই উভয়ই হইবে প্রেমের হৃদয়াকাশের বিস্তারের নীচে—কোন কিছুরই প্রতি আসক্তিবিদ্বেষের চোরকুঠুরীতে নয়। তাই শ্রীনিতাগোপাল পরম প্রেমিক—সর্ব জীবে তাঁহার প্রেম আছে, আবার তিনিই পরম বৈরাগী—জীবনের অধিক সময়ই যাঁহার ব্যয়িত হইয়াছে নির্বিকল্প সমাধিতে। তাই তাঁহার দেহ ও মন উভয়ই মধুর ও মহান, তিনি নয়নমনোমুগ্ধকর, তিনি সকলের পরম আপন জন আবার তিনিই সর্বাতীত, নিঃসঙ্গ, সর্ব অনপেক্ষ। তাঁহাতে কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত। তাই তিনি সহজ মানুষ। আজকের দিনের মানুষ এই সহজ মানুষকে চায়—সকলকেই আজ সহজ মানুষ হইয়াই স্বল্পাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

একমাত্র প্রাণের মধ্যেই মানুষ সহজ হইতে পারে, ঐ প্রাণের মধ্যেই মানুষে কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেম সমভাবে স্ফুরিত হইতে পারে। কেননা প্রাণ স্বতন্ত্র, প্রাণ গণতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও যে গণতন্ত্র তাহা এই প্রাণেই আছে। আজ বিশ্ব জুড়িয়া সকল স্তরে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও গণতন্ত্রী হইবার আহ্বান। প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীনিতাগোপাল এই প্রাণ মুঠো-মুঠো ছড়াইয়া রাখিয়া স্বতন্ত্র ও গণতন্ত্রী জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাই পণ্ডিত কুলীন ধনী-নির্ধন তিনি বরাবর এড়াইয়া চলিয়াছেন; তিনি অত্যন্ত দীন হীন তাপিত সাধারণ মানুষের মধ্যে পরমানন্দে রহিয়াছেন—আর তাহাদেরই মধ্যে ভগবানের সকল নামরূপ আস্বাদন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অবতীর্ণ পুরুষোত্তমের তত্ত্ব-জীবনে অবগাহন করিতে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এই আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলিয়াছিলেন—"বিজ্ঞানের পরস্পর বিভিন্ন ঘটনা-গুলিকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করতে যেমন একটা general law-এর মধ্যে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়, তাতে যেমন ঐ প্রতিটি ঘটনার স্বাতন্ত্র্য মোটেই নষ্ট হয় না—কেবলমাত্র তার ব্যাখ্যাতই হয়—এ ক্ষেত্রেও তাই-ই। কোনও বৃহত্তর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আত্মসমর্পণের অর্থ আমার বিশ্লেষণ সাধন নয়, তার মধ্য দিয়ে নিজেকে কেবল explained-ই করি মাত্র"। নদী সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া বিলুপ্ত হয় না—তাহার চিরন্তন প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাগরে আত্মসমর্পণ তাহার জীবনে অপরিহার্য সত্য ধর্ম। অবতার-জীবন L. C. M.; ১৫-রূপ l. c. m.-এর মধ্যে ০, ৫ কি বিলুপ্ত হয়? স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও একটা ব্যাপকতার মধ্যে তাহারা অনিবার্যের সত্য হইয়া দাঁড়ায়। বহু সমস্যাপীড়িত আমরা সাধারণ মানুষেরা যদি অমনি একটি গভীরতর ব্যাপকতর সত্তা-চৈতন্য-আনন্দের মধ্যে নিজেদিগকে প্রস্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সত্তা চৈতন্য আনন্দ সার্থকতা লাভ করিয়া জীবনকে স্থিতি তৃপ্তি সোয়াস্তি শান্তি দিতে পারে।

এই অবতার জীবনের আর একটি বড় সৌন্দর্য সবাইকে মর্যাদা দেওয়া। পাণ্ডিত্যে কুলে বা ধনে যাহারা বড় তাহারা তো সকলের কাছেই মর্যাদা পায়, কিন্তু যাহারা অপণ্ডিত, অকুলীন, বা নির্ধন তাহাদের যাহা মর্যাদা রক্ষা পায় এই অবতীর্ণ পুরুষোত্তম-জীবনে। শ্রীনিতাগোপালের জীবনে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাই তাঁহাকে ভালবাসি। সবাই বলিতে পারি 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাই কো অবহেলা'। কোন রকম অভিসন্ধিহীন মর্যাদা-দান এ সংসারে দুর্লভতম বস্তু। ধনজন প্রভৃতি অনেক কিছুই এ বিশ্বে তবু মেলে—মেলে না মর্যাদা। মানুষ মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান দেবে, তাহার অক্ষমতারও অপমান করবে না, অথচ কৃপাও করবে না—এইটি পাওয়া খুব দুষ্কর। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-জীবন প্রাণের মূর্ত বিগ্রহ—তাই তত্ত্বে তিনি লিখলেন 'অন্নদ পূর্ণ', দৃষ্টান্তে তিনি বন্ধিতের, নিপীড়িতের, সমাজের বান্ধব, আশ্রয়; সকলের মর্যাদাদাতা। তাঁহারই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছিল তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজে—আমরা পুরুষোত্তমানন্দ-জীবনে শ্রীনিতাগোপালের তত্ত্ব-জীবন মূর্ত দেখিয়া তাহাতেই আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

এ সংসার শ্রীনিতাগোপালেরই আবাস-ক্ষেত্র, তাঁহাদ্বারাই বাসিত—কিন্তু কেমন করিয়া সে কথা জানা যায় তাঁহার স্নেহকৃপা ব্যতীত? তাহা না জানিলে, তাঁহার আহ্বানে জীবন আরম্ভ না করিলে, তৎ-মূল হইতে রস সংগ্রহ না করিলে তো এ সংসার ভীষণ মূর্তি ধারণ করে, সংসারের সে ভীষণতা হইতে অব্যাহতি পাইব কিরূপে? তাই তাঁহাতে চিত্ত আধান করিয়া, তাঁহা হইতে রস আহরণ করিয়া তাঁহারই এ ভুবনে পরমানন্দে থাকা যায় বহু ঘটনার আবর্ত সত্ত্বেও। তাই তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে ভালবাসিতে ভাল লাগে, তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার ভুবনকে দেখিতে পাওয়ার বাসনায় তাঁহাকে চাই। আজ তাঁহার এই একশত চব্বিশ-তম জন্মদিনে তাঁহার রূপ ও স্বরূপ ধ্যান করি। বিশ্বের প্রতিটি দেশ, প্রতিটি সংস্কৃতির মিলনের যে আভাস দিকে দিকে অথচ প্রত্যেকের নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া—এ তত্ত্বই শ্রীনিতাগোপাল-তত্ত্ব। ভারতবর্ষের এই ব্যাপক গভীর জীবন-ধারণার মধ্যে সকলেই মিলিত হইবে—যেমন শ্রীনিতাগোপাল-জীবনে প্রতি দৃষ্টিকোণ মিলিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া আছে। আবারও তাঁহার অপরূপ রূপ ও স্বরূপ ধ্যান করি। বিশ্বের দ্বন্দ্ব প্রশমিত হইবে এই রূপ ও স্বরূপের ধ্যানে, মানুষ আনন্দিত হইবে, সুস্থ হইবে, স্বস্থ হইবে। জয় শ্রীনিতাগোপালের, জয় তাঁহার সর্ব সমন্বিত, পরস্পর বিপরীত সমন্বিত অপূর্ব বিশ্বের এবং সেই বিশ্বের চিত্রপট শ্রীনিতা-গোপালের। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(১৯৮৫)

আমাকে এই 'প্রেম' দেও। রেণু, সন্ধ্যায় পি, সাহার ওখানে যায়। Sabal—এক মাত্রা ব্যবস্থা করেন। অজিতের সঙ্গে শাপের রহস্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাহার মনটা অনেকটা হালকা হইয়াছে। সে ছিল শাপ-ভয়ে ভীত। গুরু তাহাকে ব্রহ্মশাপ দিয়াছিলেন।··· পুনিহাটের লালবিহারী দত্ত (সৎসঙ্গের শিষ্য) দেখা করিতে আসেন। তাহাদের সাধনা 'যজন যাজন ইষ্টভৃতি'। ইনিও একজন ঋত্বিক। ইহারও তাঁত শত শিষ্য আছে। ইহারা সকলেই অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য। ঋত্বিকরা শুধু 'বাহক'—ইহাই ইহারা বলেন। অজিতের মা এখনই অজিতকে কাজ করিবার জন্য তাগিদ দিতেছে। এই তো সংসার। আমার এখানে থাকায়ও ইহারা বাধা দিবে। তাহাদের হাতের মুঠার মধ্যে না থাকিলেই তাহারা নারাজ হইবে। অজিত দীর্ঘদিন আপন জনের স্নেহ হইতে বঞ্চিত, সর্বহারার মত। ১১ই নভেম্বর

ঠাকুর, 'শরৎ, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন ভগবান অন্তর্যামী রূপে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন'—তোমার এই বাণীর সত্যতা জীবনে প্রতিদিন উপলব্ধি করি। গত কাল 'শাপের রহস্য' সম্বন্ধে যে তত্ত্বকথা উদ্ঘাটিত করিলে, তাহাতে শাপ-ভয়ে ভীত অজিতের মনটা খুব হাল্কা হইয়াছে। তাহার শ্রীগুরু শাপ দিয়াছিলেন, 'তোমাকে কর্ম করিতে দিব না, দেখি কি করিয়া কাজ কর। অজিত ইহাকে মানিয়া না লইয়া প্রতিপক্ষ হিসাবে ইহাকে challenge করিয়াছে—এই অন্তর্দ্বন্দ্বে সে পীড়িত। সে বিশ্বাস করিবে যে তাহাকে কাজ করিতে গুরু দিবেন না, অথচ সে-ও কাজ না করিয়া ছাড়িবে না—ইহাই তাহার মানসিক বিকৃতির প্রধান হেতু। পরীক্ষিৎ শাপগ্রস্ত, শাপগ্রস্ত গোলোকের রাধা-কৃষ্ণ, শাপগ্রস্ত দশরথ, শাপগ্রস্ত নরসিংহ, শাপগ্রস্ত হরিশ্চন্দ্র, শাপগ্রস্ত বৈকুণ্ঠের জয় বিজয়; কে না এ দেশে শাপগ্রস্ত? যাহা এই স্তরে শাপ, তাহা পুরুষোত্তম-স্তরে 'বর'। শাপের নিগূঢ় অর্থ অব্যবধানে পাওয়াকে অনন্ত দেশ কালের ব্যবধানে পাওয়া। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে পাইলেন দেশ ও কালের শত ব্যবধানের ভিতর। অব্যবধানে মানুষ মানুষকে বা বস্তুকে পাইতে চায়, কিন্তু এই পাওয়া সত্তা পাওয়া তখনই হয় যখন তাহাকে দেশে কালে, অনন্ত ব্যবধানে পাওয়া হয়। 'Maximum distance is the shortest.' 'যৎ দূরে তৎ উ অন্তিকে'। কেহ কাহারও একান্ত দূরেও নয়, একান্ত নিকটেও নয়। ব্যবধান অব্যবধানের সম্বন্ধই সত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মও যেমন সত্য, দেশ কালও তেমনি তুল্যভাবে সত্য। তোমার জয় হউক। বৈকালে অবনী সরকার গাড়ী নিয়া আসে। আমি উষাঙ্গিনী অজিত ও রেণু উল্টাডাঙ্গা সর্বজাতি সঙ্ঘের দ্বারা পূজিতা শ্রীকালীর উদ্বোধন করিতে যাই। উদ্বোধন করা হয়। ৬টা হইতে ৭-৫ মিঃ পর্যন্ত মায়ের তত্ত্ব

আলোচনা হয়। 'যত্রাস্তি ভোগঃ' শ্লোকখানা আবৃত্ত হয়। আলোচনা ভাল হয়। শ্রোতৃবৃন্দ পুলকিত হন। আমার guard of honour স্বরূপ ব্যাণ্ড বাজানো হয়। যুগান্তর পত্রিকার সাব এডিটার সারদাবাবুসহ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা hate করেন। সকলেই খুব আদর করেন। লোক মন্দ হয় নাই। আমার ব্যাকুল আহ্বানে যদি ঠাকুর সকলের মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠেন, তবে প্রচারে কয় দিন লাগে? ঠাকুরের কথা হয়। 'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি।'—'ট'্যাকে টাকা ও সমাধি একমাত্র নিতাগোপালেই হয়'—I am a cosmopolitan ইত্যাদি।''''১২ই নভেম্বর

স্বাধীনতা আসার পূর্বে মায়ের মোক্ষদা মূর্তির পূজাই এ দেশ করিয়াছে। আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মায়ের ভোগদা ও মোক্ষদা রূপের পূজা চলিবে। 'যত্রাস্তি ভোগঃ ন চ তত্র মোক্ষঃ, যত্রাস্তি মোক্ষঃ ন চ তত্র ভোগঃ। শ্রীসুন্দরীপূজন-তৎপরাণাম্ ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।'—কালীমাতার চরণ-পূজনতৎপর ভক্তগণের ভোগ ও মোক্ষ করতলগত। আজ মোক্ষ ও construction-এর সমন্বয়ের দিন। দশমহাবিদ্যার একদিকে কালী, অপর দিকে কমলা। কালী-কমলার সমন্বয় করিতে হইবে। সর্বসংস্কার মুক্তির জন্য কালীপূজা, বিপ্লবময়ীর পূজা। সেই বিপ্লব লইয়া নূতন বাঙ্গলা, নূতন ভারত, নূতন বিশ্ব গড়িতে হইবে। মায়ের চরণ-তলে সর্বজাতি সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শ্রীনিতাগোপাল মহাকালীর পূজার মাধ্যমে সর্ববর্ম সমন্বয়, সর্বদর্শন সমন্বয়, সর্ব জাতি সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। 'I am a cosmopolitan' বাণী ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিতে হইবে। না হইলে সর্বসমন্বয় অসম্ভব। আজ বাবা নীলকমলের তিরোভাব দিবস। তাঁহার আনন্দময় জীবন আমাকে চিরদিন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমার জীবনে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত থাকুক। 'আর কিছু নাই এ সংসারে কেবল কালীনাম সার রে'। জয় কালী। বেণু মঠ হইতে ফুল নিয়া আসে। চণ্ডীর পাঠ আরম্ভ হয়। কালী-তত্ত্ব ও ভক্তিযোগ দর্শন মিলাইয়া আলোচনা করা হয়। শিবের বুকে শক্তি, নিস্তরঙ্গের বুকে তরঙ্গ, স্থিতির বুকে গতি। স্থিতিও অনন্ত, গতিও অনন্ত। ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয়। সমগ্রের মধ্যে স্থিতি গতি সমন্বয়। শক্তি ও শক্তিমান দুই বি-ভক্তির (divisibility) যোগই ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ হইতেছে শক্তি-শক্তিমানের যোগ। ইহাই শ্রীনিতাগোপালের দান। যাহা কিছু বর্ণাশ্রমে অশুচি, তন্ত্রে তাহা ব্রহ্মমূলে গৌরবান্বিত। শ্মশান পাবক, নারী শুচি, নারীই প্রথম ঋতুর চক্র তিলক রূপে বাঞ্ছিত হয়। কালীপূজার অর্থ মরণের পূজা, নচিকেতার মৃত্যুর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তি। 'মৃত্যুঃ যস্য শরীরম্'। মরণের বুকেই অমৃত। কালী কামাখ্যা। নারীকে লইয়া কামদমনের অপূর্ব সাধন। বৃন্দাবনে এই তান্ত্রিকতার সাধনাই হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম নারী-বিরোধী, তন্ত্র নারীর মহিমাকীর্তনে মুখর। শ্রীনিতাগোপাল তান্ত্রিক সাধনাকে বৈদান্তিক সাধনার সঙ্গে সমন্বয় করিয়া এক মহা সমন্বয়ের বার্তা শুনাইয়াছেন। হঠাৎ নলিনী, সুশীল দত্ত, জিতেন্দ্র দত্ত আসিয়া উপস্থিত শ্মশানে প্রার্থনা করিতে নিবার জন্য অশ্বিনীবাবুর স্মৃতি-স্তম্ভের

কাছে। আমরা যাই। বীরেন ডাক্তার আসে। উষাঙ্গিনী বেহালা বাজায়। নলিনী ঘোষ আসেন রাত্রি ৮।৯টায়। ১৩ই নভেম্বর

ঠাকুর, মানুষ আমার সঙ্গে চলিতে পারে না কেননা আমি প্রতিটী কর্মকে 'হচ্ছে'র দ্বারা, একটী technique-এর যোগে চালাইতে বলি। একান্ত 'করা' ও একান্ত 'না-করা' কোনটী সত্য নয়। 'হিংসা করিও না' বলিলে মানুষ বোঝে, হিংসা না করার সাধনা অভ্যাস করিতে পারে। কিংবা 'হিংসা করিও' বলিলে তাহাও বোঝে। উহার মধ্যে বিচার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন বলা হইল 'যস্য নাহংকৃতঃ ভাবঃ বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে', তখন যে হিংসা করাও নিষিদ্ধ হইল না, নিষিদ্ধ হইল যেমন তেমন করিয়া হিংসা করা, বিচার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা হইল, অহঙ্কার আছে কি না, বুদ্ধি লিপ্ত হইল কি না—তখন আর বোঝে না। অহঙ্কার না থাকা ও বুদ্ধির নির্লিপ্ততা চেনা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। তাই এই সাধনায় মানুষ অধই জলে পড়ে। আমি তো, ঠাকুর, এই সাধনা ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না। করার না-করা, না-করার করা— ইহাই তো পুরুষোত্তম-বুদ্ধি। লোক তাই আমার কেহ নাই। আমি প্রবৃত্তির কথা বলি, নিবৃত্তির কথাও বলি। সংসারও সত্য বলি। কিন্তু সে সংসার তো কৃষ্ণের সংসার হওয়া চাই। সংসার যখন সত্য বলি, তখন সন্ন্যাসও তো সত্য বলি। 'সংসার সত্য' এই অংশটুকু শুনিয়া সকলে বেশ বিরক্ত হইয়া পড়ে। কি আমি করিব? মানুষের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ আমি করি না। টানাটানি আমি করিতে পারি না। আমি অনন্ত নিরুপায়তা, একাকিত্বের মধ্যে আছি। তুমি, তুমি, তুমিই শুধু আছ। আমার যাহা কিছু আছে, উজাড় করিয়া দিবার জন্য পাগল। কিন্তু কয়জন আমার জন্য আছে? তুমি আছ, তাই আজিও চলি, গর্জন করি। কুসুম ৮টার পর কাঁচড়াপাড়া যায়, বেণু ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসে। প্রায় ৭টায় পার্ক সার্কাস হইতে লোক আসে; আমি বেণু গোপা ও অজিত যাই। ৪৫ মিনিট বক্তৃতা হয়। বিনয়বাবুকে ঈশ, কেন, সমন্বয়মূর্তি, নিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে ১ খানা করিয়া দিয়া আসা হয়। কালীতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। রাত্রি ২টা ও প্রায় ৫।৬ টায় উঠি। একটু উপকার হইতেছে। ১৪ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার সঙ্গে আমার অপ্রয়োজনের সম্পর্ক। ব্রজলীলায় সম্পর্ক মোক্ষের ও একান্ত প্রেমের সম্পর্কও যেমনি, প্রয়োজনের সম্পর্ক, বিধির সম্পর্ক, ধর্ম অর্থ কামের সম্পর্কও তেমনি। তুমি ব্রজবল্লভ, তুমি দ্বারকাধিপতি। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সমন্বয় তুমি। একান্ত প্রয়োজনেও জীবনে চলে না, পূর্ণ হয় না, একান্ত অপ্রয়োজনেও জীবন চলে না; পূর্ণ হয় না। বিশ্বের সম্পর্কই প্রয়োজনের সম্পর্ক, বিশ্বাতীতের সম্পর্কই অপ্রয়োজনের সম্পর্ক। সমন্বয়ের এত বড় ব্যাপকত্ব ও গভীরতার আস্বাদন ও প্রচার কে করিয়াছেন তুমি ছাড়া? মানুষ কি ইহা নিতে পারিবে? না নিলেও তো মানুষ বর্তমান যুগের মানুষ হইবে না। বর্তমান যুগ যে 'সমগ্র' জীবন লাভের যুগ অপ্রয়োজনের দিকে ছিল নিবৃত্তিপরায়ণ ভারতবর্ষের দৃষ্টি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাই সে এত দীন, পরাধীন ছিল। এত দৈন্য লইয়া কি মোক্ষ হয়, না প্রেম

হয়? পেটে অন্ন নাই, অথচ প্রেম করিবে ইহা হয় না। অন্ন ও প্রেম একই সমত্র জীবনের দুইটী সমানভাবে প্রয়োজনীয় আস্বাদন। জীবন যেমন অপ্রয়োজনে, ছুটিতে সার্থক, তেমনি প্রয়োজনে, বন্ধনেও সার্থক। ছুটির আনন্দ ও বন্ধনের আনন্দ দুই-ই চাই। তবে না পরিপূর্ণ সার্থকতা মিলিবে? তোমার পাদস্পর্শে বিশ্ব ছুটি পাইবে, মুক্তি পাইবে, আবার ভোগও পাইবে, অনন্ত বন্ধনের রস আস্বাদন করিয়াও ধন্য হইবে। তোমার জয় হউক। ২।০টায় অশ্বিনীকুমার বলোনী হইতে বীরেন্দ্র প্রসাদ গুহ তাহার মোটর লইয়া আসে। আমি বেণু অজিত ও গোপা যাই। গুহাদ্বারের কোড়াটা বেশ বড় হইয়াছে, টাটাইতেছিল। যাইতে ৪৫ মিনিটের কিছু বেশী লাগে। ৬টার পর সভা আরম্ভ হয়। 'যত্রাস্তি ভোগঃ' শ্লোক—গোলোক ও মাটির একীকরণ—মায়ের পূজার অর্থই বিশ্বের পূজা—মিতাগোপালের অড়াঅড় সমন্বয় ও I am a cosmopolitan' উক্তি—নরনারীর এক ক্ষেত্রে মিলন ও তাহার সমাধান—বিশ্বরূপ হওয়ার আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত মাধবদাস এম, এ. সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সভাপতি হন। তিনি বলেন, 'এইরূপ বক্তৃতা বেশী শুনি নাই'। আলোচনা ভাল হইয়াছে। বীরেনবাবুর বাসায় জলযোগ করি। ভূপতি সেন, বীরেনবাবু, নীরোদবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আসিবার সময় ১৭টা লাগে। আসার পরে বুনু, পদ্ম, পুটু ভাইফোঁটা দেয়, তাহাদের প্রত্যেককে ১৲টাকা করিয়া দেই। ভূপতিবাবু ১০৲টাকা দেন। বীরেনবাবু ১০০৲টাকা দিবেন বলিলেন। উদ্বাস্তিনী মন্থর বাসায় যায়।...১৫ই নভেম্বর

ঠাকুর, তোমার কৃপায় মাটির দাবী ও আকাশের দাবী এক করিয়া এই মাটির জগৎকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম গোলোক বৈকুণ্ঠ। পথ আমার চিরসাথী, বুদ্ধি আমার নাই; তাই ধনজন আমার নাই। সম্বল শুধু প্রাণ। প্রাণের তাড়নায় মানুষ পাইবার জন্য তাহাদের আবেষ্টনের মধ্যে, তাহাদের সকল সমস্যার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি, এক হইতে চাহিয়াছি, তাহাদের দারিদ্র বহিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি. যদি তাহাতেও তাহাদের পাই এই লোভে। গুরুগিরি বাবাগিরি স্বামীগিরি করিতে পারি নাই। করিলে প্রচুর শিষ্য করিতে পারিতাম, মানুষের বা অর্থের দুঃখ থাকিত না, নরনারায়ণ আশ্রম গড়িয়া তুলিতে বেগ পাইতে হইত না। প্রণাম লইতাম, পাদোদক খাওয়াইতাম, টাকা পাইতাম। সংসারীদের চেয়েও সুখে থাকিতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে দুঃখের পথের যাত্রী—তুমি আমি তো সংসারে সুখ ভোগ করিতে আসি নাই। মহাপ্রভু এই কথাই লোকনাথকে বলিয়া ছিলেন, 'লোকনাথ, তুমি আমি সংসারে সুখ ভোগ করিতে আসি নাই'। সকলের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগকে অদুঃখ করাই তো জীবন-ব্রত। সুখের জীবন আমার নয়। আমি শ্মশানবাসী শিব-কালীর সন্তান। আমি শিবা যাহারা সৃষ্টি করিবে, তাহারা তাহা করিবে মরণ বরণ করিয়াই। মরণের বুকেই অমৃত নিহিত। মরিয়াই বাঁচিতে হয়। মরণ আমার খেলার সাথী। মরণ যে আমার পুরুষোত্তমের শরীর। 'মৃত্যুঃ যস্য শরীরম্'। গোকুল দাস আসে ৯।০ টায় পর। তাহারা সমাজ-বিরোধী পথে চলিয়াছে। ইহাকে একটী

সুন্দর পরিণতিতে নিতে হইলে যে চিন্তাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া দরকার তাহারা তাহা লয় নাই। কাজেই সজ্ঘর্ষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। বিচ্ছেদ হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে আসিবার জন্য বড় বার বলি। বেণু ১২টার পর পালকিয়া অবনী সরকারের বাসা, বিশ্বভারতী ও তালতলা মাখনের স্ত্রীর কাছে কুসুমের কাপড় দিয়া সন্ধ্যার পর ফেরে। কুমারের চিঠি আসিয়াছে। আমার ফোড়াটা কাটিয়া গিয়াছে। আমি সহজাবস্থার কথা বলি। 'দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা'। প্রচলিত ধার্মিক ও সামাজিক কাঠামো এই সহজ জীবন লাভের অন্তরায় হইয়া আছে। অন্তরে অন্তরে প্রত্যেকেই যুগ-দেবতার প্রেরণায় এই অবস্থা চায়। কিন্তু বাধা দেয় বাহিরের আবেষ্টন। আমি এই আবেষ্টন ভাঙ্গিয়া সহজাবস্থার অনুকূল-রূপে গড়িবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। লোকেদের তাই এখানে আসিতে এত অসুবিধা। ঠেলাঠেলি দাপাদাপি করিয়া জীবন কাটাইব। ১৬ই নভেম্বর

ঠাকুর, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' এই লোকোক্তি তোমার কৃপায় আমার জীবনে ব্যর্থ। বরিশালের গেঁয়ো যোগী শরৎকুমার ঘোষ বরিশালেই যথেষ্ট ভিক্ষা পাইয়াছে, সমাদর, যত্ন, গৌরব লাভ করিয়াছে। বরিশালের বাহির হইতে সে ভিক্ষা পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা বরিশালের স্বতঃ প্রেরণায় পাওয়া দানের পরিপূরক হিসাবে, বরিশালকেই বরিশালের বাহির পূর্ণ করিয়াছে। ঘর ও বাহির আমাকে সমভাবে প্রেরণা ও মমতা যোগাইয়াছে। ঘর আমায় শুদ্ধ করিয়াছে বাহিরকে, বাহির শুদ্ধ করিয়াছে ঘরকে। ঘর বা বাহির কেহই পৃথকভাবে আমার জীবনে প্রেরণা আনিতে পারে নাই. আমি ছিলাম সমন্বয়ের উপাসক। লবন আইন অমান্যের প্রাক্কালে ছিলাম বোম্বাইয়ের সুরাট শহরে। মহাদেব দেশাইয়ের সঙ্গে সুরাটে আমার দেখা। তিনি মহাত্মাজীর জন্য সল্ট বেড খুঁজিতে গিয়াছিলেন। প্যাটেল যেদিন গ্রেপ্তার হন, সেদিনও আমি সুরাটে আমি বরিশালে ছুটিয়া আসিলাম আন্দোলনে যোগদানের জন্য। War-c-এর প্রধান পদে নিযুক্ত হই ও মৃত্যুকাল হওয়ানা হই গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া। ৮০ মাইল দূরে নলছিড়া গ্রামে গ্রেপ্তার হই। আগষ্ট আন্দোলনেও বরিশাল গিয়া গ্রেপ্তার হই। যে পুরুষোত্তম-দর্শন পাইয়াছি তাহা লইয়া ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাইবার জন্য বন্ধুগণ অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়াই যাই নাই। বাহিরের অনুকরণকার, সার্টিফিকেট তিলক হইয়া সস্তায় নিজের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশকে অবমানিত করিবার বুদ্ধি আমার নাই। দেশের বুকে দাঁড়াইয়া, দেশের আদর অনাদর পরিপাক করিয়া দেশের লোকের মধ্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইব, ইহাই ছিল লোভ। তোমার জয় হউক। বেণু সন্ধ্যায় হরিদাসী ও মধুর বাসায় দেখা করিয়া আসে। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় প্রকৃত নল ও নল-রূপী দেবগণের পার্থক্য নিরূপণ করিতে গিয়া দময়ন্তী লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত নলের পা মাটি স্পর্শ করিয়া আছে, আর নলরূপধারী দেবগণের পা মাটি স্পর্শ করিয়া নাই। দেবতারা আদর্শবাদী বলিয়া এই বাস্তব মাটিকে স্পর্শ করিতে হইলে দেবগণের মানুষের সহায়তা দরকার। তাই নর নারায়ণ নর-নারায়ণ না হইলে মাটীর জগতের পরম ও চরম কল্যাণ করিতে পারেন না। 'নিমিত্ত-

মাত্র তব সন্ন্যাসী'— অর্জুনকে টানাটানি এই জন্যই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ দিতে পারেন, কিন্তু উহাকে বাস্তবে রূপদান করিবেন অর্জুন। এই সব কথা অজিতের সঙ্গে হয়। রূপ যায় স্বরূপের দিকে, স্বরূপ যায় রূপের দিকে। মাটি যায় গোলোকের দিকে, গোলোক আসে মাটির টানে। ১৭ই নভেম্বর

বৃন্দাবনে (দ্বিতীয় বার) একদিন মাধুকরীতে বাহির হইয়াছিলাম। এক বাড়ীতে মাধুকরী চাহিলে গৃহস্বামী বলিলেন, 'সাধুজী, আমাদের নিকট হইতে নিবেন? আমরা যে রজক। আমাদের নিকট হইতে কোন বাবাজী তো মাধুকরী নেন না'। আমি বলিলাম, 'আমি নিব। জাতি বাঙ্গলায় ফেলিয়া আসিয়াছি। ব্রজে সব ব্রজবাসী বাস করেন। তাঁহাদের জাতি আমি দেখিব না। আপনারা ব্রজের লোক, ইহাই আপনাদের পরিচয়'। মাধুকরী দিলেন, মাথায় করিয়া নিয়া আসিলাম। ভাবিতেছিলাম, 'অজ' হইবার জন্য সারা জীবন ছুটিলাম, জাতি কুল শীল ভাসাইয়া না আসিলে কি কুলত্যাগিনী রাধারাণীকে পাইব? রাধারাণীর দেশেও জাতির স্বপ্ন? জাতির উপরে উঠিব, 'অজ' হইব। শ্মশানবাসী যোগেশ্বর শিব ও কাত্যায়নীর পূজা না করিয়া অর্থাৎ পুড়িয়া ছাই না হইয়া কি ব্রজে প্রবেশ করা যায়? বৃন্দাবনেও জাতি? পরের দিন দেখি, সোনার গৌরাঙ্গের বাড়ীর সামনে (যেখানে আমি ছিলাম) শত শত রজক আমাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত। বৃন্দাবনে আমি ঝোলা বাড়ী হইতে ভিক্ষা আনিয়াছি ইহা তাঁহাদের কাছে কল্পনাতীত ছিল। বৃন্দাবনেও বর্ণাশ্রম? হায়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ! হায় মহাপ্রভু! নিত্যগোপাল, তুমি আমার ও বিশ্ব-জীবনে অন্তর্যুক্ত হও। বেণু সকালে রান্না করে। অজিতের সঙ্গে আলাপ চলিতেছে। দেহ সুস্থ বোধ করিতেছে। জীবনের বাঁহিয়ে রাধারাণী পাই নাই, ভাগবত-চৈতন্যচরিতামৃতের তত্ত্ব কিছুই পাই নাই। রাধারাণী, শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে জীবনের ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়া পাইয়াছি। পরে বইতে পড়িয়াছি। ভাগবতে রাধারাণীর নাম নাই। না থাকুক ভাগবতে, আমার জীবনে তো আছে। Radha is a historical truth with me'. বেদব্যাস স্বয়ং আসিয়া যদি বলেন, 'রাধা নাই', আমি তাহা মানিতে পারিব না। একটী ছোট লাল টুকটুকে মেয়ে আমার জীবনের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়—আমি কি করিয়া অস্বীকার করিব? রাধা আমার অস্থিমজ্জায়, সকল সত্তায়। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া রাধা-কৃষ্ণ আমার জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। আমার জীবনে 'পাওয়া' আগে, পরে তাঁহাকে অনন্ত জীবন-পথে 'ever becoming'-এ বন করিয়া পাওয়া, যাহারই নাম হইতেছে সাধনা। উপনিষৎ আমার 'জীবনে' আগে, পরে 'বুদ্ধিতে'। হীরেন দত্ত তাই বুঝি এক দিন আমার বক্তৃতার শেষে সভাপতির আসন হইতে বলিয়াছেন, 'বক্তার শাস্ত্রের ভিতর এক নতুন দৃষ্টি খুলিয়াছে'। হাঁ, সব শাস্ত্রকে আমি নতুন করিয়া পাইয়াছি, ঠাকুর, তোমার কৃপায়। ১৮ই নভেম্বর

ঠাকুর, আমার জীবন তোমার কৃপায় 'সমগ্র'-কে অবলম্বন করিয়া অংশে, ব্যষ্টিতে আসার জীবন। মনে পড়িতেছে একটী ঘটনা। চাঁদপুর কুলী হত্যার জন্য টিমার ষ্ট্রাইক দেশবন্ধু ঘোষণা করিয়াছেন। গোয়ালন্দ চাঁদপুরে পুরাদমে ষ্ট্রাইক, কিন্তু

বরিশালে ষ্ট্রাইক না হইলে সে স্থানের ষ্ট্রাইক বহাল রাখা সম্ভবপর হইতেছে না। অশ্বিনীবাবু দারা চকবাজার ঘুরিয়া ওসমান মুন্সীর (ষ্টিমার কোম্পানির এক বিশিষ্ট কর্মী) অনেক খোসামুদী করিয়া কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। ওসমান মুন্সীকে তাঁহার জমিদারীতে চিরদিনের জন্য বেশী মাহিয়ানায় চাকুরী দিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। ষ্ট্রাইক হইতেছে না। মাদারীপুর হইতে আসিলেন শ্রীযুক্ত প্রতাপ গুহরায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তাঁহারাও কিছু করিতে পারিলেন না। আমি তখন প্রচারের জন্য মফঃস্বলে ছিলাম। আমি বরিশাল সহরে আসিলে প্রতাপ-বাবুরা বলিলেন, 'বরিশালে আর স্ট্রাইক হইল না, আমরা চলিলাম'। আমি বলিলাম, 'একদিন অপেক্ষা করুন'। সেদিন বৈকালে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে সভা ঘোষিত হইল—আমার বক্তৃতা হইবে। লোকে লোকারণ্য—আমার সভায় ঐরূপ লোকই হইত। অন্যান্য বক্তা থাকিলেও আমাকে ৫ মিনিট বলিলেও বলিতে হইত। আধ ঘণ্টা বক্তৃতায় stirring appeal করিলাম হরতালের জন্য। জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা গর্জন করিয়া বলিলেন, 'আপনি কি চান'? আমি বলিলাম, '৭ দিন হরতাল'। জনসাধারণ বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে'। জনসাধারণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া কাউনিয়া, বগুড়া, আলেকান্দা, চক-বাজার প্রভৃতি পাড়ায় আগামী পরশু হইতে হরতাল হওয়ার ঘোষণা দিয়া আসিলেন। সহর গরম হইয়া উঠিল। চকবাজারের দোকানদারগণ বিপদ গণিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'কি, অশ্বিনীবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হরতাল ঘোষণা করিলেন? অশ্বিনীবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, আর সুরেনবাবু করিলেন না। দেখি, কি করিয়া হরতাল হয়'। খবর আসিল, তাঁহারা চক-বাজারের পিছনে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। আমি, দুর্গামোহনবাবু, মুকুন্দ দাস ও সুরেশ গুপ্ত কাদা পায়ে সেখানে গিয়া হাজির। তখনও সকলে সমবেত হন নাই। আমাদের দেখিয়া তাঁহারা কতকটা ঘাবড়াইয়া গেলেন। কয়াসের উপর বসিতে বলিলেন। বসিলাম, আমি কাদা পায়ে। একটা কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আপনারা বৈষ্ণব অনেকেই। মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত। সনাতন একদিন মহা-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়'। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস'। চাঁদপুরের কুলিরা কি কৃষ্ণদাস নয়? আর তাহাদের বুক সঙ্গীন-বিদ্ধ হওয়ায় কি বাঙ্গলার মাটী বৈষ্ণবের রক্তে কলঙ্কিত হয় নাই? আপনারা বৈষ্ণব হইয়া কি সহ্য করিবেন এই রক্তপাত? 'আচ্ছা, বসুন' বলিয়া তাঁহারা নিজেরা পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, ৩ দিন হরতালের কথা স্বীকার করিলাম। ৪ দিনের কথা পরে বলিব'। আমরা 'বন্দেমাতরম্' দিয়া কোলাকুলি করিয়া চলিয়া আসিলাম। তোমারই জয়। ১৯শে নভেম্বর

গতকল্য সকালে ক্ষিতীশ চক্রবর্তী (গুরুভ্রাতা) আসিয়াছিলেন ৮ টা. টায় আসন্নজি আমাকে ক্ষৌর করিতেছিল। ক্ষিতীশ তারা বলিলেন, 'দাদা, একটু দাড়ি রাখিলে ঠিক ঠাকুরের মত দেখাইত। পা দুখানি তো ঠিক ঠাকুরের মত'। শিশু, বৃদ্ধ, পরিচিত অপরিচিত অনেকেই, ঠাকুর,

তোমার কটোকে আমার কটো বলেন। ইহা না কি সারূপ্য। আমার প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ যদি তোমার সমানরূপতা প্রাপ্ত হইত, যদি আমি তুমি বনিয়া যাইতাম, যদি আমার শূন্য হওয়ার বুকে পূর্ণ তুমি প্রতিষ্ঠিত হইতে, যদি আমাকে দেখিয়া ছুঁইয়া ভালবাসিয়া লোকে তোমাকেই দেখিত, ছুঁইত, ভালবাসিত, যদি আমাকে পাইয়া মানুষ তোমাকেই পাইত, তবে তোমার সেবা সার্থক করিতে পারিতাম, আমার সার্থকতা মিলিত। কত দিন 'নিত্যগোপালোহহম্' জপ করিয়াছি! তোমা হইতে আমার কোন পৃথক সত্তা আছে আমি ভাবিতে পারি নাই। আমি না – তুমি সেই না-এর বুকে হাঁ। তুমি কায়া, আমি ছায়া। তুমি আমি দুই মিলিয়া, এক-তনু, এক-প্রাণ, এক-মন, এক-বিজ্ঞান, একানন্দ হইব। কাল সন্ধ্যায় চারুচন্দ্র রায় (দিনাজপুর) ও নকুলেশ্বরবাবু আসেন। আকাশ-মাটির সময়য়ের কথা হয়। 'মাটিতে যে থাকে তার থাকা ভাল মাটিতে' ইত্যাদি অন্ততঃ ১ ঘণ্টা আবেগের সহিত আলোচনা হয়। নকুলবাবু বলেন যে আমার চেহারা ঠিক ঠাকুরের মত। আমি মহানির্বাণ মঠে আলোচনা করি নকুলবাবু তাহা চান। আমি চেষ্টা করিতেছি, করিবও। কিন্তু বর্তমানে মঠে পাঠ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর, তোমার ইচ্ছা হইলে বিজয়ীর বেশে তোমাকে বুকে লইয়া সেখানে প্রবেশ করিব। অজিত ও রেণু মঠ হইতে বুল নিয়া আসে। ঠিক ৪টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। নূতন লোক আসিয়াছেন। চারু রায় খুব impressed হন। নীলরতন বাবু, ললিত সরকার, বিলাস রায়, রমেন্দ্র ঘোষ, শীতলবাবু, আরও নূতন নূতন লোক আসেন। 'নৈবাত্মনঃ প্রভবতো নিজলাভপূর্ণ.. প্রতিমুহূর্তা যথা মুহুঃ' শ্লোকটার ব্যাখ্যা হয়। 'পূর্ণ ও করুণ' পরস্পর-বিরুদ্ধ। আমার ব্যাখ্যা করি। রাজেন, বিমলা আসে; বিনোদ দুঁইয়া, সতীন্দ্রও আসে। বিমলা কচুরী আনে। রাজেন ২টি কমলা। মণি বাগচী সভার শেষে আসে। নবেন্দু দত্ত মজুমদার (নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের বড় ভাই) আসে মহানির্বাণ মঠ হইতে আমার সংবাদ পাইয়া। তাহার সঙ্গে ২–২৫ পর্যন্ত আলোচনা হয় Matter and Light ও Physics and Philosophy অবলম্বনে ভারতের মাটিতে মার্ক্সের কি রূপান্তর হইবে, গিরিধারী প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়। ২০শে নভেম্বর.

ঠাকুর, 'রামকৃষ্ণের প্রেম নিত্যপ্রেম। নিত্য স্বরূপ যেরূপ অক্ষয়, নিত্য জ্ঞান ও নিত্য প্রেমও তদ্রূপ অক্ষয়'— ভক্তিযোগ দর্শনের তোমার এই কথাগুলি যে কত গভীর অর্থ বহন করে, তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে। যেখানে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক পরকীয়, কেহই অপরের শোষক বা শোষিত নয়, যেখানে তাহারা অনন্ত, সেখানেই প্রেমের নির্বিকারত্ব। যেখানে প্রেমের বহু প্রকাশ হইলেও তাহা অবিভক্ত (indivisible whole unit) রহে, সর্ব লিঙ্গে সর্ব বিভক্তিতে সর্ব বচনে যাহা অব্যয় অক্ষয় রহে, তাহাই নির্বিকার। নিত্যস্বরূপে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় নাই, প্রেমিক-প্রেম-প্রেমাস্পদ নাই; কিন্তু নিত্য জ্ঞানে তো জ্ঞান জ্ঞাতা ভেদ ও নিত্যপ্রেমে প্রেমিক-প্রেম-প্রেমাস্পদ আছে। তবে নিত্যজ্ঞানে ও নিত্য-প্রেমে তাহারা ভিন্ন হইয়াও একই আত্মা। এই

নিত্যপ্রেম অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতেও অবিচ্ছেদ্য। যাহার কালে ক্ষয় হয়, তাহা নিত্যপ্রেম নয়। 'Out of sight out of mind' ইহা নিত্য-প্রেমের লক্ষণ নয়। বিচ্ছেদ হইলে যে প্রেম বিকৃত হয় বা কমিয়া যায় (diminished), তাহাও নিত্যপ্রেম নয়। নিত্যপ্রেম দেশজয়ী, কালজয়ী। নিত্যপ্রেমে দেশে বা কালে যত দূরেই যাউক, তাহা কখনও কমে না। Radiation-এর ধর্মই এই। 'Now the discovery of the photo-electric effect has indubitably shown that every type of radiation produces considerable effects on Matter and these effects donot diminish as the distance from source increases'—Matter & Light P. 45. 'Thus not only in the photo-electric pheromenon, but in all other transfers of energy through space energy is always transferred by complete quanta ; fractions of a quantum can never occur'—Physics and Philosophy page 130. তোমার ভক্তিযোগদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত 'একটী দীপ হইতে বহু দীপ প্রকাশিত হইলে, সেই একটী দীপ বহু-ভাগে বিভক্ত হইলেও তাহা যেরূপ 'অবিভক্তবৎ' রহে, এই অংশ কি উপরোক্ত 'complete quantum'-এর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় না? তোমার জয় হউক। করুণা, প্রেম space-এ যত দূরে যাক, উহা 'অবিভক্তবৎ' রহে—'does not diminish'—কালিকার সভায় ইহা আলোচিত হয়। তোমার জয় হউক। বৈকালে মঠে যাই—বেণু দিয়া ও নিয়া আসে। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু মন্দিরের বারান্দায় পাঠ করিতেছিলেন, সেখানে বসি, পরে পাঠ শেষ হইলে অফিস ঘরের বারান্দায় আসি। দারহাট্টা হইতে ৪টা নভেম্বর লিখিত পত্র এই মঠে আসে। আজ গিয়া পাই। ২১শে নভেম্বর

হরিনেত্রকুলোদ্ভবা মহাকালী দেবী ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইলে বিষ্ণু জাগরিত হইলেন, মধুকৈটভ দৈত্য বিনাশ করিলেন। বিষ্ণু হইতেছেন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির একটি বাস্তব আদর্শ-পরিকল্পনা। ইহা positive। এই পরিকল্পনাকে নিজ জীবনে ঘন করিয়া তপস্যা হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। বিষ্ণুর নানা রূপ। এই পরিকল্পনাও বিষ্ণুরূপ, বিশ্বরূপ। যাহা formal logic-এ abstract বিষ্ণু, তাহাই material logic-এ নূতন বিশ্ব পরিকল্পনা। Form ও Matter এক না হইলে দুই-ই হয় bloodless category—abstract। দুর্গার concrete রূপ উমা। Abstract কালীরূপকে ঘরে ঘরে নারীর মধ্যে কুটাইয়া concrete করিতে হইবে। জীবনের নিষ্ক্রিয় স্তরই 'শিব', ক্রিয়াশিল স্তরই 'কালী'। ব্রহ্মাণ্ডের হইতেছে 'অভ্যুদয়', অগ্নি ও ছিন্নমুণ্ড হইতেছেন 'নিঃশ্রেয়স'। মা হইতেছেন মরণের ঘন রূপ। শ্যামামূর্তিই তো abstract form-এ বিশ্বের প্রতিটী স্পন্দনে রহিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশকেই দুর্গারূপে পূজা করিয়াছিলেন। বহু-রূপী দুর্গা। সকলের কাছে একরূপে প্রকাশিত হন না। নরনারায়ণ আশ্রম-পরিকল্পনাই আমার ভগবানের একরূপ, বিশ্বরূপ। ইহার মধ্যে ভাব ও রস সমন্বিত। Abstract দুর্গা কালীরূপ ভাবুকতায়

সৃষ্টি করে, বাস্তব মাটির স্পর্শ হইতে সাধক বঞ্চিত হয়। আমার সাধনা formal material, পরম বাস্তব। ঠাকুর, তোমার কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তোমার জয় হউক। অজিতের সঙ্গে দিনে রাতে আলোচনা চলিতেছে। সে অনেক সুস্থ আছে। রাস্তার ইঙ্গিত ক্রমান্বয়ে ক'মিয়া আসিয়াছে। বৈকালে তাহার মা আসেন। ঠাকুরের কাছে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া অজিতের জন্য প্রার্থনা করেন। 'সুস্থ করিয়া আপনি কাজে লাগান'—ইহা আমাকে বলিয়া যান। কাঁদিতে থাকেন। অজিত 'চলার দর্শন', 'সমন্বয়ের বিপদ' প্রবন্ধ পাঠ করে। অজিতের লেপ কিনিয়া দিব বলিয়া দিলাম। একটী কাঁথা দেওয়া হইল। আমার সঙ্গে সে কোনও ব্যবসাদারির মধ্যে যাইবে না, প্রাণ খুলিয়া সেবা করিবে—ইহা সে বলিল। নিজের জন্য টাকার ভাবনা সে করিবে না। ২২শে নভেম্বর

প্রেম মানুষের জীবনের এমন কি ঈশ্বরের জীবনের 'পরম ঐশ্বর্য'। মানুষ ছোট ঐশ্বর্য চায়, এই পরম ঐশ্বর্য চায় কয়জন? ভগবান এই প্রেমের টানেই গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে মাটির দেশে সহজ হইয়া আসেন। প্রেমই পরম বিভূতি। অষ্টসিদ্ধি প্রেমের কিঙ্কর হইবার যোগ্য নয়। অথচ মানুষ বিভূতির কাঙ্গাল। শ্রীনিতাগোপালের জীবনে বিভূতির অন্ত ছিল না। কিন্তু তাহাতে আমার মন ভরে নাই। আমার ভাল লাগে শ্রীনিতাগোপালের কলেরা-রোগে মৃতপ্রায় মনীন্দ্র রায়ের জন্য ব্যাকুলভাবে কান্না—'মা, মনীন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র, মা, মনীন্দ্রকে বাঁচাইয়া দেও'। বিশ্বাস করি, নিতাগোপাল যোগবলে মনীন্দ্রকে বাঁচাইতে পারিতেন, যেমন তিনি একদিন বিসূচিকা রোগাক্রান্ত অমোঘকে বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমের যোগ যে পরম যোগ। মহাপ্রভুর চোখের জল কি পরম ঐশ্বর্য নয়? ষড়ভুজ হওয়ার চেয়েও অধিকতর হৃৎ-রসায়ন নয়? আমার জীবনে কিছু বিভূতি নাই। আমি এক সাধারণ মানুষ থাকিয়াই প্রেমে জ্ঞানে বৈরাগ্যে অসাধারণ হইতে চাই। চতুর্ভুজ নারায়ণকে ব্রজগোপীগণ প্রাণ খুলিয়া দিতে পারেন নাই। নারায়ণ তাহাদের গুরু। কৃষ্ণ তাহাদের নিজ জন। বিভূতিতে যা কিছু পর হইয়া যায়। রাজার কত বিভূতি আছে। কিন্তু সে যখন ঘরে আসে সব ছাড়িয়াই আসে। পিতা স্বামী পুত্র হইয়া আসে। রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও পরম ঐশ্বর্য পিতার স্বামীর পুত্রের। আমি এই পরম ঐশ্বর্যের উপাসক। আমি সহজ মানুষ হইব। ঠাকুর তোমার প্রেমের জয়! রেণু ও অজিত বরিশাল কলোনী হইয়া, চিত্তরঞ্জন কলোনী হইয়া বাগুইআটি যায়। ৩৷৷০ টাকা পত্র লেখে। বীরেনবাবু, ভূপতিবাবু ও নগেনবাবুদের সঙ্গে কথা হয়। ৫ খানি অর্থসংগ্রহের বই ভূপতিবাবুর কাছে দিয়া আসা হয়। ভূপতিবাবুর বাড়ীতে রেণু অজিত খায়। ওদিকে মুষ্টি-ভিক্ষা বসাইবার কথা হয়।...২৩শে নভেম্বর

তিলে যেমন তৈল, দুগ্ধে যেমন মাখন গূঢ়ঃ, তেমনি 'একদেব' তুমি ঠাকুর 'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলঃ নির্গুণশ্চ'। তিল মন্থন না করিলে তৈল হয় না, দুগ্ধ মন্থন না করিলে

যখন বাহির হয় না, সর্বভূত মন্থন না করিলেই বা গূঢ়, ব্যাপী, অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, অধিবাস, সাক্ষী, চেতা, কেবল, নির্গুণ একদেব বাহির হইবেন, জনম নিবেন কি করিয়া? দেখ যে সর্বভূতাদ্বিক, নির্গুণ। তিলের গুণ তৈলে নাই, তৈলের তিল অপেক্ষা একটী বিশেষ গুণ রহিয়াছে; তৈল নির্গুণ— 'স্বগুণৈঃ নিগূঢ়ঃ', ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমেরও সর্বভূতাপেক্ষা একটী বিশেষ transcendent গুণ রহিয়াছে, যাহাকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে। তৈল নিরাকার, তিলের দেহ আছে, আকারও আছে। তৈলের আবেষ্টন তিল। তিলকে মন্থন করিয়াই তৈল তিলাতিরিক্ত, অতিরিচ্যতে, 'অত্যতিষ্ঠৎ'। তিলহীন তৈলের উপাসনায় ভাবুকতা আসে, বাস্তবের স্পর্শ হইতে সরাইয়া আনে। কৃপণ, ঠিকুজীতে বিশ্বাসী যাদব চক্রবর্তীর মত সর্বভূতের দ্বারা পরিচয় হারাইয়া স্ব-পরিচিতি পর্যন্ত একান্ত ব্রহ্ম-উপাসক, একান্ত আত্ম-উপাসক দলও হারাইয়া ফেলে; নিজের কাছেই নিজে শূন্য হয়, 'অসৎ' হয়। একান্ত নির্গুণ কিছুতেই গুণের ক্ষেত্র স্পর্শ করিতে পারে না যদি না নির্গুণ-সগুণ সমন্বিত না হয়। সগুণ মন্থন করিয়া নির্গুণ বাহির হইলেই উহা কারণ অপেক্ষা একটী স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে। তখনই দুই-ই কেবল। এই দুই কেবলের সমন্বয়ই পুরুষোত্তম, কিম্বা পুরুষোত্তমেরই দ্বিধা বিকাশ ঐ দুই কেবল। নিত্যগোপাল অমযুক্ত হউন। স্বামী বিবেকানন্দের 'ধ্যানে' বক্তৃতা পড়ি। রেণু প্রেম ও ব্যাঙ্কে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্যদের চিঠি দিয়া 'সহশিক্ষা ও তাহার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ যুক্ত আশ্বিন সংখ্যা উদ্বোধনখানা পাঠানো হইতেছে। সন্ধ্যার পর অবনী সহকার শিবপ্রসাদবাবু আসেন। অভিনয়ের বানানোর চেষ্টা চলিতেছে।...১৯শে নভেম্বর

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 'ধ্যান'— সম্বন্ধে অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পড়িলাম। এই ধ্যান সর্বভূত হইতে আত্মায় প্রত্যাবর্তন —পরিধি হইতে কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন। আত্মা কেন্দ্র, centralised energy, আর সর্বভূত পরিধি, decentralised energy। আত্মাই স্বদেশ, সর্বভূত বিদেশ। এই সাধনায় গান হইতেছে, 'চল মন নিজ নিকেতনে সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে'। সর্বভূতের ক্ষেত্রে কর্ম করা ইহাদের মতে 'বেগার খাটা'। 'মলেম ভূতের বেগার খেটে। পরভূতে খায় যা বেঁটে'। ইহা 'সর্বভূতে আত্মদর্শন' হইতে পারে, কিন্তু আদৌ সর্বভূত-দর্শন নিশ্চয়ই নয়। সর্বভূতে আত্মদর্শন-এর মধ্যে আত্মাই ধ্যানীর ঈপ্সিততম বস্তু, সর্বভূত ঈপ্সিততম নয়। কিন্তু আত্মার সর্বভূতদর্শনে সর্বভূতই হয় ঈপ্সিততম বস্তু। উপনিষৎ কি এই দুইকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঈপ্সিততম বলেন নাই? "যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি অনুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।" সর্বভূতে আত্মা অদ্বৈত সত্তা। দুইই যখন সমভাবে অনুদৃষ্ট হয়, তখনই তাহা পূর্ণ দর্শন। 'Complete objectivity can only be regained by treating the observer and the observed as parts of a single system'— Physics and Philosophy. স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও বক্তৃতায় রজোগুণের প্রচার সামঞ্জস্যহীন,

contradiction ! গীতার চেয়েও ফুটবল খেলায় কোনও স্তরে শ্রেষ্ঠতা প্রচার তাঁহার দর্শন-দ্বারা সিদ্ধ হয় না। উহা শুধু পুরুষোত্তম-স্তরেই সম্ভব। অথচ এই সামঞ্জস্য হীনতার কথা বর্তমানে বাহিরে বলিবার সময় ও সুযোগ নাই। ঠাকুর, এই সময় ও সুযোগ কি আমার আসিবে না ? অন্তত স্বাধীনভাবে কিছু কিছু চলিতে পারে। ইঙ্গিত দেখিলেও অস্বীকার করিতে পারে। বৈকালে প্রতিভা ইন্দুলেখাদের বাড়ী যায়। দ্রষ্টা হইতে দৃশ্যে- দৃশ্য হইতে দ্রষ্টায়। দৃশ্যের ছবি পড়ে দ্রষ্টার উপর এবং তাহার প্রতিক্রিয়া আসে দৃশ্যে। দুই মিলিয়া দৃশ্য বস্তুর জ্ঞান। পথে যে-কোনও জায়গায় 'ছেদ' হইলে দর্শন হয় না। যান্ত্রিক ধ্যানে এইরূপ ছেদ টানিয়া দৃশ্যের সঙ্গে দ্রষ্টার সম্বন্ধ মুছিয়া ফেলা হয়। দ্রষ্টা এইভাবে কেবল হয়। কিন্তু পুরুষোত্তম-ধ্যানে দ্বিবিধা গতি যুক্ত হইয়া, দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমগ্র হইয়া অথচ কেবল হইয়া তাদাত্ম্য লাভ করে। ইহা organic, জীবনগত। ২৮শে নভেম্বর

জীবনের সাধনা দ্বিমুখী। একটী শরণাগত হওয়ার, অপরটী জীবনের সমগ্রতার সাধনা। শরণাগত না হইলে 'অহম্'-ভাব শক্ত থাকিলে সকল দৃষ্টিকোণের, সকল aspect-এর, সকল ক্ষেত্রের সমন্বয় সম্ভব হইতেছে না। অহঙ্কার থাকিলে, মন-বুদ্ধির স্তরে স্থিত থাকিলে কোনও একটী দৃষ্টি-কোণ, aspect বা ক্ষেত্রে আটকাইয়া পড়িতে হইবে। দ্রষ্টা (observer)' ও দৃশ্যের (observed) সমন্বয়, দ্রষ্টার যত গুলি অবস্থা (জীবত্ব, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, নরত্ব, নারীত্ব, আমিত্ব, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, পারিবারিকতা, জাতীয়তা, বিশ্বনাগরিকতা, ইহকাল ও পরকালের সত্তা) সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হইলে দ্রষ্টা দৃশ্যের ভিতরকার 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারও সমন্বয় হইবে প্রেমের মধ্যে এবং দ্রষ্টাগত, দৃশ্যগত ও সম্বন্ধগত সকল প্রকার উপাধি গলিয়া যাইবে ও লীলায় উদ্ভাসিত হইবে। ইহাই পরম জীবনের ছবি। ঠাকুর, তোমার সহজ জীবনের স্পর্শে আমি ইহাই লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। প্রচলিত ধ্যান mechanical ; তোমার কৃপায় আমার 'ধ্যান' হইবে organic, জীবনগত, সমগ্র, সর্বগত, decentralised। তোমার জয় হউক। অজিত 'সম্বন্ধবুদ্ধি' নিতাগোপাল' প্রায় শেষ করে। নরনারায়ণ আশ্রমের পূর্বের কাগজপত্র তাহাকে পড়িতে দেই। নিতাগোপালের জীবনের মত জীবনের কথা সে জানে না বলিল। বৈকালে সে আর আসিল না। অসুস্থ হইল, না কোথাও পথ হারাইয়া ঘুরিতেছে ভাবিয়া মন খারাপ হইল। ৮।৩ টায় হেপু-প্রতিভা তাহার বাসার খবর নিয়া জানিল, সে অসুস্থ হইয়া বাসায়ই আছে—জ্বর ও হৃৎস্পন্দন। প্রতিভাকে হেপু বিমলার বাসায় দিয়া আসে। প্রতিভা বিমলা ও অন্যান্য বালা হইয়া ৮টার পূর্বে ফেরে। অম্লপিত্তের জন্য ইঁদারাসী ৪ টাকা ও কিছু ওষুধ এবং বিমলা ঔষধ দিয়াছে। বিমলা মুড়ির চাউলও দিয়াছে। মাখনবাবু আসেন। 'পৌষের জন্য' 'কেন এত বৈকী ?' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। ১৩৩২-এ রাসপূর্ণিমায় ২৪-১এ সাহানগর রোডে নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহারা সেদিন ছিল, আজ তাহারা নাই। Man may come and man may go, but I go on for ever. আমি আজিও চলিয়াছি। আমার 'সামনে'

আজও আমাকে ডাকিতেছে। আমি চলিব—চলা ছাড়া আমার গতি নাই। কে আসিবে, কে চলিয়া গেল ভাবিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ নাই। চলাতেই যাহার নিত্য স্থিতি, তাহার কি হবে কি হবে না, কি রবে কি রবে না ভাবিয়া কি ফল? বুক ভাঙিয়া যায়, ভাঙা বুক চাপিয়া ধরিয়া শুধু চলিব। চলার পথই আমার পথ। সেই ১৩৩৯-এর আমি, সেই ১৯১৯-এর ব্রজমোহন স্কুলের চাকুরী পরিত্যাগকারী আমি আজিও চলিতেছি, আজিও গর্জন করিতেছি। এ কি ঠাকুর তোমার কম কৃপা! জয় হউক তোমার। ২৬শে নভেম্বর

দৃশ্য, observed (তা প্রহ্লাদের বিষই হউক বা নারীর রূপযৌবনই হউক) যদি দ্রষ্টার, observer-এর উপর কোনও ছাপ ফেলিতে না পারে, দ্রষ্টা যদি দৃশ্যের পরকীয় হয়, দৃশ্য হইতে aloof দাঁড়াইতে পারে, দৃশ্য আপনা আপনি ছাপ ফেলিতে ও প্রতিক্রিয়া আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া নিবর্ততে, দূরে চলিয়া যায়। ব্রিটিশও এমনি তাহার শিক্ষা সভ্যতা পর শাসনের ছাপ শেষ পর্যন্ত ফেলিতে না পারিয়া চলিয়া গেল, quit করিল। 'দৃশ্য (বিষ) ছাপ ফেলিতে না পারে' এজন্য প্রহ্লাদের কাছ হইতে বিষ-অস্ত্র ভগবান চাহিয়া নিলেন, বিষ-অস্ত্র ভগবানের স্তবে উঠিল, ভগবন্ময় হইল বলিয়া যখন প্রহ্লাদের মনে দৃঢ়সংস্কার হইল, তখনই বিষের বিষ-ক্রিয়া বন্ধ হইল, উহা অমৃত হইল। দ্রষ্টা যদি দৃশ্যের পরকীয় হয়, তখন আর কাম (exploitation) চলিতে পারে না, কাম স্তব্ধ হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য যখন উভয়েই ভগবানের বা বিশ্বের অর্থাৎ পরকীয়, যখন তাহারা উভয়েই একটী single system-এর দুইটী স্বয়ংপূর্ণ অংশ মাত্র, তখন দুই-ই দুইয়ের antagonistic ও complementary. তখন কেহই কাহারও উপর বিষ চালিতে পারে না কামই তো গরল, পরকীয়া রাধারাণীর পা তাই শ্রীকৃষ্ণের 'স্মরগরলখণ্ডন'। সংসারও এই ধ্যানে নির্বিষ হয়। দ্রষ্টা-দৃশ্য দুই-ই যখন স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র, তখন কাম কোথায়? যখন কেহই কাহারও উপর ছাপ ফেলিয়া আটকাইয়া রাখিতে চায় না, তখন দুই-ই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হাত হইতে মুক্ত হয়। ইহাই ধ্যানযোগ ও সমাধির সুখ অর্থ। নিত্যগোপাল, তোমার জয় হউক। ৭টার পর দুর্গামোহনবাবু আসেন। উজ্জ্বলভারতে 'বহিশালের হাজনীতি' প্রবন্ধ ছাপাইবার কথা হয়। বাগুইআটিতে কাঁপ দিয়া ঘর করিয়া যাওয়ার কথা খুব জোর দিয়া বলেন। দুধ খই খাইতে দেওয়া হয়। অজিত সকালে আসে, বৈকালে আসে নাই। ঠিক ৪টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। জগদীশবাবু, শীতলবাবু উপস্থিত ছিলেন। রাজেন দাস ও বিষ্ণুপদ ৪টী কমলা আনে; তাহারা দুইজনে পরিকল্পনা ও অর্থসংগ্রহের রসিদ বই নিয়া যায়। ললিত সরকার আসে। সতীন আসে। ইলেকট্রিক স্টোভ কিনিয়া আনে বেণু মঠ হইতে স্কুল আনে। ২৭শে নভেম্বর

সহস্র সহস্র বৎসরের অন্ধড়বাদে পুষ্ট ভারতবর্ষকে কি সহজে জড়বাদের সঙ্গে একই আসনে একই রাসচক্রে মিলানো সহজ ব্যাপার? শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ইহার প্রথম প্রবর্তক। এই প্রবর্তনাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন এদেশে সর্বপ্রথমে বুদ্ধ ভগবান না মানার সাধনাদ্বারা, মানুষের

উপর বিশেষ জোর দিয়া। এত বড় কমুনিজমের ধাক্কায়ও কি ভারতবর্ষ তাহার অজড়বাদের চিন্তাধারা ও ঘাঁটি ছাড়িয়া জড়বাদের সঙ্গে সমন্বয় করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইল? অজড় ছিল এদেশের thesis, ও-দেশের জড়বাদ আসিল ইহার antithesis রূপে। ঠাকুর, তুমি ছাড়া কে ইহার synthesis দিবে? এ দেশের synthesis হইবে অজড়বাদ on a higher plane, আর ও দেশের synthesis হইবে জড়বাদ on a higher plane। ইহাই তো শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাত্মবাদ-দেহাত্মবাদের সমন্বয় বা আত্মানাত্ম-সমন্বয়, নিত্যানিত্যসমন্বয়। কি up hill work লইয়া তুমি আসিয়াছ ঠাকুর! কে ইহা লইয়া বিশ্বের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করিবে? বড় একা আমি, বড় একা। তুমি ছাড়া কে আমার সহায়? বুক-ভরা প্রেরণা, অথচ কিছুই তো করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অথচ ইহা ছাড়া আমি আর কি-ই বা করিব! আর তো কিছু ভাল লাগে না, যুক্তিযুক্তও মনে হয় না। বিচার করিয়াছি, বিশ্লেষণ করিয়াও দেখিতেছি তোমার মত দ্বিতীয়টী কেহ নাই। তোমার ভিতর সব পথ-প্রদর্শকদের পাই, সর্ব মহাপুরুষ-সমন্বয়ও তুমি! অজিত বৈকালে আসে না। এখানে ঠিক মন বসাইতে পারিতেছে না। পূর্বে সে একটী hypnotism-এর মধ্যে ছিল। তাহাকেই সে বোঝে 'শ্রদ্ধা'। তেমন বিচারহীন শ্রদ্ধা আমি চাই না; উহা সে করিতেও পারিবে না। আমার কাছে চক্ষু মেলিয়া শরণাগত হইতে হইবে। অন্ধ বিশ্বাস আমি চাই না। তাহার পরিবারবর্গও এখানে বেশী আসা পছন্দ করে না। টানাটানি আমি করিতে পারিব না। ওদিক রাখিয়া এদিকের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত হওয়া খুব কঠিন। উহা সে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বেণু বাহির হয় ২॥০টার পর। অজিতের লেপের অর্ডার দিয়া আসে। সেবানন্দ সকালে আসে। উল্টাডাঙ্গার ভদ্রলোক কার্তিক সন্ধ্যার পর। ২৮শে নভেম্বর

রাসযাত্রা: নরনারায়ণ আশ্রমের জন্ম তিথি। নরনারায়ণ নিতাগোপাল, তোমার স্পর্শে বুঝিয়াছি এক মহান গভীর তত্ত্ব—মায়াও অনন্ত, ব্রহ্মও অনন্ত, মায়া-ব্রহ্ম সমন্বয়। মায়া যদি ব্রহ্মের মত অনন্ত না হইত, তবে সমন্বয়ের প্রয়োজন হইত না। মায়া বিনষ্ট হইতেন, মায়ার বিনাশে ব্রহ্মই থাকিতেন—ইহাই এতদিন এই বিশ্বের দার্শনিকগণ বুঝিয়াছেন, বুঝাইয়াছেন। কিন্তু তুমি শুনাইতেছ —ব্রহ্ম যেমন ব্যাপক, মায়াও তেমনি ব্যাপক। মায়া যখন ব্যাপক, ব্রহ্ম তাহার ব্যাপ্য। ব্রহ্ম যখন ব্যাপক, মায়া তখন ব্যাপ্য। উভয়েই সম ব্যাপ্য ব্যাপক। তাই ইহাদের উপাধিবিধুর সম ব্যাপ্তি রহিয়াছে। তোমার দর্শনে মায়া যেমন অনন্ত, সৃষ্টিও তেমনি অনন্ত, কালও অনন্ত, কর্মও অনন্ত। মায়ার প্রতিটী ক্ষণে (moment) অখণ্ড ব্রহ্ম পূর্ণ; ব্রহ্মের কোন fraction নাই। অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ। প্রতিটী স্থূলে, প্রতিটী অণুতে, প্রতিটী দীর্ঘে তিনি সম, অখণ্ড, অনন্ত। এই সান্তের দেশে প্রতিটী অন্ত অনন্ত। এইরূপ প্রতিটী অনন্ত অন্তের হাত ধরাধরিতে, অন্যোন্যবদ্ধবাহু হওয়ায় মধ্যে এই বিশ্ব-রাসলীলা চলিয়াছে। ঠাকুর, আমি এই রাসলীলা-রস আস্বাদনে সার্থক হইব। স্বামী আমার, স্বামি তোমারই প্রকৃতি—ইহাই তো ছিল

আমার ভাবনা। তোমার ও আমার মনে গড়িয়া উঠুক নবীন ব্যক্তি, নবীন পরিবার, নবীন সমাজ, নবীন রাষ্ট্র ও নবীন বিশ্ব। বেণু মঠ হইতে ফুল আনে। ক্ষিতীশ চক্রবর্তী প্রায় ১০ টায় আসে, এখানে প্রসাদ পায়। ঠিক ৫টায় পাঠ আরম্ভ হয়। জগদীশবাবু, ললিতবাবু, বিলাসবাবু, হাজেনদাস ও বিষ্ণুপদ, সতীন, আর আর কেহ কেহ, বিরজা প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। অজিত আজিও আসে নাই। রাসপূর্ণিমা তিথিতে নরনারায়ণ আশ্রমের জন্ম। রবীন্দ্রনাথের 'কাঁকি' কবিতা পাঠ করে বেণু, আমি ব্যাখ্যা করি। অবধূতভাষ্য ভাগবত-প্রদীপ হইতে 'রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ' অংশ পাঠ করে বেণু। পরের পৃষ্ঠায় আলোচনায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিল। হাজেন-বিষ্ণুপদ ৪টি কমলা আজিও আনে। ২২শে নভেম্বর

ভাগবত শাস্ত্র হৃদয়ের শাস্ত্র, 'গীতা মে হৃদয়ং' 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে'। ভাগবত তাই প্রেমিকহৃদয়ের শাস্ত্র, 'মোক্ষাভিসন্ধিরপি তত্র নিরস্তঃ'। ভাগবতের পূর্বের শাস্ত্র প্রজ্ঞার শাস্ত্র, ওঙ্কারের বাহ দিয়া নিষ্কল গোলোক গড়িবার শাস্ত্র। বুদ্ধির 'কাঁকি' রহিয়াছে এই শাস্ত্রে। রবীন্দ্রনাথের 'কাঁকি' কবিতায় বিশ্বের স্বামী প্রজ্ঞার মূর্তি, আর বিশ্ব হৃদয়ের মূর্তি। হৃদয়ের কাছে সৌন্দর্যের আর চলা এক। হৃদয়ের কাছে এই সংসার-পাঠশালা 'বেশ'। 'সংক্ষেপে' কাজ সারিবার, সিদ্ধি লাভ করিবার তাগিদ হৃদয়ের নাই। সে রুক্মিনীর সব কাহিনীই প্রাণ খুলিয়া শুনিতে পারে, তাহার মেয়ের বিবাহে ২৫ টাকাও ব্যয় করিতে পারে। প্রজ্ঞা ইহাতে দেউলিয়া হইবার ভয় দেখে। তাই হৃদয়কে সে কাঁকি দিয়া রুক্মিনীকে ২ টাকা দিয়া বিদায় করে। হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির কাঁকিই শেষে রুক্মিনীর খোঁজে বুদ্ধিকে ক্ষিপ্ত করে—'আর কি পাতকী আছে নদীয়ায়'। 'কাঁকির ভার' বহিতে না পারিয়াই গোলোকনাথকে হত ওঙ্কারের, গুহ-নবদ্বীপের, ব্রজের মেয়েদের খোঁজে ধরার বুকে আসিতে হয়। হৃদয়ের কাছে 'কাঁকির ভার' হাল্কা করিবার জন্যই অবতার। 'হৃদি অহম্ হৃদয়ম্'। ওমমেতৎ প্রথমঃ মে হৃদয়াৎ নাপিসর্পতি। যৎ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্'। বুদ্ধির কাঁকি, বুদ্ধির ফাঁক পূরণ করে হৃদয়। হৃদয়ের শাস্ত্র সব নিম্ন প্রবৃত্তিকে ব্রজের রাসলীলার ব্রহ্মময়ী রূপে ফুটাইয়া ছিল। সব কৃষ্ণকর্ম, সব পিতৃযান পথ, রাত্রি, মোহিনী নারী শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিলেন 'যোগমায়াম্ উপাশ্রিতঃ'। নরনারায়ণ আশ্রম এই তত্ত্বই কর্ম-ক্ষেত্রে মূর্ত করিবে। নিতাগোপাল অসুস্থ হউন। সন্ধ্যায় বীরেন ব্যানার্জী আসেন। ভাগবতের 'রাসমন্থন'-লীলা তিনিয়াছেন, শুনাইলেন। অনেকে শক্তিদ্বারা ভগবান বদ্ধ হন, বন্ধনভয়ে ভীত হন — ইহা বর্তমান যুগের সিদ্ধান্ত নয়। পুরুষোত্তম সহজ শক্তিতেই বদ্ধ হন, বন্ধন-ভীত হন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া কোন শক্তির কথা তো কেহ বলেন না। ভগবানের তিনটী শক্তি— পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা। ভগবানের সব শক্তিই অনির্বচনীয়। আবার একটী বেশীর দরকার কি? তিনি একই সময়ে পূর্ণ ও অপূর্ণ। তাঁহাকে একান্ত পূর্ণ বলিয়া পরে অচিন্ত্য শক্তিতে অপূর্ণ বলিলে কল্পনা-গৌরব দোষ আপতিত হয়।

৮ টায় অফিস আসে। তাহার পেটের অসুখ, অথচ পথ্যের কোন বন্দোবস্ত নাই। ২ টাকা দিয়া দিলাম—খানকুনি কাঁচকলা মাছ কিনিয়া বিনা মরিচে ঝোল করিবার জন্য। আজ বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের সম্বর্ধনা সভা ময়দানে। এত লোক-সমাগম ইতঃপূর্বে হয় নাই। সকালে সুধাংশু আসে। ৩০শে নভেম্বর

ভগবানের সৃষ্টি-শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে তাঁহার সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের ঘনীভূত প্রকাশ। যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাঁহার অস্তিত্ব নাই, সে থাকিয়াও নাই। তাহার চৈতন্য কোথায়? সে যে অচৈতন্য, তাহার আনন্দ কোথায়? সৃষ্টিতেই আনন্দ, আনন্দেই সৃষ্টি। সৃষ্টির আনন্দই সকলের চেয়ে গুরুতম আনন্দ। আনন্দের জন্য রমণ জীব চায়। ভগবান এই সৃষ্টি-শক্তি জীবকে দিয়া নিজে সৃষ্টির ওপারে বা সৃষ্টির মাঝে আত্ম-গোপন করিতে চান, দূরে থাকিতে চান। জীব বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া সৎ হইবে, চিৎ হইবে, আনন্দ হইবে। জীব পুরুষ স্ত্রী হইয়া সৃষ্টি করিতেছে। ঈশ্বর করেন আদর্শ সৃষ্টি, জীব করেন বাস্তব সৃষ্টি। কোনও সৃষ্টিই একান্ত নয়। সৎ-এর একাংশে ঈশ্বর, অপর অংশ জীব; চিৎ-এর একাংশে নারায়ণ, অপরাংশে নয়, আনন্দ-এর একাংশে স্ত্রী, অপরাংশে পুরুষ। 'অন্যোন্যং জগৎ'। স্ত্রী-পুরুষের মাধ্যমেই পুরুষোত্তম বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। শিব-কালীই স্ত্রী-পুরুষের মধ্য দিয়া বিশ্বেশ্বর-বিশ্বেশ্বরী। ঠাকুর, আমাকে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে সৃষ্টি করার কৌশল ও যোগ্যতা দান কর। আমি সৎ চিৎ আনন্দ হইব। তোমার সৃষ্টি-কার্যের মাঝে আমি মরণ দিয়া সৃষ্টরূপে গড়িয়া উঠিব। God the father (সৎ), God the Holy Ghost (চিৎ), God the son (আনন্দ) আমরা গড়িব এই নবীন বিশ্ব, পুরুষোত্তম-সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হইব, সৃষ্টি করিব, সৃষ্টি করিব, যাহা পাই তাহাই পুরুষোত্তম-রূপে সৃষ্টি করিব। তোমার জয় হউক। আজও সকালে বিকালে আসে। ভাই আক্রোশ-বশতঃ ১০০ টাকা বন্ধ করিতে পারে, এজন্য সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি বলিয়াছি, ভয় নাই আমি তো আছি। অন্ততঃ ২ মাসের জন্য ঐ টাকা দিব, যদি ছোট ভাই বন্ধ করে। তবে যতদূর পার non-resistance-এর পথে চল। কাহাকে আঘাত করিবে না ইহা যেমন সত্য, আবার নিজের মর্যাদাও নষ্ট হইতে দেওয়া চলিবে না। কাজেই 'growing from within' অর্থাৎ প্রথমানবপু হইতে হইবে। বাধার সামনে অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণে গর্জন করিতে হইবে। ৭ দিনের মধ্যেই সুস্থ হও। প্রতিভা-বেণু মামার বাসায় যায়। বেণু পি সাহার কাছে যায়—Sabal 200 এক মাত্রা দেয়। হারান সেন। (রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট) সন্ধ্যার পর আসেন। অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। পৌষের প্রবন্ধ শেষ করি। ১লা ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি নবীন বিশ্বের স্রষ্টা। প্রতি মানুষকে তুমি এই স্রষ্টৃশক্তি দিতে চাহিতেছ। তোমার এই স্রষ্টৃ-শক্তির 'ভার' আমি যে একা বহিতে পারিতেছি না। যখন যে মানুষ বা পরিবার সকল ভাঙিয়া চুরিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তোমার ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য স্বীকার করিয়াছিলাম, বুকে তুলিয়া লইয়াছিলাম। আমি

কাঁদিতে থাকিব, আর উদাসীন দ্রষ্টার মত আমার সামনে দিয়া সব অনর্থ ঘটিয়া যাইবে তাহা তো কোনদিন সহ্য করিতে পারি নাই। যত ভাঙ্গা জীবন আসিয়াছে, সুস্থ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। টাকা নাই তবুও তো দায়িত্ব এড়াই নাই। সকল বাধার বুকে আমি গর্জন ক'রয়াছি। 'প্রস্থমানবপুঃ' হইয়া ভিতর হইতে বাড়িয়া উঠিয়াছি। মানুষ সংসারের কাছে লাঞ্ছিত হয়, ইহা সহ্য করি নাই। তাহাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছি। সুধাংশু, প্রতিভা, রেণু, মিনু, নীলু—সকলকেই স্বমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছি। ভাসিয়া যাইতে দেই নাই। সংসারের আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে চাহিয়াছি। বর্তমানে অজিতকে লইয়া এই ব্যাপার চলিতেছে। অজিত যতদিন সুস্থ উপার্জনক্ষম ছিল, সকলেই তাহার ছিল। আজ অসুস্থ (দেহে মনে), সকলেই আজ নির্যাতন করে। আমাদের ধানকুনি সুক্কো দিবারও কেহ নাই। যা আছে, তাই আছে; কিন্তু কে করে? আমাকেই সে ভাবনা ভাবিতে হইতেছে। ঠাকুর, তুমি উহাকে সুস্থ কর, উহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করাও আমার বল তুমি। আমাকে এই দায়িত্ব হইতে মুক্ত কর। অজিত ২ বেলা আসে। সকালে খই ঘোল খায়। বিশ্বের বাহিরের-ঘটনার সঙ্গে সে তাহার জীবনের যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। ঐ সূত্রকে সে নিজের খেয়ালমত পূরণ করিয়া লয়। ইহাই তাহার ইঙ্গিত দেখার রহস্য। তাহার জন্য ব্যবস্থা—একটি স্নেহপূর্ণ অনন্ত কর্মক্ষেত্র জ্ঞানক্ষেত্র ও আনন্দের পরিবেশের মধ্যে রাখা। পুরুষোত্তমই যোগসূত্র। 'ময়ি প্রোতমিদং সর্বং সূত্রে মণিগণা ইব'। তাঁহাকে ধ'রতে না পারিলে বিশ্বের সব সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, সব বেসুরা বাজে। তাঁহার সূত্রে বিশ্বকে গাঁথা যায়। তিনিই স্থিতি-গতির সূত্র। সূত্রাত্মা। রেণু অজিতের লেপ নিয়া আসে, ১৫্টাকা দাম। ৬০০ কপি উজ্জ্বল-ভাবেও বিকালে দিয়া যায়।

সাময়িকী

নূতন ব্যবস্থা ঃ ঘরের আসবাবগুলিকে পুনর্বিন্যাস করিয়া রাখিলেও বেশ ভাল লাগে, আর এত বড় একটা বিরাট দেশ ভারতবর্ষ সেখানের শাসন-ব্যবস্থার এত বড় একটা বিরাট পুনর্বিন্যাস সত্যই বড়ই আনন্দজনক হইয়াছে। আমরা নূতন এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাই। যাহারা গেলেন তাঁহাদের নিকটও দেশ অনেক আশা করিয়াই ভাকিয়া আনিয়া বসাইয়া ছিল। তাঁহারা দেশের কোন উপকারই করেন নাই, ইহাও যেমন সত্য নয়, আবার অনেক অপকারও করিয়াছেন তাহাও অসত্য নয়। সে যাহাই হউক, পুরাতন গেল, নূতন ব্যবস্থা হইল। এই নূতনকে স্বাগত জানাই।

যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা দেশের কাছে বেশীর ভাগই নূতন নহেন। ইংরেজের হাত হইতে

দেশকে মুক্ত করার আন্দোলনে যেমন অনেকেই বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তেমনি জনচিত্তকে নিজের অধিকার ও দায়িত্বে সজাগ করিয়া তুলিতেও তাঁহারা অনেকেই অনেক কিছু করিয়াছেন। সেইখানে আমাদের ভরসা, সেইজন্য তাঁহাদের স্বাগত জানাই। দেশের নাড়ীর সঙ্গে তাঁহাদের যোগ দীর্ঘকালের—এই যোগের ফল শুভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি। এত বড় ক্ষমতা শুধু এক দলের উপর দীর্ঘ কাল থাকিলেও অপকার হইবার সম্ভাবনাই আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ হইয়া পড়ে। বিরোধী পক্ষ না থাকাটা আমাদের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ছিল। বিশেষতঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ব্যবস্থাটা আমাদের দেশে রহিয়াছে তাহাতে নির্বাচনোত্তর প্রতিনিধি যে কয়েকটী বৎসরের জন্য যাহারা তাহাকে নির্বাচিত করিল সেই জনগণ হইতে একেবারে স্বাধীন সার্বভৌম হইয়া থাকিতে পারেন. কোনো কৈফিয়ৎ কোন দায়ই তাহাদের নিকট থাকে না—এইটিই সর্বাপেক্ষা বিপদের কারণ হইয়া ছিল। সেই সঙ্গে বিরোধী পক্ষ বলিয়া দীর্ঘকাল কিছু না থাকাটা কম বিপদের কারণ ছিল না। নানা কারণেই পরিবর্তন খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন ব্যবস্থাকে সেই জন্যও আমরা স্বাগত জানাই।

সব চাইতে বড় কথা হইল কয়েকটী দল মিলিত হইয়া এই নূতন শাসক দল গঠিত হইয়াছে এই কথাটি। কোন একক দল অপেক্ষা কয়েকটী দলের একাত্মতাদ্বারা সৃষ্ট একটী শাসক দলের উপযোগিতা বর্তমান কালে বেশী বলিয়া আমরা মনে করি। সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিতাগোপাল আজ হইতে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বলিয়া ছিলেন, '...আমি দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, যাহাতে পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধ যুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না।...আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল'। আমরা বর্তমানে যাহারা শাসন ক্ষমতায় আসিলেন তাঁহাদের মধ্যে সকল দল লইয়া এক অখণ্ড দল-এর সন্ধান পাইব সেই আশায় রহিয়াছি। সকল দল লইয়া এক অখণ্ড দলের আজ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। দল সম্বন্ধে শ্রীনিতাগোপালের ঐ কথায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিলেন...'দল লইয়া আজ চারিদিকে যে কুৎসিৎ হানাহানি চলে সেই পটভূমিকায় দল না করার এই যে উদার মনোবৃত্তি, ইহা আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। বিশ্বে একের সঙ্গে অপরের মিলিত হইতে হইলে, একটী এক-বিশ্ব রচনা করিতে হইলে এই সর্ব দল লইয়া এক অখণ্ড দল গঠন করিবার মন্ত্র আমাদিগকে লইতে হইবে'। যত দল একাত্ম হইবে, অখণ্ড হইয়া সকলের দৃষ্টি-ভঙ্গিকে যথাযোগ্য স্থান ও মর্যাদা দিয়া পরস্পরের দোষ ত্রুটি পরস্পর শোধরাইয়া লইয়া বর্তমান শাসক গোষ্ঠী দেশের সর্বশ্রেণীর জনতার সত্যিকার বান্ধব রূপে দেখা দিবেন—আমরা সেই আশায় পুনরায় নূতন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাইতেছি।

রাজনীতির জগতে সকল দল মিলিয়া এক অখণ্ড দল হইয়া কাজ করিতে করিতে এক-বিশ্ব রচনার প্রচেষ্টা রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে। অথচ এই এক-বিশ্ব রচনার পিছনে একটী দার্শনিক সর্ব ধর্ম ও সর্ব তত্ত্বের-মিলন-প্রচেষ্টা না থাকিলে শুধু রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় মিলন দৃঢ়-ভিত্তিক হইতে পারিবে না। দর্শনের জগতেও বহুর সঙ্গে

মিলনের পথের খোঁজ দিতেছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ, 'অপরের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিলে অপরকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিতে হইবে'—এই স্বীকৃতি-দর্শন ভারতবর্ষের দর্শনের জগতে ছিল না, বিশ্বের রাজনীতির জগতে ছিল না। এই স্বীকৃতি দিতেই শ্রীনিতাগোপালকে সব কিছুরই দুই পিঠকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। বিপরীতকে, বিরুদ্ধকে পরিপাক করিবার একমাত্র পথ হইতেছে প্রাণের প্রীতির মধ্যে তাহাকে স্বীকার করা—তাহা হইলে তাহার বিষদাঁত অনেকাংশে ভাঙিয়া যাইবে—ইহার পর তাহার সহিত ব্যবহার চালাইবার মাপকাঠি হইবে অহিংস অসহযোগ। পূর্ণ সহযোগিতার মধ্যে তাহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু সে পথে তাহাকে আনিবার উপায় ঐ অহিংস অসহযোগ। এ সাধনা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের ক্ষেত্রে যেমন, বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রেও তেমনি। নিখিল বিশ্বকে ভাগাভাগি করিয়া না লইয়া পক্ষের বিপক্ষের সমস্ত মতবাদকে এক ব্যাপকতর ও গভীরতর আত্মবোধের মধ্যে গ্রহণ করিয়া শ্রীনিতাগোপাল সর্ব দর্শন সমন্বয়, সর্ব ধর্ম সমন্বয়, সর্ব জাতি সমন্বয়, সর্ব পথ সমন্বয়, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-প্রেম সমন্বয়, বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া সমন্বয় স্থাপন করিয়াই তাঁহার সব সমন্বয়ের মূলসূত্র রাখিয়া গিয়াছেন' (শ্রীনিতাগোপালের শতবার্ষিকী অভিভাষণ)। সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিলন সম্বন্ধে অন্যত্র (তাঁহার ১৯৫১-র দিনপঞ্জীতে) তিনি লিখিতেছেন,... 'এতকাল সব বিরোধী পক্ষকে স্তব্ধ করিয়া অবিরোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে, ক্ষোভের ভাষ্যকারেরাও এই পথ ধরিয়াছেন। আমি চলিয়াছি স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া। সমগ্রের মধ্যে পক্ষ-প্রতিপক্ষকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সহ মিলাইতে হইবে—ইহাই আমার সাধনা। কাহারও জন্য দুয়ার বন্ধ থাকিবে না—কি বাহিরে যাইতে বা বাহির হইতে ঘরে প্রবেশ করিতে। যাহারা অত্যাচারী তাহারা দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরে রাখিতে চায় এবং বাহির হইলে আর ঘরে নিতে চায় না, যেমন ছেলেদের সম্বন্ধে পুরুষদের ব্যবস্থা'। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের এই জন্যই স্বাগত জানাই যে তাঁহারা বহু দল মিলিয়া যে একটী দল হইলেন, সেখানে অপর প্রতিটিকে এমন কি বিরুদ্ধকে সমস্ত প্রাণখোলা স্বীকৃতি ও যথামান দিয়া পারস্পরিকতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবেন। যাঁহারা বিশ্বকে এক-বিশ্বে রচনার স্বপ্ন দেখেন তাঁহারা বহু বা সকল দল মিলিয়া মিশিয়া যে এক অখণ্ড দল হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের শাসকদের নূতন দৃষ্টান্তে পাইবেন—সেই আশায় এই নূতন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাই।

বিদায়ী যে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়ায় অপর দলগুলির এই মিলন আজ সম্ভব হইল, ভারতভাগ্য-বিধাতা তাহাদের দ্বারা ঐ মাত্রা ছাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া সমগ্র দেশের কল্যাণ করিলেন—নহিলে এ মিলন কিছুতেই সম্ভব হইতেছিল না। আজ যে একদিকে বহু দলের মিলনে একটী নূতন শক্তি শাসন ক্ষমতা লাভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী বিরোধী পক্ষেরও সৃষ্টি হইল যাহা দীর্ঘ বৎসর ছিল না—এই সবই আজ খুবই ভাল হইল—আমরা নূতন শাসক শক্তিকে স্বাগত জানাই, নূতন বিরোধী শক্তিকেও স্বাগত জানাই। নূতন পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই সমগ্র দেশের সামগ্রিক

কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করিবেন—প্রত্যেকে দলীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠিয়াই দলকে রক্ষা করিবেন—ইতিহাস হইতে এই শিক্ষা তাঁহারা লইবেন আমরা তাহাও আশা করিয়া রহিলাম। যে অন্যায় করার বিধাতার এই মার বিদারী গোষ্ঠীকে খাইতে হইল, সে অন্যায় আর হইবে না—এ প্রত্যাশা সকলের করিবেই। প্রাচীন কালে সম্রাট রাজা জমিদার নামের একতন্ত্রভাবে অত্যাচার করিতেন, আজ কয়েকজন দলের নামে মোটামুটি সেই একই রকম অত্যাচার শোষণ চালাইবেন, মানুষের সভ্যতার একদিকের প্রচণ্ড অগ্রগতি সত্ত্বেও মানসিকতার এ গ্লানি ঘুচিবার উপায় কোথায়? মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ কোন দিনই কি দূর হইবে না? শাসনের নামে একের শোষণও যাহা, বহু বড়বড় বুলি আওড়াইয়া দলের শাসনও সেই শোষণ পর্যায়েই যদি পড়ে তবে মানুষের সভ্যতার এ লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? তাই গোড়ায় সত্য ও সামগ্রিক কল্যাণকে ভিত্তি করিয়া এবং শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোতে প্রতিনিধিকে যথাসম্ভব ছোটদাতা-দের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দায়ী রাখিয়া দেশের সর্ব স্তরের জীবন চালাইবার ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে পারিলে অন্যায় অত্যাচার তো হইবেই। আশ্চর্য এই যে একক শাসক এইরূপ অন্যায় করিতে যে সুযোগ পায়, একটা দল সমবেত ভাবে কি করিয়া একই রকম অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে! তাই গোড়ায় সত্যকে ভিত্তি করিতে হইবে, ব্যক্তি বা দলের স্বার্থ লক্ষ্য না করিয়া সমগ্র সমাজের কল্যাণকে লক্ষ্য করিতে হইবে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া হইতে সদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। আমরা নূতন শাসকের নিকট এইগুলি আশা করিব এবং নূতন বিরোধী পক্ষও এইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন বলিয়া আশা রাখিব।

'অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত। সেই মূল বন্ধনটী বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে 'হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে'। তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অন্যান্য ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তা হলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, 'আত্মা মরুক, আমি থাকি'। আত্মা বলে, 'প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক, আমি একাধিপত্য করি'।

—রবীন্দ্রনাথ

গরমের দিনে আঃ কী আরাম!

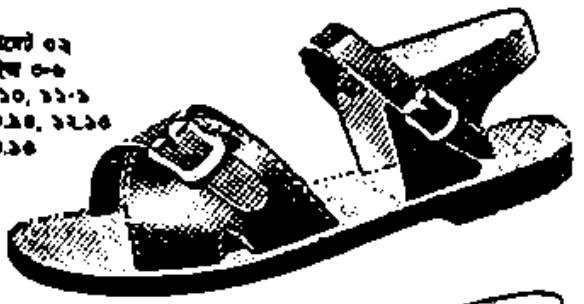

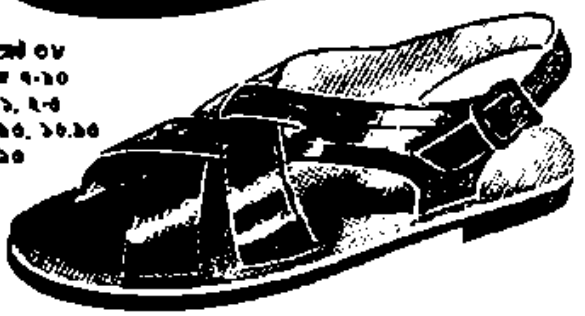

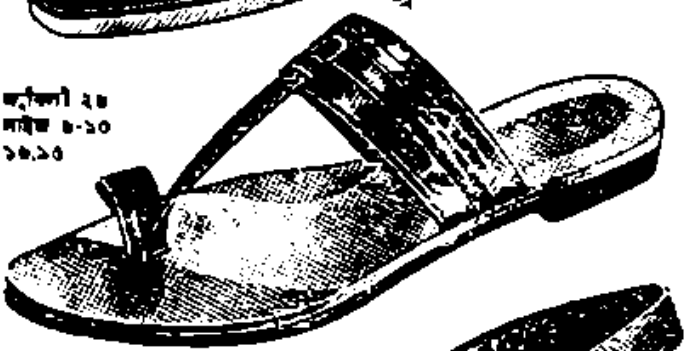

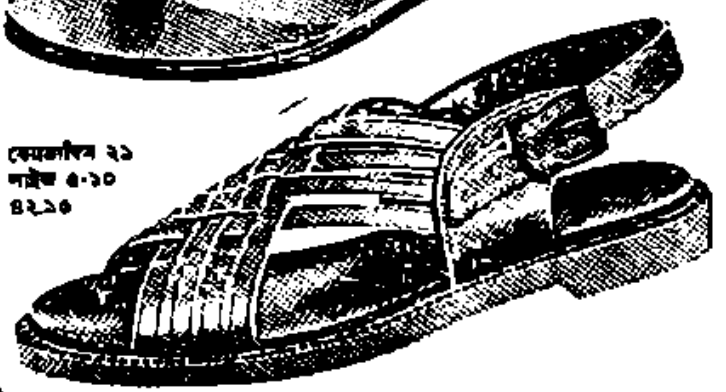

বাটায় সবুজাস স্যান্ডেলে আর চপ্পলে পরবে
পা জুড়োবে। যেখন নির্ভাপ, তেমনি
নয়নাভিরাম। বাটায় দোকানে আসুন...
দেখুন রকমারি খোলামেলা
চোখ জুড়ানো জুতোর মেলা।

Bata

ছুঁয়াকে ছুঁয়ির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অসম্ভব, ছুঁয়িহীন ছুঁয়ার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে কি করে এক-জগৎ গড়বার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ॥

॥ মুদ্রিত ॥		॥ পাণ্ডুলিপি ॥
ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)		বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·১৫	দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী ভাষণ
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·০০	ইত্যাদি।
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় সমস্ত)	৭·০০	
ঈশোপনিষৎ	২·০০	
কেনোপনিষৎ	২·০০	॥ ৺ প্রতিভা ঘোষের ॥
কঠোপনিষৎ	৩·০০	১। নারী-প্রগতির অন্তরায়
প্রশ্নোপনিষৎ	১·০০	২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য
ঐতরেয়োপনিষৎ	১·৭৫	নিতাগোপাল ও শিষ্য সুধার কথা।
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ		৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ		
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ		
মুণ্ডকোপনিষৎ		
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৪·০০	॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ	০·৫০	১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল
১১। গীতাজয়ন্তী	০·০৬	২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
১২। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা)	০·৫০	৩। শরৎচন্দ্রের শেষ-প্রশ্ন
১৩। মহাত্মাজীর ষষ্ঠ-মূলক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)	৩·০০	ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০	৪। রবীন্দ্র-হৃদয়
		৫। প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটী, পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী, পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o জে. বি. লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়। "এই বিশ্ব-ই আমার মহাপীঠ"
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্ব-নাগরিক"

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮৪, খ্রী: ১৯৭৭ সম্পাদিকা-রেণু মিত্র ত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

গীতাসাধ্বী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ টীকা টিপ্পনী ভাষ্য বহস্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অধ্যাত্মপ্রেরণার সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাস্টিকের জ্যাকেট সহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	১·৫০	সদাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	২·৫০	ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
ওমবাণী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম, এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৫·০০
বাংলার ঋষি	৫·০০
বাংলার বিদুষী	৫·৫০
বাংলার মনীষী	২·৫০
জীবন গড়া	০·৭৫
রাজর্ষি রামমোহন	৩·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম, এ, বি টি.

ছোটদের গল্প গুচ্ছ	৩·০০
মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বঙ্কিমের গল্প	১·৫০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০
নীরোগদেহে দীর্ঘ জীবন	২·৫০
সরল যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যৌগিক বিধানে রোগ নিবারণ	৫·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৪·০০

সর্বপ্রথম ব্যবহার্য সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনব অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণ। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৯ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

উদ্বুদ্ধভারত

জ্যৈষ্ঠ-আ ১৩৮৪, বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৭ ত্রিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

বুদ্ধ ও শঙ্কর

দুই মতবাদ সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

ভগবান শঙ্করাচার্য বলিলেন জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য। কিন্তু বিচিত্র এই বিশ্বে সকলেই এক রকম করিয়া ভাবেন না। শঙ্করাচার্যের ঠিক বিপরীত হইয়া ভগবান বুদ্ধ বলিলেন জগৎ সত্য; ভগবান সম্বন্ধে তিনি নীরব রহিলেন। জগৎ সত্য মানেই মানুষ সত্য—সঙ্ঘ সত্য। তাই তিনি বলিলেন, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। মানুষকে সত্য স্বীকার করিলে সঙ্ঘকে সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে মানুষ ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কোন-মতেই টিকিতে পারিবে না। তখন সেই সঙ্ঘ-শক্তিই ঈশ্বরের শক্তি। বুদ্ধদেবের এই চিন্তাধারা ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমীগণ মানিয়া লইতে পারেন নাই, বুদ্ধদেবকে কোন স্বীকৃতি দেওয়া দূরের কথা, বলা যাইতে পারে তাঁহারা বুদ্ধদেবকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম এশিয়া মহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় লইয়া আজও টিকিয়া আছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর অশোক স্তম্ভকে রাষ্ট্রীয় স্তরে স্বীকৃতি দিলেও এ স্বীকৃতি ধার্মনিক জগতে বা আধ্যাত্মিক স্তরে স্বীকৃতি আনিয়া দিতে পারে নাই। তাই দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা প্রস্থাপন দ্বারাই বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথা স্থান ও যথা মান দিতে হইবে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রের অবধূত ভাষ্যের বৌদ্ধ-বেদান্ত সমন্বয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—"ভগবান বুদ্ধ বেদ-ঈশ্বর সম্বন্ধে 'pre-existing knowledge'-কল্পিত বিশ্বাস করেন, 'নাস্তিক' বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি মানুষকে ঘরে ফিরিবার কথাই বলিলেন। ঘরের বাহিরের ঈশ্বরকে, বাহিরের বেদকে আশ্রয় করিবার বিরুদ্ধেই অভিযান তিনি করিলেন। গীতার আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ মতবাদই প্রচার করিলেন। ইহাতে যদি বেদ-ঈশ্বর না থাকে বুদ্ধের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না।

তিনি বেদ-ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন রহিলেন, হাঁ বা না কিছুই বলিলেন না। তিনি মানুষকে স্বক্ষেত্রে স্বধর্মে স্বকর্মে দাঁড়াইবার দর্শন ও কৌশল শিখাইয়া গেলেন। তিনি 'কর্মে'-র উপর জোর দিলেন—কর্মই মানুষের বন্ধন মুক্তির কারণ।··· বৌদ্ধদর্শন দীক্ষিত হইয়াছে 'স্থিরতা'র (permanence) অত্যাচারের হাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়া চঞ্চলতার গৌরবে তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে, 'অখণ্ডে'র নির্যাতন হইতে খণ্ডকে উদ্ধার করিতে, 'একে'র হাত হইতে বহুকে বাঁচাইতে, 'চেতনে'র শোষণ হইতে জড়কে মুক্তি দিতে 'ভোক্তা'র বলাৎকার হইতে ভোগের মহাদা রক্ষা করিতে, স্থির চেতন 'ঈশ্বর'-শাসকের শাসন ও শোষণ হইতে শাসিত-শোষিত জীবকে মুক্তিদান করিতে, 'সনাতন' বেদের সনাতনত্বের নিষ্ঠুর পীড়ন হইতে সনাতনেরই একটী বিচিত্র আস্বাদন রূপে

বর্তমানের মর্যাদা দান করিয়া নূতন বেদ সৃষ্টি করিতে, বাস্তবিক বিচ্ছিন্নতা মুছিয়া ফেলিয়া এই মাটির বুকে স্বর্গ-সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষকে মুক্তি দান করিতে, উৎপাদ-নিরোধের কার্য-কারণ শৃঙ্খলার শক্ত বাঁধন ভাঙিয়া দিয়া উৎপাদকে উৎপাদের মূল্যে এবং নিরোধকে নিরোধের মূল্য আস্বাদন করিতে, 'সনাতনে'র চাপ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যই নব ক্ষণকে বরং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, 'পূর্ণের' সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত হইতে ক্ষুদ্রকে রক্ষা করিতে, 'অলা'র জ্বালা হইতে ছুড়াইবার জন্য চিত্ত নির্বাণের মহিমা কীর্তন করিতে"।

কিন্তু বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্যের ঠিক বিপরীত চিন্তাধারা উপস্থিত করিয়া যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পাওয়া গেল না। এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামীজী লিখিতেছেন, "বেদ-ঈশ্বরকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া 'একান্ত' কর্মের উপর ঝুঁকিয়া পড়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল যে, ঐ কর্মই ঈশ্বরের আসন দখল করিয়া বসিল। যে শাসন দণ্ড ছিল এতদিন ঈশ্বরের হাতে, তাহা আসিল কর্মের হাতে। কর্মকে একান্ত ঘরের করিতে যাওয়ায় 'কর্ম' নীরে নীরে অত্যাচারী রূপেই আত্ম প্রকাশ করিল কিন্তু ইহাতেও ঈশ্বর মরিলেন না, বেদ মরিলেন না। বুদ্ধই হইলেন 'ঈশ্বর', বেদের স্থান অধিকার করিল কঠোর বিধিনিষেধময় বিনয়ত্রিপিটক ইত্যাদি। কর্মের ভিতরেও যে কর্ম অন্তর্হিত হইয়াছে, কর্ম যে কর্মাভাবের সঙ্গে সমন্বিত হইয়াই 'কৃৎস্ন কর্ম', গীতার এই তত্ত্ব সেই সময়ে ধরা পড়ে নাই।...পুরুষোত্তম-বিশ্বে কর্মের ভিতরে বাহিরে, কর্ম ও কর্মফলের মাঝে ফাঁক রহিয়া গিয়াছে এই ফাঁক সনাতন সত্য। কর্মের যে যে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত বিধান শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, কর্মের ফাঁক দিয়া কোনও শক্তি অবতরণ করিলে সেই ফল যে নাশ হইতে পারে, ইহার বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন।... এই বিশ্ব 'ক্ষণিকের মেলা—কি কর্মে, কি জ্ঞানে। ক্ষণিকের তানতুলেই বিশ্ব চলেছে।...ক্ষণিকবাদের অবতারণাদ্বারা বৌদ্ধ যে-বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন, কর্ম ও কর্মফলের একটা একান্ত নিশ্চিত রূপ (determined character) দিতে গিয়া সে বিপ্লবের দ্বারাকে determinism এর বন্ধনে তাঁহারা বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। বৌদ্ধের কর্মবাদ ও ক্ষণিকবাদ একান্ত বিরুদ্ধ। যে শিষ্য চৈতন্যের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁহাদের অভিযান, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তে না থাকাটা একান্ত দোষের নয়। কিন্তু তাঁহারা তখনই অদমপ্রবণী হইলেন যখন উহাদিগকে একান্তভাবে অস্বীকার করিলেন, এবং ভাবিলেন উহাদিগকে বাদ দিয়াই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হইবে। উহাদিগকে খোলা প্রাণে নিজেরই অঙ্গীভূতরূপে অঙ্গীভূত না করিলে নিজেরাই পরিণামে উজাড় হইবেন, একথা তখন তাঁহাদের বুঝিবার সুযোগ ছিল না, থাকিতেও পারে না। কেননা, যখন কোন নূতন কথা ধরার বুকে আসে, তাহাকে 'একান্ত' করিয়া প্রচার না করিলে মানুষ উহাকে ধরিতেই পারে না। সমন্বয়ের কথা উঠে পরবর্তী কালে।...

ক্ষণিকবাদের ভগ্নস্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাঁহারই অপরার্দ্ধ ঐ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ, সাতত্যধারা (continuity), দিহতা ও তাদাত্ম্যকেও তাহার সাথে সমাধিত করিয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তম-দর্শন আস্বাদন করিতে হইবে। জীবনের বাহিরে একান্ত বাহ্য ও একান্ত অন্তরের দ্বার', একান্ত জড়

বা একান্ত চৈতন্যদ্বারা 'সমুদায়' সৃষ্টি সম্ভবই নয়। জীবনের বাহিরে উহারা আলোহীন পরস্পর-সম্পর্কিত প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র। কার্যকারণ শৃঙ্খল ও সাততা যুগপৎ স্বীকার না করিলে সৃষ্টি 'শয়তানের মতো' পরিণত হয় সত্য, কিন্তু একান্ত ভাবে কার্যকারণ শৃঙ্খলা ও সাততা স্বীকারে মানুষ যে কার্যকারণ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া জীবনের সব মুক্তির সঙ্গে ক্রীতদাস হারাইয়া ফেলে, continuity-র নেশায় ক্ষণ-মাধুর্য-আস্বাদনে বঞ্চিত হয়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চূর্ণীকৃত হয়— ইহাও কি সত্য নয়?

যে জীবন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করা ছিল বৌদ্ধ দর্শনের প্রয়োজন, সেই যন্ত্র আবার যে মৃত, সেই মৃত। অথচ মৃত যন্ত্রকে ক্ষণিকবাদের যাদুস্পর্শে জীবন্ত যন্ত্র গড়িয়া তোলাই ছিল বৌদ্ধদর্শনের ভিতর পুরুষোত্তম-দর্শনের ইঙ্গিত।...বর্তমানে চলিতেছে বুদ্ধ যুগ। প্রাক্-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্র এই ক্ষণিকবাদের ভিতর দিয়া সমাজকে মুক্তি-ক্ষেত্ররূপে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।...

প্রাণ-সাধনা ক্ষণিকবাদেরই সাধনা। যে প্রাণ লইয়া বুদ্ধ আসিলেন, তাহার শত্রু morality-র কঠিন শেষণে সে প্রাণ মূর্ছিত হইল।

এইখানে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিকোণের সার্থকতা ও ব্যর্থতা উভয়ই দেখাইয়া সিদ্ধান্ত দিতেছেন,—"পুরুষোত্তম-জীবনকে, পুরুষোত্তম-জীবনের ঘটনাপুঞ্জকে বাদ না দিলে বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদ পুরুষকারের নিরোধের ভিতর দিয়া সহজের উৎপত্তিমাত্রও প্রমাণ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্ন ক্ষণপুঞ্জ কেন যোগে যুক্ত হইয়া বিশ্ব-সঙ্গতিরূপে গড়িয়া উঠিল বলিয়া অনুভূত হইবে? সেইজন্যই বলিতে হয় যে ক্ষণিক-বাদ ও সন্তুতিধারা যখন একান্ত ভিন্ন, তখন বিশ্বের উৎপত্তিমাত্রও অসম্ভব হয়।" পুরুষোত্তম-স্বীভাব কোনও একটী আধারেই আটক হইয়া যাইবে না। সে একান্ত উৎপাদও-নয়, সে একান্ত নিরোধও নয়; সে একান্ত সৎও নয়, একান্ত অসৎও নয়। সে দুইয়ের অতীত অথচ দুইয়ের সমন্বয়ে সমগ্র সচ্চিদানন্দঘন বস্তুসত্ত্ব।" এইভাবে দুই চিন্তাবিরোধের পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তাধারাকে মিলাইয়া একটী দার্শনিক রাস-ক্ষেত্র রচনা করিবার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। আজিকার মানুষকে যে বিশ্ব জুড়িয়া সর্ব ক্ষেত্রে এক মহা মিলনের রাস ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতেই হইবে!

দাদাঠাকুর

— শ্রীহৃদয় রঞ্জন ন্যায়তীর্থ

"বাংলাদেশের মানুষও এদ্যাবধি তিনি যে খাঁটি দেশী নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তার মূল্য হয়তো আধুনিকতার পালিশ নাই, কিন্তু তার ঝাঁ ঝালো স্বাদ সহজ আহরিত, নিভেজাল হৃদে পরম ভোগ্য।"—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাঁর উদ্দেশ্যে এই উক্তি তিনি হচ্ছেন ৺ হরিদ্র চন্দ্র পণ্ডিত—বঙ্গ বিশ্রুত হাস্যরসিক দাদাঠাকুর। গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, আজানুলম্বিত, পদ্মযোড়ে বাঙালী আমরা যখন নিমজ্জমান তখন এই অগ্নিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। অর্থে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, ভোগে একান্ত অরুচি। শুচি-স্নাত পুরুষ—বক্ষে শুভ্র উত্তরীয়, হাঁটু অবধি শুভ্র বাস, নগ্নপদে লাটসাহেবের দরবার, রাজা মহারাজার সভাতেও সমাসীন হয়েছেন। দারিদ্র্যের মলিন ও যেন এক মহিমা। বিলাস বিষ কখনও এই পবিত্র পুরুষকে স্পর্শ ক'রতে পারে নি। বিলাসিতাকে নিজের জীবনে যেমন বরদাস্ত করতে পারেন তেমনি অন্যের বাবুয়ানার প্রতিও ছিলেন কটাক্ষ তাঁর ভাষাতেই বলি—

পেটের দায়ে রাজা মিলে না হতে থাকে বাবু
বাঁচিবে কিসে দেখাতে চায় আমি মস্ত বাবু।

সত্যই দাদাঠাকুর তখন যেন এক আলোক পথ-নির্দ্দেশী। চরিত্রের কাঠিন্য, সহজসন্তোষ সরল জীবন যাত্রায় কালের চক্ষুও ভয়-ভয় মনে নিজের এক সিংহাসনে সমাসীন। গঙ্গার নীরের মত নির্ম্মল শুচি-সুন্দর অন্তর খানি, বক্ষে আবার সূর্য্যের মত অসীম তেজ। একদিকে তিনি হাস্যরসিক আশুতোষ শিব অন্য পক্ষে মহাকাল রুদ্র। অন্যায়কে তিনি কোনদিন গ্রহণ করতে পারেন নি। যে কোন পরিবেশে তিনি সত্যাচারীর মত অনাচারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। উপরে দেশসেবার পবিত্র নামাবলী অথচ অন্তরে স্বার্থের পুতিগন্ধ, সেই সব দেশনেতার উদ্দেশ্যে তাঁর ক্ষুরধার বাণী—

জননী বঙ্গভূমি—এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান
ছাড়াই কেবল স্বদেশ উদ্ধার স্বার্থ মোদের যেমন জ্ঞান।

এবার তাঁর হেডমিস্ট্রেসের এক ইতিহাস তুলে ধরি। জঙ্গীপুরের নিকটস্থ পল্লী দফরপুর। সেই পুরের পুরবাসী তখন দাদাঠাকুর। একদিন এক গোয়ালা, "ক্ষীর নেবেন—ক্ষীর—" হাঁকতে হাঁকতে জমিদারের সৌধ সম্মুখে। "ক্ষীরের মূল্য কত?"—প্রশ্ন করেন জমিদার। গোয়ালা বলে—"ছ আনা করেই তো দিলাম হুজুর, আপনি চার আনা দিন।" জমিদার বলেন, "দু-আনা-হয় তো দাও।" "না বাবু!" বলে গোয়ালা আবার হাঁকতে হাঁকতে চলতে থাকে। পল্লীপথে দাদাঠাকুর প্রশ্ন করেন, "ক্ষীরের দাম কত?" উত্তর হয় "চার আনা বাবু।" ক্ষীরের-পাত্রটি তুলে নেন দাদাঠাকুর চার আনা দিয়ে। গোয়ালা বাড়ীর পথে পা বাড়ায়। হঠাৎ পল্লীমহারাজের প্রশ্ন—কি হে, তোমার ক্ষীর বিক্রী হ'ল? খুসমত খেয়ে গোয়ালা বলে, "হাঁ হুজুর, ঠাকুর মহাশয় নিলেন"। গোয়ালা চলে যায়। জমিদার

বাবু তৎক্ষণাৎ সিপাই পাঠিয়ে তলপ করেন দাদাঠাকুরকে। সহংবাবু চাষির ছেলে জমিদারবাবু বলেন, "ক্ষীর খেতে পার, খাজনা দিতে পার না? তিনদিনের মধ্যে খাজনা চাই,নইলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে নেওয়া হবে।" হাস্যরসিক দাদাঠাকুর হাসির ফুলঝুরি উড়িয়ে বলেন, "বাবুমশাই, ক্ষীরের একটু লোভী; জানেন তো—"ভোজনে ন হাস্তি বিপ্রাঃ, মরণে মেদদর্শনে।" কিন্তু ভয়াচ্ছাদিত অগ্নি অচিরেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। গৃহিণীর গায়ের গহনা বিক্রী করে খাজনা শোধ করেন। তারপর দাদাঠাকুরের মধ্যেই দাম্ভিক জমিদারের সীমানা ছেড়ে রঘুনাথগঞ্জে বাসা বেঁধেন।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিংবা আঘাত খেয়ে মরি

কবিগুরুর কথা স্মরণ করে পুরুষকার প্রতাপী দাদাঠাকুর সেখানে একটি ছাপাখানা করেন। অর্থাভাবে প্রেসের সব সরঞ্জাম কেনা হয় না। ছেচল্লিশ টাকায় প্রেস—কোনরকমে চেক দাখিলা, নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি উপহার ছাপা হয়। হঠাৎ সংবাদ পত্র ছাপার সাধ জাগে দাদাঠাকুরের। কিন্তু এ প্রেসে কি সম্ভব? 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী'—এক সাহেবের দৌলতে একশো টাকায় পেয়ে যান একটি প্রেস। প্রকাশিত হয় 'জঙ্গীপুর সংবাদ' সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকার প্রসঙ্গ তুললে তাঁর নিজের প্রাণের ইতিহাস এসে যায়। লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ। দিগন্ত বিস্তৃত তাঁর সুশাসনের খ্যাতি। একদিন মহারাজ ডাক দেন দাদাঠাকুরকে। হাজির হন মহারাজের সম্মুখে দাদাঠাকুর। এ কথা সে কথার পর মহারাজ 'জঙ্গীপুর সংবাদকে' উন্নত করার কথা উত্থাপন করেন। তার দরুণ পঁচিশ হাজার টাকা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রস্তাবে কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের মন মুহূর্তের মত নেচে উঠে না। তিনি সে দান তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজ অপলক নেত্রে দরিদ্র বিপ্রকে দেখেন। তাই তো অন্তরে ছন্দের তরঙ্গ তে লে—

বাঙালী তো বাঙালী সব হাতটি পেতেই থাকে
দান পেলে যে নেয় নাকো দান কেমনে তুলি তাকে।

অবধূত মহারাজ শরৎ ঘোষের মত শরৎ পণ্ডিতও চেয়েছিলেন কলুষমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ। পণপ্রথা সমাজের একটি দুষ্ট ব্রণ। মুখে আমরা পণপ্রথা নিয়ে গালভরা বুলি আওড়াই কিন্তু আমরা কজন পুত্রের পিতা কাকন ছোপা মুদ্রা বিনে বধূবরণ করে নিয়ে আসি? অথচ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই দরিদ্র বিপ্র পুত্রবধূ এনেছিলেন শুধু লালপেড়ে শাড়ী আর হাতা শাঁখা হাতে। একবার দাদাঠাকুরের প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধার কলেরা হয়। সারাদিন থেকে রাত্রে মহিলাটি মারা যায়। বৃদ্ধার তিন ছেলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আসে, কেউ শবযাত্রী হতে চায় না। শেষে তিন ছেলেকে নিয়ে দাদাঠাকুর অবশেষে করে আসেন কিন্তু কয়দিন পরে 'জঙ্গীপুর সংবাদে' বিরাট একটি কবিতা প্রকাশ করেন, তার একটি কলি এখানে উদ্ধৃত করি—

চৌঘাটে ব্যারাজে মরা ঘুঘুর লোকের দোষ
তাঁদের ব্যাধি হবে বুঝি কুকুলীন, দেল খোস।

দাদাঠাকুরকে মনে হয় যেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের এক ভক্ত শিষ্য। উভয়ের জীবনে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। প্রথমেই দেখি তাঁদের নামের মধ্যে এক অপরূপ মিল। উভয়েই দেখি আমরণ

বিশাল বাহুর একান্ত অকৃচি। দরিদ্র বহুদীন্ত জনেই—আবার দুজনেই চেয়েছিলেন সচা গলা মাটির বুকে নন্দন কানন সৃষ্টি করতে কেউই আপন আদর্শ থেকে চ্যুত হননি। অবধূত মহারাজ নবদ্বীপ, মথুরা, বৃন্দাবনে রচিতেছেন উপনিষদ, ভাগবতের ভাগবতী ধারা। দাদাঠাকুর বিশ্বের সহায় ঢেলে দিয়েছেন ছাত্রদের জন্য স্নোত। একজন দিয়েছেন অমৃত আর একজন দিয়েছেন বিমল আনন্দ। তাই তো অবধূত মহারাজ আমার মনের মণিময় সিংহাসনে দেবতারূপে বিরাজিত। দাদাঠাকুর আমার দীক্ষাগুরু; আজ তাঁর চরিত্র চিত্রিত করে আমি চরিতার্থ, কৃতার্থ, ধন্য।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(১৯৭৫)

বহিশোলের মোহিনী মুখার্জী আসে সন্ধ্যায়। অনেক কথা হয়। সে বলে যাওয়া পরা ছাড়া আর কিছুতেই কোন concern নাই। অথচ 'মন' একা থাকিতে পারে না—বলিল। যতদিন বয়স থাকে, কর্মক্ষমতা থাকে, ততদিন কাহিনী নিয়া থাকা চলে, কিন্তু শেষে কর্মক্ষেত্র সব সরিয়া দাঁড়ায়, 'মন' বাঁকা হইয়া দাঁড়ায়, তখন মনের খোরাক যোগাইবে কি করিয়া? তাই বেকার বৃদ্ধের দল ধর্মসভায় যোগদান করে। কেহ বা তখন তীর্থ-পাশা খেলায় বা পার্কে পার্কে ঘুরিয়া বেড়ায়। 'মন' লইয়া তখন তাহারা বিপন্ন। ওরা ভিন্নগ্রহের

সব কিছু ব্রহ্ম-বস্তু তো জীব পাইয়াই আছে, এ সে স্বতঃসিদ্ধ পাওয়ার বেশ। এই পাওয়াকে বুঝিতে হইলে দেহপ্রাণমন সব দিতে হয়, সর্বস্ব দিয়া ব্রহ্ম হইতে হয়। না দিলে 'হওয়া' হয় না। না হইলে পাওয়াও যায় না। মানুষেই পাইবে কি? উহা তো পাইয়াই আছ। সব মাকে দেও, পাইয়াই যে আছ তাহা থাকিবে; না দিয়া, না হইয়া পাইতে গেলে সে পাওয়া হয় পরিচ্ছিন্ন পাওয়া, সংসারের টাকা কড়ির মত আর একটি তৃতীয় জিনিষ পাওয়া। ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম পাইতে হয়। নচেৎ 'আপা' দোষে আপত্তিত হয়। আমার 'প্রাপ্' ধাতুর কর্ম তিনি হইবেন, এই বিশ্ব হইবে? সব কিছু যে আমার বিভিত্তুমি, background। ইহাদের সত্তায় আমি সত্তাবান, ইহাদের দিয়াই আমি 'আমি'। পূর্বে আমার পরিচ্ছিন্নতা হইতে নিজনে লইয়া ইহাদের মধ্যে নিজেকে দেখিয়া, পাইয়া ইহাদের বনিয়া যাইতে হইবে। তবে না পাওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে? ইহাদের হইয়া বা ইহারা হইয়া ইহাদের পাইতে হইবে। বিচ্ছিন্ন থাকিয়া বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পাওয়া বিচ্ছিন্ন পাওয়া ছাড়া আর কি? কোন অপরিচ্ছিন্নতা এখানে নাই।

এ পাওয়া বিচ্ছেদপূর্ণ। অবিচ্ছেদে পাওয়া হয় যদি তাহা দিয়া পাওয়া বা হইয়া পাওয়া হয়। আত্ম-সমর্পণেই আত্ম-লাভ। আমাকে দিয়াই আমাকে পাইতে হয়। না দিয়া পাওয়া বা না হইয়া পাওয়া হৈতের পাওয়া। তাহা নিতান্তই অল্প। ঠাকুর, আমাকে এমনি করিয়া দিয়া, হইয়া তোমাকে পাইতে দেও। অজিত সোহাগিনে উজ্জ্বলভাবে দিয়া আসে। রেণু যায়ও যায়। সন্ধ্যায় রেণু নকুলবাবুর বাসায় যায়, না পাওয়ার কাল হয়, টান আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া আসে। পুণ্ডরীকবাবুর বাসায় যায়। অর্থ আমাদের হরিদ রই রাখিয়া আসে। সন্ধ্যায় পরিমল ও সুব্রত আসে চিনু ৪, নীলু ১, মীরা ১, যমুনা ৫, টাকা দিয়াছে। যমুনা সন্ধ্যার পর আসে। ৪৫ জন লোক হইবে কালিকার উৎসবের জন্য। বীরেন ডাক্তার ১, টাকা দেয়। চরিদাসী কিছুটা লাউ, কুমড়া শাক রেখাকে দিয়া পাঠাইয়া দেয়। অমরেশ এক চিঠি দিয়াছে, ১০, টাকা চাঁদা করিয়াছে। শরীর ভাল থাকিলে আসিতে পারে পরিমল দ্বারা বলে। আজিকের রাত্রের অনুশ। ৫ই ডিসেম্বর

কৃষ্ণা পঞ্চমী (বাত্রিশী) ছবিবারে আমার জন্ম তিথি, আমার জীবনে নিত্যগোপাল-আবির্ভাব তিথি 'জন্মকর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন', 'নৈতৎ পেশস্তরং যাতন্ কুতাং বেদ প্রবেশিতঃ। যাত তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বদেহমনস্মরন্'। ঠাকুর, তোমার জন্মই আমার জন্ম—ইহাই আমার জন্ম-তত্ত্ব। তোমার কর্মই আমার কর্ম—ইহাই আমার কর্মতত্ত্ব। আমি ইহা জানিয়া দেহত্যাগও করিব না, পুনর্জন্মও লইব তোমাকেই লইয়া আমার এই দেহপ্রাণমনের দিব্য রূপান্তর হইবে, যেমন কুমুদকে সোনার দরজা করিতে করিতে কাঁচ-সোনা পুরা দাম ত্যাগ না করিয়াই কুমুদকে সোনার দেহভাব আত্মভাব প্রাপ্ত হয়। আমি নিত্য-গোপালময় হইব—ইহ ও আমার ওতপ্রোত চলম। 'বীতরাগভয়ক্রোধা. মন্ম য়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো জ্ঞান তপসা পূতা: মদ্ভাবমাগতাঃ'। জন্ম কর্ম সম্বন্ধে রাগ ভয় ক্রোধ হইতে মুক্ত হইব, তন্ময় হইব, তোমার উপাশ্রিত হইব, জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা পূত হইব, তোমার জন্ম প্রাপ্ত হইব। তোমার জন্মে জন্মগ্রহণ করিব। 'অনন্তস্তত্তা। তত্ত্ববুদ্ধি: বুদ্ধিলয়া-তত্ত্বায়ম্'। আমার অনন্ত বুদ্ধি হউক, আমি তত্ত্ববুদ্ধি হইব, আমার অতান্ত বুদ্ধিলয় হউক, প্রাণলয় হউক, দেহলয় হউক। আমি তুমি হইয়া সার্থক হইব। আমি নাস্তি, আমার বুকে তুমি অস্তি। আমার না-থাকার বুকে তুমি রমণ কর। তুমি ব্রহ্ম-রমণ, আমি ব্রহ্ম-রমণী। তোমার জয় হউক অজিত পারা দিনে আসে নাই। রেণু মঠ হইতে ও কিনিয়া ফুল, মালা আনে। চিনু, নীলু, হরা, মন্টু ও শক্তি আসে ১১ টার পর। জয়া আসে। বিভা লইকার দই ও সন্দেশ আনে। প্রসাদ পায়। মন্টু ও তাদের মাস্টার আসে। মন্টু ১০৲ + ২৲ টাকা দেয়; মালা গাঁথে, সভায় থাকে। রাজেন-বিষ্ণুপদ আসে। বীরেন আসে। প্রসাদ—খিচুড়ি, বেগুনভাজা, পাঁচমাক মিশানো, আলুকপি, চাটনি, বুঁদে। সেবানন্দ আসে। এই টার আলোচনা আরম্ভ হয়। রেণু প্রতিভা নীলু প্রবন্ধ পাঠ করে। ভাল হইয়াছে। আমি কিছু বলি। নকুলবাবু কিছু বলেন। ফুল ও মিষ্টি আনেন। সকালে

আমার থেকে ঠাকুরের পূজা এরা করেন। আমি আশীর্বাদ জানাই। বিমলা, বিরজা, সুধাংশু আসে। নীলরতনবাবু আসেন, চিঠি আনেন। ললিতবাবু ও নীলরতনবাবু আলোচনা শেষে প্রসাদ পান।...আলোচনার সময় গুরু লোকে পূর্ণ ছিল। ছোট নীলু ললিতবাবু পান গায়। মাষ্টার ও তার সকালে আসে। কিছু জিনিষ আনে, ১০৲ টাকা দেয়। পরিমল সকল ব্যবস্থাই করিয়াছে। নীলু খুব বড় দুইটী বেলুন আনে। উপরের সকলে প্রসাদ পায়। ভক্তিযোগদর্শন ও ঈশোপনিষৎ হরহরীতে পাঠ ও আলোচনা হয়।৬ঠা ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার কৃপায় বুঝিয়াছি যে, অরবিন্দের অতিমানস আজ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপে, শ্রীনিতাগোপাল রূপে অবতীর্ণ। ইহাই তো গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে মাটির বুকে অবতরণের [descent] তাৎপর্য। নিজের ইচ্ছায় ও প্রকৃতির বিবর্তনে পুরুষোত্তম (অতিমানস) আজ জীবের দুয়ারে। এখানে তাঁহাকে সকল দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে, নর হইতে হইবে, ব্রহ্ম হইতে হইবে। তিনি বিশ্বরূপ, তিনি বিশ্বনাগরিক—'I am a cosmopolitan.' বিশ্বরূপ হইয়া বিশ্বরূপ পাইতে হয়। এ সাধনায় উপরে উঠা ও নীচে নামার দ্বন্দ্ব নাই। অতি মানস যে অবতীর্ণ তাহার প্রমাণ এই যে, বিজ্ঞান পর্যন্ত ইহা বহিয়া ফেলিয়াছে। 'The law of excluded middle' আজ যে অচল হইল তাহা কি অতিমানসের অবতরণের ফলেই সম্ভব হয় নাই? অতিমানস যে আজ বন্যার ধূলায়—'মনে বনে এক করি মানি'। 'আমার মন বৃন্দাবন।' অনন্ত প্রকৃতির সাধনারই তাঁহার বুকে আজ অতিমানস অবতীর্ণ। আজ সংসকে এই তত্ত্ব আস্বাদন করিতে হইবে মাত্র। বিশ্বপ্রকৃতি ও অতিমানস আজ একতনু, তদাত্মতা প্রাপ্ত। সংসের বুকে আজ এই লীলারস জমিয়া উঠিবে। শ্রীঅরবিন্দের চেয়ে শ্রীনিতাগোপাল এইখানে বেশী বলিয়াছেন। অন্তর্বিশ্বের সাধনা শুরু হইতে হবে, হক হইতে সবে। এ পথে এই কয়ে আর নামিয়া আসা সম্ভব হইবে না। অতিমানস আজ ভূমা-ব্রহ্ম-সত্যের বুকেও স্বপ্রভাবে সমার্থভাবে অবতীর্ণ জীব তাঁহাকে পাইয়াছে। এইবার বুঝিয়া লইতে হইবে, আস্বাদন করিতে হইবে। চাবিক পাইয়াছি, চিনিয়া আস্বাদন করিতে হইবে মাত্র। নিতাগোপাল, তোমার জয় হউক। বেলু ৩টার পূর্বে বাহির হইয়া ডাঃ জে. সি. মুখার্জীর বাড়ীতে যায়। ক্যালসিয়াম ইনজেকশান দিয়া দেয় এবং ৪টা দিয়া দেয় একদিন বাদে বাদে দিবার জন্য। অমরেশের ১০৲ টাকা আসিয়াছে। ইলেক-ট্রিক স্টোভে দুধ রুটি তৈয়ার করার জন্য তুকারাম আপত্তি জানাইয়াছে। যদি পৃথক হীটার পাই, ব্যবহার করিব। ইহা লইয়া হুড়াহুড়ি করিব না। হেডিও, ফ্যান, দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আলো জ্বালাইয়া খরচ তো প্রচুর হয়। কি আর বলিব, আমি একাই চলিব। ৭ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, যে দর্শন তোমায় বলিয়া বুঝিয়াছি এবং যাহা আমি মানুষের কাছে বলিতেছি তাহা পূর্ব পূর্ব দর্শনের চেয়ে এতই পৃথক যে লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। তোমার দর্শনের আরম্ভ 'তুমি' হইতে, ভগবান হইতে, পাওয়া হইতে। প্রচলিত দর্শন জীব-কৈন্দ্রিক, আরম্ভ তাহার না-পাওয়া হইতে। তোমার দর্শনে সিদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ, সাধনা সিদ্ধির আস্বাদন, কর্ম মুক্তির আস্বাদন। প্রচলিত

যার সবকিছুকে ছাড়িয়া আত্মার দিকে, আর তোমার যার সবকিছুর ভিতরে গূঢ় আত্মবস্তুকে, ব্রহ্মবস্তুকে খোঁজা ও আস্বাদন করা। তোমার দর্শনে সবকিছুর ক্ষেত্র যত ব্যাপক হইবে, যার যত ব্যাপক রূপের ভিতর জন্মিয়া উঠিবে, তত অন্তর্মুখী যানের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। বাহির ছাড়িয়া ভিতরের যানে যাহার ভিতরকে নীচের দিকে আকর্ষণ করে, ভিতরকে বাধা দেয়; কিন্তু সবকিছুর আন্তরিক যান ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর বলিয়া উহা অন্তর্মুখীও বটে। ক্ষেত্র যত ব্যাপক, যার তত অন্তর্মুখী। এই সাধনার ভিতর-বাহির এক। বাহির ছাড়িয়া ভিতর বেশীদূর উঠিতে পারে না। কমই যার, যানই কম। যানের জন্য আমি বিরাট কর্মক্ষেত্র প্রসারিত দেখিতেছি। যত ব্যাপকতা, তত যান-যোগসিদ্ধি। 'আত্মা' অর্থ ব্যাপকতা—অন্তরে ব্যাপ্তোতি ইতি আত্মা। ক্ষেত্র ব্যাপকতম হইলে তাহাও আত্মা। এখানে আত্মা অর্থই সবকিছু বা অনাত্মা। ইহাই অদ্বৈত যান। সর্বকিছুখানির সমগ্র যানে আত্মযানে সহজ। তোমার তত্ত্ব চাউক। অজিত সকালে অতুল সেনের 'ফাস্ট' চটকে গ্রাহক বাবদ ৬ টাকা আনে। লেখের এলাচ পেলাই করিয়া লেপ দেওয়া হয়। সে দূর হইতে লবের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিয়া আনিতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের মত হয় নাই বলিয়া অবসন্ন হয়। অথচ কোন অবস্তুই যে একান্ত নয়, উহা যে ঘটনার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে ঘন হয়, তাহা কি প্রবেশের ভাবুক দল বুঝিতে চায়? 'এক দিনে' হয় বটে। কিন্তু তাহার বোধ বা আস্বাদন কতদিন সাপেক্ষ। রেণু সকালে বাহির হইয়া হাইটার্স হইয়া আসে। ডিপোশ্বরে বিজ্ঞাপন দিবে। কুবেরের চিঠি আসিয়াছে। আমুয়ারী হইতে টাকার চাকুরী হইয়াছে ...আমু ৫ টাকা ও কিরিন বাবু ৫ টাকা পাঠাইয়াছে। ভিতীন বাবুর জন্য ঘরে বাহিরে' ও 'শেষ প্রশ্ন' রেজিষ্টার্ড বুক পোষ্টে পাঠানো হইয়াছে। গত কাল অজিত তাহার জন্য Suggestion রেজিষ্ট্রী ডিপিতে পাঠাইয়াছে। ওই 'ডিপোশ্বর'।

মুক্তির যত আস্বাদন যেমন কর, কর্মের তত আস্বাদনও তেমনি মুক্ত। পুরুষোত্তম-কৃষ্টিতে কর্ম মুক্তিকে জন্ম দিবেই কর্ম বন্ধনও হয়, মুক্তিও হয়। মানুষ কর্মে বদ্ধ, কর্মে মুক্ত। কর্মে অন্ত দর্শন, অন্তরে কর্ম দর্শন হইলেই বন্ধন মুক্তির সমন্বয় হয়। কর্মের জন্য চাই মুক্তি, মুক্তি আস্বাদনের জন্য চাই কর্ম তাই বিদ্যা অবিদ্যা জীবনে সমন্বিত। আমি চাই অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কর্ম। মুক্তি, কর্ম, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান কিছুই absolute already made নয়। উহারা ever becoming। বিশ্ব-ঘটনার ভিতর দিয়া অনন্ত কাল মুক্তি-বিশ্বাস-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। বিশেষ কোন ঘটনায় যাহাকে বিশ্বাস করা চলে, এই জটিলতম ঘটনায় হয়ত সে বিশ্বাসের পাত্র নাও হইতে পারে। I. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যে B.A তে উত্তীর্ণ হওয়া নিশ্চিত, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। 'সংসার পার হওয়া' এমনই 'becoming'। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যত দিন না মুক্ত জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস করিতেছি, ততদিন ব্রহ্ম-ক্ষেত্রে উহাদিগকে লাভ করা ঐতিহাসিক, ঠুনকো, ভাবুকতা, barren। উহাদের কোন creative value নাই। প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বয়ই তো পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম-সাধনাই creative। ঠাকুর,

তোমার স্পর্শে আমার যেন তাহা লাভ হয়। আমার জীবনে তোমার জয়যাত্রা সার্থক হউক। বেণু ও অজিত ৮ টার বগলিং লঞ্চ প্রভৃতি ৪ জনে যায় যায় বগলিং লঞ্চের সঙ্গে দেখা হয় না। একজন গ্রাহকের টাকা পাইয়াছে। পাবনীবাবুর বাসায় বেণু ১১৷৷-টার পর যায়, সেখানে যায়। পাবনীবাবু ৫৲ টাকা মূল্যে দিবে পরিষ্কারভাবে ৪ টাকা দিয়াছে। সেখান হইতে সুযোগ মুখার্জীর ওখানে যায়। দেখা হয় না। শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতীর শিষ্যদ্বয় আশুবাবু (রাণী শঙ্করী লেন) ও অন্য একজন সকালে ১০টার পর আসেন। তালিকাভুক্ত তাহাদের মধ্যে কোন রবিবার ভিন্ন ভাব উৎসবে যাইতে অনুরোধ করেন। রবিবার সম্ভব হইবে না বলিলাম। 'ভক্তিযোগদর্শন' কিনিবার জন্য ১৲টাকা দেন। ৭ই ডিসেম্বর

ফল (লাউ কুমড়ার) আগে, ফুল পরে। প্রাণ-সাধনারও সিদ্ধি আগে, সাধনা পরে; গন্তব্যস্থল আগে, পথ পরে; ভগবান আগে, সাধনা পরে। ঠাকুর, তুমি হঠাৎ না ভক্তিযোগদর্শনে বসিতে চাহিয়াছ? 'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবানে প্রেম অনুরাগ না হইলে তাঁহার পূজাদিতে অনুরক্তি হয় না'। 'শ্রীভগবানের কৃপায় কেহ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে তাঁহার ভক্তিযোগ-বিধায়িনী সাধনার অপেক্ষা করিতে হয় না'। মনের স্তরের সাধনায় আগে সাধনা, পরে সিদ্ধি; আগে পথ, পরে গন্তব্যস্থল; আগে সাধনা, পরে ভগবান। মনের সাধনা 'আমি'কে কেন্দ্র করিয়া, তাই পথ আগে। প্রাণ-সাধনা ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া, তাই পথ ও সাধনা পরে। মন না পাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পথ বহিয়া পাওয়ার দিকে চলে। আর প্রাণ সহজ ভাবেই পাইয়া পথ কাটিয়া না-পাওয়ার ব্যথা জয় করিতে করিতে চলে। সাধনার সূত্রগুলি দুই ক্ষেত্রেই সমান। একটী পরে, অপরটী পূর্বে। মনে সাধনা পূর্বে, প্রাণে সাধনা পরে। এই প্রাণের স্তরকেই আইন্‌ষ্টাইনের 'fourth dimension'-এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। জীবনে মনের গতি (speed) হইতে গতি বাড়াইতে পারিলে future (ভবিষ্যৎ) পিছনে পড়িয়া যায়। প্রাণ-সাধক অনন্ত ভবিষ্যৎকে বুকে পায়। শ্রীনিতাগোপাল বর্তমান যুগের ভবিষ্যৎকে বুকে লইয়া আসিয়াছেন, তাই বর্তমান যুগের সমস্যা তাঁহার পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। তাই ইনি বর্তমানের প্রাণ-পুরুষ। তাঁহার ছোঁয়া পাইয়া আমিও বর্তমান সমস্যাকে পিছনে ফেলিয়া ভবিষ্যৎ বিশ্ব গড়িবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছি। কেহ তাই আমার সঙ্গে নাই শ্রীনিতাগোপাল ছাড়া। জয় হউক তোমার। বেণু কুমারের নিকট ৩০টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া পাঠাইয়া দেয়। 'রবীন্দ্রনাথ ও উচ্ছলতারণ' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করে। ভাবুকতা আমার জীবনে কেবল করিয়া বি, এ, এম, এ পাশ করিতে দেয় নাই, লক্ষ লক্ষ জীবন যে এইভাবে ব্যর্থ হইতেছে, তাহা জ্ঞেয়ের সহিত আলোচনা করি ললিত সরকার ও অজিতের কাছে 'পা যাহার স্থির নাই, মাথা তাহার স্থির থাকিবে কি করিয়া? এই বিশ্ব যে শ্রীভগবানের পা। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি'। অনাদৃত যুয়ুদ ক্ষুব্ধ দল অবশ্যম্ভাবী হেন ভাবুকতার স্তর হইতে। ললিত সরকার সন্ধ্যায় আসেন, একটী গান করেন। অজিতকে তাহার মা শুনাইয়া দিয়াছেন যে আমার এখানে থাকিলে আগামী মাস

হইতে হাবড়ার টাকা পাঠানো বন্ধ হইবে। ইহা আমার কাছে একটা challange। আমার জীবন অনিশ্চয়ের পথ ধরিয়া চলার জীবন। অনন্ত সম্ভাবনার দিকে চাহিয়াই সকল দায়িত্ব লইয়াছি। এবারও লইব ঠাকুর, আমার সকল ভবিষ্যৎ তুমি। মানুষের সমস্যার সমাধান করিব—ইহাই ছিল আমার সাধনা। তোমার জয় হউক আমার জীবনে। ৮ই ডিসেম্বর।

জল দিয়া বীজকে ব্যাখ্যা করিতে হয়, পুরুষোত্তমের জীবনে ব্রহ্মকে বুঝিতে হয়, সিন্ধু দিয়া সাধন ব্যাখ্যা করিতে হয়। কিন্তু এতদিন বীজ দিয়া ফলের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ফলের অনেক কিছুই সন্তোষ আওতা হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ফলে বীজ আছে, অঙ্কুর আছে, বৃক্ষ আছে ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে ফল। তাই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান বুঝিতে হয়, last term দিয়া first term-এর ব্যাখ্যাই পরবর্তী কালে আজ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা পূর্ববর্তী কালে আজ সূর্য-ইক্ষ্বাকুর কাছে ধর্ম বলার ব্যাখ্যা সম্ভব হয়। পুরুষোত্তম-জীবনে whole ও part—অংশী ও অংশ—correlative; দুই-ই দুইয়ের means ও end ঠাকুর, আমি কি ইহা সাধনা করিয়া পাইয়াছি? তিন স্তরের সিদ্ধ আছে—বিদ্যা-সিদ্ধ, কৃপা-সিদ্ধ ও সাধন-সিদ্ধ। সাধন-সিদ্ধদের জীবনে বন্ধন ভীতি আছে, তাই সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে সংসারে চলেন। কৃপাসিদ্ধেরও কিছু ভয় থাকে। বিদ্যা-সিদ্ধের দল নির্ভীক, তাহারা বিধি ভাঙেন গড়েন। বৃটিশ আমলে খাস ইংলণ্ডের লোকই গভর্ণর ও গভর্ণর জেনারেল হইতেন তাঁহারা ছিলেন বিধির ওপারে। বিধির অধীন কি স্রষ্টা হইতে পারে? সকল বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ মানিয়া কেহ সৃষ্টি করিতে বা সৃষ্টি রক্ষা করিতে পারে না। এমন সব emergency ঘটে, যখন বিধি লঙ্ঘন না করিলে সৃষ্টি রক্ষা করিতে হয়। সাধন সিদ্ধের তাহা সাহসে কুলায় না। ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও বিলাতী ম্যাজিস্ট্রেটের চালচলনে আকাশ পাতাল তফাৎ। সাধন-সিদ্ধ ও বিদ্যাসিদ্ধেও তাই। ঠাকুর, আমি তোমার হইব, তুমি হইব, তোমার সৃষ্টি আমি করিব। অজিত সকালে বাহির হইয়া হনজিৎ দত্তের সঙ্গে দেখা করিয়া বালীগঞ্জ ও চাকুরিয়া হইয়া ১২টায় এখানে পৌঁছে। চাকুরিয়ার চিত্তরঞ্জন গুপ্ত আমাকে আঁকড়াইয়া থাকিবার কথা বলিয়াছে। অজিতের পুরোহিত ঠাকুরও তাহাই বলিয়াছেন। প্রচার করিবার যোগ্যতা অজিতের আছে। হেমু বৈকালে হরিদাস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মঠ হইতে একখানি ভক্তিযোগ দর্শন কিনিয়া আনে। তাহাকে ইনভেকশান বীরেন দিয়া যায়। গীতা মুক্তি ভিক্ষা বাবদ···১৲টাকা পাঠাইয়াছে। সুজাতা আসে। সমস্ত শাস্ত্র যে নূতন করিয়া পাইলাম, ইহা কি আমার যোগ্যতা? অসম্ভব। এতখানি প্রতিভা আমার ছিল না। ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের কৃপা। কোনও মানুষেরই এতখানি সৃজনী বা কল্পনা শক্তি সম্ভব হয় না। গীতার যে ব্যাখ্যা পাইয়াছি তাহা দেখিয়া আমিই অবাক হই। কি নূতন জিনিস লইয়াই যে ঠাকুর আসিলেন! বীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছিলেন, 'বক্তার শাস্ত্রের ভিতর এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়াছে'। ইহাই কি ঠাকুরের দিব্য চক্ষু দান? ৯ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, সারা জীবন তোমার আশীর্বাদে 'ছেড়েই যাব পাবে' নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি।

শিষ্যকেও আমার সঙ্গে যুক্তিতর্কদ্বারা সব কিছু মীমাংসা করিয়া লইবার সুযোগ দিয়াছি। তাহাকেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করি নাই। আমাকে না-বুঝিয়া মানিবার কোন কথা বলি নাই। 'দাস' করিয়া কাহাকেও রাখিতে চাই নাই। স্বাধীনে স্বাধীনে ছাড়া প্রেম হয় না—ইহা বুঝিয়াছি। না মানিয়া 'মানা'র কথাই শুনাইয়াছি। প্রাণ যদি মানিতে না চায়, তবে গায়ের জোরে, বিধির জোরে মানাইলে কি হইবে? যোগ্য স্বামী, যোগ্য গুরু, যোগ্য পিতা, যোগ্য পুত্র, যোগ্য শিষ্য হইবার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছি পাছে ধরা পড়িয়া যাই। শিষ্যের মতিগতি বেগে যদি গুরুর অগ্রগতি বেশী না হয়, শিষ্য তো ধরিয়া ফেলিবে। পরস্পর অবর না হইলে প্রেম জমিয়া উঠিতে পারে না। স্ত্রী যোগ্যতায় স্বামীর অবর, স্বামী যোগ্যতায় স্ত্রীর অবর, তবে না পরস্পরকে পাইবার জন্য পরস্পর অনন্ত কাল ছুটিবে এবং এই পারস্পরিক অগ্রগতির মধ্যেই না নিবিকার প্রেম নিহিত? নিবিকার প্রেমকে বিকাশশীল এই জগতের বুকেই স্থাপন করিতে হইবে—ইহাই পুরুষোত্তম কৃষ্টি। একতরফা অনুশাসনে স্থাপিত চির দাস-প্রভু সম্বন্ধ। হয় স্বামী স্ত্রৈণ, নয় তো স্বামী প্রভু। জীবনে তাই গুরুগিরি, বাবাগিরি, স্বামীগিরি, ঈশ্বরগিরি মানি না। কিন্তু এই না-মানার সুযোগে মানুষ আমাকে চরম লাঞ্ছনা দিয়াছে, মুখে মুখে উদ্ধতের মত তর্ক করিয়া আঘাতে জর্জরিত করিয়াছে তবুও স্বাধীনতা দিয়াছি। একদিন মানুষ এই স্বাধীনতা দানের গৌরব মাধুর্য বুঝিবে, ধন্য হইবে। তোমার জয় হউক। ১০টার আশু ভট্টাচার্য ও তাহার গুরুভ্রাতা নিগমানন্দের শিষ্য) আমের 'ভক্তি-যাগদর্শনে'র মূল কথা বলি। এই চিন্তায় যে সব গলদ পাইবে, তাহা বলেন। 'অভিজ্ঞানাতি' শব্দের ব্যাখ্যা শুনিয়া বলেন, এ ব্যাখ্যা জীবনে কখনও শুনি নাই। ভক্তি-যাগ দর্শন নিয়া যান। ৪।৫টার পর অশ্বিনী কুমার অধ্যাত্মিকীর কার্যকরী সভায় অধিবেশনে যোগ দেই বিকেল পাঁচের ট্রেনায়। অজিত সঙ্গে যায়; সভাতে মাস্তব্যের অজিত তোমার বাধ। এরা হিন্দুস্থান আদি। পরে অজিত আমাকে না পাইয়া এখানে ফিরিয়া আসে। সেক্রেটারী বোডের নিকটে রেণু রেজিষ্টারী করিয়া বিল (৬৫৲ টাকার) পাঠাইয়া দেয়। সন্তোষ গুহের এক পোষ্টকার্ড আসে। সে লিখিয়াছে, 'ভোটর মূল্য', ৬০ বৎসর পূর্বে লেখা, আজও তাহার একটী বর্ণ বদলাইবার প্রয়োজন হয় নাই। এক পাঠচক্রে পড়া হইয়াছিল, তাহারা ধন্য ধন্য করিয়াছে।
১০ই ডিসেম্বর

মানুষের ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতাকে কখনও নিজ প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব করিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করি নাই। একদিন টালীগঞ্জ থাকাকালীন ভুলবশতঃ আমার রাত্রির খাদ্য রুটি প্রস্তুত করা হয় না। খাইতে বসিলে ইহা ধরা পড়ে। আমি আসনেই বসিয়া রহিলাম। ইহারা বাজার হইতে পাওরুটি কিনিয়া আনিল। আমি লক্ষ্মী ছেলেটীর মত পাওরুটি খাইয়া উঠিলাম। খুব রাগ করিতে পারিতাম; তাহাতে ইহাদের বলিবারও কিছু থাকিত না। ত্রুটি তো ওরুরই। আমি সে রাত্রি না খাইলে ইহাদিগকে চরম শাস্তি দেওয়া হইবে। ইচ্ছা করিয়া তো এই ভুল করে নাই। হঠাৎ হইয়া গিয়াছে। লজ্জিতও ইহারা হইয়াছে। জীবনে

এই ভাবেই চলিয়া আসিয়াছি। ভুলের চেয়ে পাপের চেয়ে মানুষ বড়, যেমন কাদার চেয়ে জীবন্ত মানুষের চামড়া অনেক বড়। মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিব, ভুলত্রুটী পরে আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্কের মূল্য দান করিয়াছি। ঠাকুর, তোমার স্নেহে পুষ্ট আমি এক রকম 'মানুষে'র মত জীবন চালাইয়া আসিয়াছি। শেষ রক্ষা করিও। জীবনে যাহা ব্রত বলিয়া বরিয়াছি, তাহা হইতে যেন চ্যুত না হই। তোমার জয় হউক। অজিত বাহির হয়। এক পাটি বলিয়াছে যে জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞাপন দিবে। বেণু মঠ হইতে ফুল আনে। ধ্যানের আলোচনা আরম্ভ হয়। ললিতবাবু আরম্ভ ও সমাপ্তি সঙ্গীত গান করেন। শাণ্ডিল্যদেব বলেন, প্রেম সর্ব জীবে সর্ব স্তরের মানুষে আছে, বিকৃত অবস্থায়, অব্যক্তাবস্থায় রহিয়াছে। ভক্তিযোগ-সাধনায় উহা ব্যক্ত হয়। পরমহংসাচার্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলেন, নিত্য প্রেমে বিকৃতি নাই। হীরকের সহিত যেমন খাদ মেশে না, তদ্রূপ নিত্যপ্রেমে বিকৃতি নাই। এই ক্ষেত্রে শাণ্ডিল্যদেব ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী—নিত্য ও শুদ্ধ—ভিন্নমত। প্রেম বিষয়ীদেরও আছে, পশুপাখীতেও আছে, তবে বিকৃত অবস্থায়, ব্রজ-গোপীতে আছে নির্বিকার অবস্থায়। প্রেম কাহারও special prerogative নয়। ভক্তিরাজ্যে রাজার, নারায়ণের কোনও special prerogative নাই। 'The ruler and the ruled will be ruled by the same rule'. কৃষ্ণের বাঁশী চুরি হয়, কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশী শেখান। আজের বাঁশী আজ বুলগানিনের দল বাজান। হীরেন বাবাজী ও মজুমদার পাঠের শেষের দিকে আসেন। সকালে সুহেন রায় আসেন। এম্, এন্ দাসের অন্তর্ধানের জন্য কিছু লিখিতে বেণুকে বলিয়া যান। বেণু তাহা লেখে। রাজেন পরিকল্পনার জন্য ৪৲টাকা দিয়া গিয়াছে। পরিমল মৈত্রকে একটী রসিদ বই দেওয়া হয়। ১১ই ডিসেম্বর

শাণ্ডিল্যদেবের সঙ্গে আবার নিত্যস্বরূপানন্দ স্বামীর মতভেদ। শাণ্ডিল্যদেবের মতে পরা ভক্তি-বিবর্জিনী সিদ্ধি যাহা, তাহাই পরম প্রেমরূপা ভক্তি-বিবর্জিনী সিদ্ধি। কিন্তু নিত্যস্বরূপানন্দের মতে পরম প্রেম, পরা ভক্তি এক নয়। শ্রীনিত্যগোপাল নিত্যপ্রেমের ক্ষেত্রে শাণ্ডিল্যদেবের মত এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে স্বরূপানন্দের মত সমর্থন করেন। শ্রীনিত্য-গোপালের মতে পরম প্রেম, প্রেমাভক্তি ও পরা-ভক্তি একই পরম প্রেমের ত্রিধা বিকাশ। যে প্রেম দ্বারকায়, মথুরায় ও ব্রজধামে সেই সেই দেশ-কাল-পাত্রানুসারে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহাই পরম প্রেম-রূপা ভক্তি। পরম প্রেমের অনন্ত রূপ, তাই উহা সার্বভৌম। পরম প্রেমে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ নাই। ভগবানে ঐশ্বর্য, মাধুর্যমিশ্র ঐশ্বর্য ও মাধুর্য —পরম প্রেম সবই সম্ভোগ করিতে পারে। পরম প্রেমই flexible, কোনও fixed form নাই। ঠাকুর, তোমার এই সর্বগ্রাসী পরম প্রেমের তত্ত্বে কাহারও লোভ জাগিল না! সন্তান সম্বন্ধে মায়ের অদ্বৈত-বুদ্ধিস্বাভাবিক বলিয়া, প্রত্যক্ষ বলিয়া সন্তান-স্নেহ সহজ; উহা সাধনার জিনিষ নয়। কিন্তু মা সম্বন্ধে সন্তানের অদ্বৈতানুভূতি সাধন-সাপেক্ষ। তাই উহা 'সহজ' নয়। অদ্বৈতানুভূতি না হইলে কি করিয়া স্নেহ প্রেম সহজ হইবে? এই কথা, ঠাকুর, তুমি ছাড়া এ পর্যন্ত কে বলিয়াছে? কে করে আসিবে পাগল হইয়া তোমার তত্ত্ব প্রচারের

জন্য? তাহার জন্য সারা জীবন প্রতীক্ষা করিলাম। বেণু দুপুরে বাহির হইয়া প্রেসে পৌঁছের কপি দিয়া কুমারেশ ও রমা সরকার হইয়া সন্ধ্যায় ফেরে। অজিত সুস্থ কর্মক্ষম হইলে অনেক কিছু করিতে পারিত তাহার আত্ম প্রত্যয় আছে, ক্ষেত্রও প্রসারিত, বলিতে পারে। এত মানুষ আসিল, কেহ তো কিছু করিতে পারিল না। যাহাকে পাই আঁকড়াইয়া ধরি সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তি তৃণের মত সকলেই তো ফেলিয়া গেল আমি একা এত বড় দর্শন লইয়া আজ অসহায়. কে 'ভক্তিযোগ দর্শনে'-র যথার্থ বুঝাইবে? উজ্জ্বল-ভারতের তো 'thought leader' হইবার যোগ্যতা ছিল। যে দর্শনের উপর উজ্জ্বল ভারত গড়িয়া উঠিবে, সেই দর্শনই তো উজ্জ্বলভারত পত্রিকা দিয়াছে। সুরেন রায় লেখাটার জন্য ৫০ টাকা বেণুকে দিয়া যান। ১১ই ডিসেম্বর

এক পুরুষোত্তমকে যে-ভক্ত 'সর্বব্যাপী', 'সর্বভূতেষু গূঢ়', 'সর্বভূতান্তরাত্মা', 'কর্মাধ্যক্ষ', 'সর্বভূতাধিবাস' বলিয়া সেবা করেন, সর্বভূত তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া স্বরূপে সেবার জন্য প্রেরণা দেয়, 'কেবল' নির্গুণ করিয়া দেয়। তখন ভক্ত ও পুরুষোত্তম দুই-ই কেবল নির্গুণ। তখন সর্বভূতের নিশা। কেবল ভক্ত ভগবান তখন জাগ্রত, বুকে বুক লাগাইয়া রতি-রসে বিভোর। তখন মাঝে কেহ নাই বাধা দিবার মত, দ্বিতীয় বলিয়া কিছু নাই। বিশ্বরূপের ক্ষেত্র তখন অনুকূল। এই রতি-রস-লীলার পরবর্তী স্তর হইতেছে—নির্গুণ অবস্থা হইতে আবার সর্বের ক্ষেত্রে আসা—'রাই জাগ রাই জাগ' শুক-সারী বোল শুনিয়া। বিশ্বরূপ হইতে স্বরূপে, স্বরূপ হইতে বিশ্বরূপে—ইহাই লীলা-কৈবল্য। 'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্'। এই লোকে স্বামী স্ত্রী যেমন এই দুইভাবে—বিশ্বরূপে স্বরূপে—পরস্পরের সেবা করেন, ভক্ত-ভগবানও তেমনি লীলায় কৈবল্যে—বহু হইতে এক, এক হইতে বহুতে পরস্পরের সেবা করেন। ইহাই পরম প্রেমরূপা ভক্তি। ইহাই শ্রীনিতাগোপাল-দর্শন। কোনও একটীর উপর বেশী জোর পড়িলে পিছন হইতে আক্রমণ আসে, জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, বিকৃতি আসে, হয় অতি-বিকাশ, নয় অবরুদ্ধ-বিকাশ আসে। শ্রীনিতাগোপাল সহজ মানুষ, তাঁহার দর্শনও সহজ দর্শন। বেণু ১টায় পর বাহির হইয়া ব্যাঙ্ক, কুমারেশ, প্রিন্টার্স, কাজল কালি হইয়া সন্ধ্যায় ফেরে। নবদ্বীপের অমরেশ আসে ২৪.টায়, যায় ৪০.টায়। হেমাঙ্গবাবু ১০০৲ টাকা পাঠান। ক্ষিতীন রায়ের চিঠি দেওয়া হয়। কুসুম এক কার্ড দিয়াছে।...সকলের দাবী আমার উপর, আমার কাহারও উপর কিছু দাবী করিবার নাই। সামান্য কিছু দাবী আমি করিলেও কি কেহ তাহা পূরণ করে? আমি একটী উপকরণের মত সকলের সংসারে থাকিলে ভাল হয়। দাবীর দায় যে আর পূরণ করিতে পারি না। কেহ কি আমায় এতটুকু ক্ষমা করিয়াছে? আমি সকলের কাছে অভিযুক্ত। সকালে আশুবাবু ও নারায়ণদাস 'নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী' ও উপদেশামৃত দিয়া যায়। অজিত সকালে আলীপুর গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৩ই ডিসেম্বর

১৯৩০ সালে সমস্ত সেন্ট্রাল জেলে নবন আইন অমান্য উপলক্ষে থাকাকালীন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হাত দেখিয়া (তিনি palmistry চর্চা করিতেন) বলিয়াছিলেন, আপনার

জীবন জটিলতায় ভরা, আছে শুধু গুরুকৃপা। গুরুর কৃপার জোরেই আপনি সব কিছু উৎরাইয়া যাইতেছেন। খুবই বুদ্ধি ঠাকুর। তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ, তাই আমি চলিতেছি। কিন্তু জটিলতাকে পারমার্থিক ভাবে স্বীকার করি বলিয়াই কি যত সব জটিলতা আপনা আপনি আসিয়া জোটে? আমার চতুর্দিকের সব মানুষই তো জটিলতার মূর্তি। দুর্জয় সাহসে সব কিছু পার হইয়া আসিতেছি। আর যেন পারি না। বর্তমানে অজিতের ঘটনা চলিতেছে। সে মানুষ ভয় করে, পথে বাহির হইলেই ইঙ্গিত দেখে, এ পথ হইতে ও পথে চলিয়া যায়। অথচ তাহার বাড়ী হইতে শেষ কথা জানাইয়া দিয়াছে আমার এখানে আসিলে আগামী মাস হইতে তাহার স্ত্রী পুত্রের ১০০ টাকা তাহার ভাই বন্ধ করিবে। হয় তুমি পাগল হইয়া হাবড়া যাও, নয় টাকা পাঠাও—ইহাই তো ইহার নির্গলিতার্থ। সে যে মাথা ঠিক রাখিয়া আজিও পথ চলিতে পারে না, ইহা উহারা বুঝিতে চায় না। ও কি কম অসহায়! আমি কেমন করিয়া উহাকে পথে বাহির করিয়া দিব? ও যে পথে পথে অসহায় ঘুরিয়া বেড়াইবে? আমার যে বড় কষ্ট হইবে! সংসার বড় ঠাকুর, তুমি উহাকে ভাল করিয়া দাও।

ছেলে রোজ গীতা পড়িতাম। অজিত ও বেণু এগেন গুহের কাছে বিজ্ঞানের জন্য দেখা করিতে যায়। দেখা হয় না। শনিবার বিকালে দেখা হইতে পারে। বেণু যাদবপুর কৃষ্ণ গ্রাম. ই. আই. স্কুল ও ব্যাঙ্ক হইয়া ১২টায় ফেরে। আজ সূর্যগ্রহণ। ঠাকুর একবার গ্রহণের মধ্যে চাহিয়া প্রচুর অন্ন খাইয়াছিলেন। অজিতের ইঙ্গিত দেখা করিল না। তাহাকে নিয়া বিব্রত। আমার কোন্ প্রয়োজনে যে ইহারা আসে, ঠিক বুঝি না। জটিলতার মধ্য দিয়া চলিতে শিখাইবার জন্য? অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের শ্রীপ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত প্রতিবাদ-পুস্তিকা ললিতবাবু দিয়া যান। ইহা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিবাদ। Life is from within out'—এই সম্বন্ধে অজিতের সঙ্গে আলাপ হয়। আমি আগে, আমার কর্ম পরে। ১৪ই ডিসেম্বর

নারীকে যেমন তাহার স্বামীর ভিতর দিয়া স্বামীর জগতে প্রবেশ করিতে হয়, প্রতি মানুষকে তেমনি প্রত্যক্ষ জগতের কোনও ভগবদ্ভক্ত গুরুর ভিতর দিয়া ভগবানের এই জগতে প্রবেশ করিতে হয়, ছুঁইতে হয়, আস্বাদন করিতে হয়। কাহারও গুরুর মধ্য দিয়া ছাড়া এই জগৎকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। আকাশের সাধনায় বাস্তবকে ছোঁয়া যায় না, যাহারা জগতের কল্যাণ চান, তাহাদের মানুষ-গুরুর মধ্য দিয়া তাহা করিতে হইবে। যাহারা জগতে ভগবানের লীলা আস্বাদন করিতে চান, তাহাদিগকেও মানুষ-গুরুর মধ্য দিয়া তাহা করিতে হইবে। যাহারা জগৎকে বৃন্দাবনে গড়িতে চান, তাহাদেরও মানুষ-গুরুর মধ্য দিয়া তাহা করিতে হইবে। গুরুর মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্ম আস্বাদন করিতে করিতেই জগতের বুকে লীলা করিতে হয়। মানুষ-গুরুই হইতেছেন ভগবানের জগতে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। আকাশ-সিদ্ধি হইতে পারে গুরুর মন্ত্র দিয়া, কিন্তু মাটির সিদ্ধি অসম্ভব রক্তমাংসবিশিষ্ট কোন মানুষ-গুরুর স্পর্শ ছাড়া। মাটী দিয়াই মাটীকে পাইতে হয়। অথচ মাটীকে ভিত্তি করিয়াই আকাশ দাঁড়াইয়া।

নজরুল

শ্রীগণেশ চক্রবর্তী

সেই চোখ সেই-চুল
চোখে আছে শোকাকুল
সেই শুধু সেদিনের নজরুল

ভবে দেখি বুকফুল
শাখে শাখে দুলদুল
কেঁদে কেঁদে ডেকে ফেরে নজরুল নজরুল

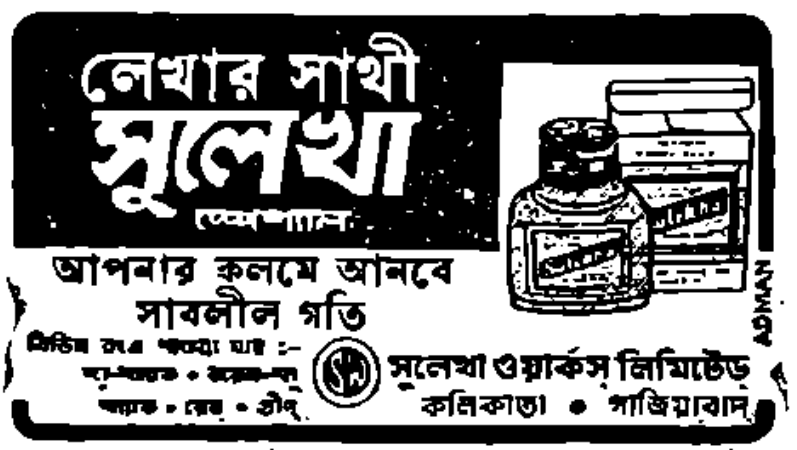

এমন দিনে বলা যায়
বাংলামেসে জুতোর খবর

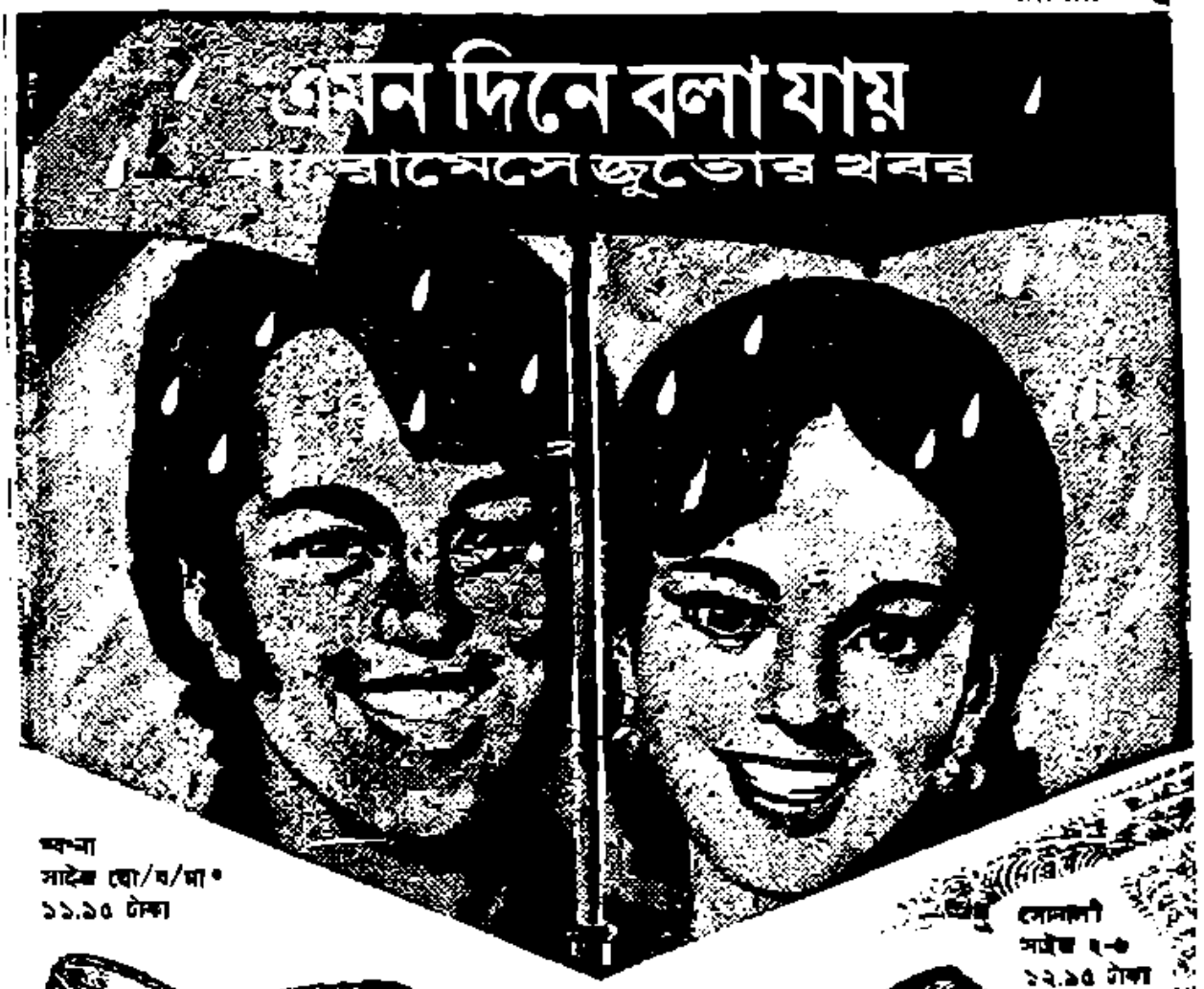

অম্বা
সাইজ ছো/ব/মা •
১১.৯৫ টাকা

সোনালী
সাইজ ৫-৯
১২.৯৫ টাকা

হাকেম
সাইজ ৫-৯
১৬.৯৫ টাকা

নাসরা
সাইজ ছো/ব/মা •
১০.৯৫ টাকা

• ছোট/বড়/মাঝারি

Bata স্যানডাক আর ভালকান বানিয়েছে

—আমাকে তুমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, তুমিহীন আমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

15 JUL 197

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhekrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে কি করে এক-জগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তারই সে সাধন নীচের বইগুলিতে—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের।

মুদ্রিত।		পাণ্ডুলিপি।	
১। ব্রহ্মসূত্র (শাঙ্কর ভাষ্য)		বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	২·৫০	দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী ভাষণ	
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	৮·৫০	ইত্যাদি।	
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	৭·০০		
২। ঈশোপনিষৎ	২·০০		
৩। কেনোপনিষৎ	২·০০		
৪। কঠোপনিষৎ	৩·০০	॥৵ প্রতিভা ছাড়ের।	
৫। প্রশ্নোপনিষৎ	১·৫০	নারী-প্রগতির রূপরেখা	১·২৫
৬। ঐতরেয়োপনিষৎ	১·৭৫	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য	
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ		নিতাগোপাল ও শিষ্যা সুধার কথা	·৩১
৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	২·৭৫	৩। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	·২৫
৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	৩·৫০		
মুণ্ডকোপনিষৎ			
৯। শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে	৫·০০	৷ শ্রীমতী রেণু মিত্রের।	
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ	·৫০	১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	১·০০
১১। গীতাজিজ্ঞাসা	·৩৬	২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	১·০০
১২। উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা	·৫০	৩। শরৎচন্দ্রের শেষ-প্রশ্ন	৩·০০
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে			
পুরুষোত্তম-দৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচনা	৩·০০	ওরিয়েন্ট বুক কোং-প্রকাশিত	
(গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)		৪। রবীন্দ্র স্মরণ	৫·০০
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·৮০	৫। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটী, পোঃ অশ্বিনীনগর, (ভায়া—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী, পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (সি/ও জে. বি. লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

"॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্ম সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয় সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

"আমি বিশ্ব-নাগরিক" "এই বিশ্ব-ই আমার মহামঠ"

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮৪; খ্রীঃ ১৯৭৭] সম্পাদিকা:-বেণু মিত্র [ত্রিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ টীকা টিপ্পনী ভাষ্য মহাভারতাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও যুক্তিমূলক উপসংহার জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৫·০০ টাকা। প্লাস্টিকের জ্যাকেট সহ ১৭·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যানে জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	৬·৫০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সর্বপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
লঘু গীতা	২·৫০	ঐ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ	১·৫০

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মবাণী	১·৫০	Soul of India speaks	৭·৫০
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০

লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম, এ,		শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি টী.	
বাহুবলে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের গল্প গুচ্ছ	
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বঙ্কিমের গল্প	
বাংলার কৃতি	৫·০০	বিদ্যাসাগর	
বাংলার বিদুষী	৩·৫০	ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের	
বাংলার মনীষী	২·৫০	শরীর ও শক্তি	
জীবন গড়া	০·৭৫	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	
ঋষি রামমোহন	৩·০০	সরল যোগ-ব্যায়াম	
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০	যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	২·৫০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	২·৫০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	
রবীন্দ্রনাথ	৩·০০		

ব্যবহারিক মূল্যকেন্দ্রে ১৪·০০

সর্বদা ব্যবহার্য মনোরম অভিনব অভিধান। পরিবর্ধিত সংস্করণে। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬ষ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

উজ্জ্বলভারত

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৮৪, বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৭ [ত্রিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

পোষণ-মূর্তি অক্রূরান শ্রীকৃষ্ণ

—শ্রীরেণু মিত্র

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত মুক্তির চিন্তায় বিভোর—এ রকম লক্ষ লক্ষ মানুষ নানা রকম কৃচ্ছ্র করে নিজাভিপ্রায় কার্যকেই চরম শ্রেয়ঃ মনে করে। পরিবেশের সঙ্গে, চার দিকের যাদের হয়তো আজি তাদের ভালমন্দের সঙ্গে নিজের ভালমন্দ মেশাবার মত মন হয় তাদের অন্তরে যি, মন মরে গেছে। আবার যারা সংসার করে তারাও কেবল নিজেকেই আবর্তন করে, নিজেকেই বাড়ায়—ধনে জনে যশে প্রতিষ্ঠায় গৃহে আশ্রয় করে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতাতেই আমাদের দেশের লোক নিজের বাড়ীর জঞ্জাল পরিষ্কার করে অন্যের বাড়ীর ধারে ফেলে, নিজের বাড়ীর ময়লা জল বের করে পাশের বাড়ীর দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়, বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা অন্যের জমিতে বা সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তার পাশে মলমূত্র ত্যাগ করে, কিংবা বহু পরিবার এক স্থানে থাকতে হলে জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্তটা যে আমার থাকবার ঘর তৈরীর মতই প্রয়োজনীয় একথা এদেশের লোক আজ পর্যন্ত ভাবতেই পারে না—তাই তিনতলা বাড়ী বানিয়ে জলগুলি রাস্তায় এনে পৌঁছে দেয়, অথচ সেখানে কোন ড্রেন নেই। এই হচ্ছি আমরা। অথচ এই আমাদের দেশেরই প্রাচীন কালের মহেঞ্জোদারোর সভ্যতাতেও রাস্তার দুধারে পাথরের চাই দিয়ে তৈরী ড্রেন পাওয়া গেছে যা বর্তমান সময়ের এত অগ্রসর (!) অবস্থাতেও আমরা শহর গুলিতে পাওয়া যাবে না। এ ছাড়াও প্রাচীন কালের ঘটনার পাতা উল্টালেও দেখতে পাই একজন ভগবদ্ভক্ত—নাম তার প্রহ্লাদ—বলেছেন,

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা:
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥'

—প্রায়ই মুনিরা স্ববিমুক্তিকাম হন, তাঁরা বিজনে মৌন হয়ে বিচরণ করেন, তাদের পরার্থনিষ্ঠা থাকে না, আমি এইসব কৃপণদের পরিত্যাগ করে মুক্তি প্রয়াসী নই। আর ইন্দ্রদেব নামে এদেশেরই রাজা বলছেন,

'ন কাময়েঽহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাং
অন্তঃস্থিতঃ যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥'

—আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে পরাগতি কামনা করি না, অষ্টর্দ্ধিযুক্ত পুনর্জন্ম না হওয়াও চাইনা, আমি অখিল দেহভাকদিগের আর্তির প্রপন্ন, তারা যেন অদুঃখ হয়।

এই রকম যারা সকলের সুখদুঃখের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেলেন, নিজেকে রাখতে পারলেন, তাদেরই প্রাণের দেবতা গো-গোপগোপীবৃত রাখাল-রাজ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সব-গোয়ালাগোপীদের দ্বারা আবৃত—তিনি কখনও একলা নন। প্রথম জীবনে তিনি তথাকথিত লিখিতগ্রন্থানুযায়ী বর্ণাশ্রমী সমাজ-

ব্যবস্থার দ্বারা পরিত সেই চরলা পরলানীর মধ্যে কাটিয়েছেন, পরের জীবনে যখন রাজরাজড়ার ব্যাপারের মধ্যে হয়েছেন, তখনও দেখা গেছে রাজসূয় যজ্ঞে সকলের পা ধোয়ানোর কাজটাকেই পছন্দ করে নিয়েছেন। সবচেয়ে ছোট কাজটাকেই নেবার মত মানসিকতা ছিল বলে, মানুষের সেবা করার মত মনকে সারা জীবন চর্চা করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সত্যিকারের বড়। তিনি ছোট ও ছোটর সাথে, সমাজের নিম্নস্তরের সাথে—যার মধ্যে মেয়েরাও পড়েন—মিলতে পারেন, ছোটের সুখদুঃখকে অবহেলা করে নিজেকে বড় করবার প্রয়াস তিনি করেন নি। তিনি যে সর্বসাধারণের, ছোটকে পতিতকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসে তাদের সাথে এক হয়ে ছিলেন, তাঁর জ্ঞান ঐশ্বর্য বা শক্তি নিয়ে ওপর থেকে তাদের দয়া করতে চান নি। মানুষ তাঁর কাছে মানুষ হিসেবে স্থান পেয়েছে—বড় ছোট হিসাবে নয়—প্রত্যেকেই তাঁর আপন। তাঁর কাছে 'কণ্ঠ কণ্ঠিত পূর্ণ, অধিক কণ্ঠিত পূর্ণ'। প্রতি খণ্ড কণ্ঠির মধ্যে যেমন একটা নিজস্ব অন্তর্নিহিত পূর্ণতা আছে, প্রতি মানুষের মধ্যেও মানুষ হিসাবে সেইরকম যে পূর্ণ মানুষটুকু—বুদ্ধির বিচারের ক্ষেত্রে বহু দিকে যত অযোগ্যতাই তার থাক না কেন—সেই মানুষটুকুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের যোগ—তাই তিনি সবার আপন জন, হৃদয়-বল্লভ। এই জন্যই হাজার হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাঁকে স্মরণ করার প্রয়াস বছরে বছরে তাঁর আবির্ভাবের দিনটীকে মানব করে আসছে। হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সময়ের লোকেরাও ভালবেসেই মনে রাখতে চেয়েছিল, আজও কালের বিপুল প্রান্ত পেরিয়ে তাঁকে ভালবাসে বলেই মনে করতে চায়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে প্রকৃতির দুর্যোগপূর্ণ একটি মুহূর্তে তাঁর জন্ম—যে দুর্যোগ ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের আবেষ্টনেও। তাঁর সমস্ত জীবন এই দুর্যোগকে একটা নূতন জীবন-দর্শন দিয়ে গড়ে তোলার জীবন।

এই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে একটা সামঞ্জস্যতা আছে—কোন ঐকদেশিক চিন্তা বা কোন এক পক্ষ নিয়ে তাঁর জীবন নয়। বুদ্ধি দিয়ে দেখলে যেগুলি বিরুদ্ধ মনে হয়—মনে হবে এদের পক্ষে সহাবস্থান একেবারেই সম্ভব নয়—কিন্তু জীবনের মধ্যে—বিশেষ করে কৃষ্ণ-জীবনের মধ্যে দেখা যাবে সেগুলি মিলে মিশে সুন্দরভাবে যার যার স্থান করে নিয়েছে, কোন পারস্পরিক বিরোধ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ—এক জনেতে একই সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে তারা দিব্যি মিলে মিশে আছে। শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে কর্মী জ্ঞানী ভক্ত প্রেমিক—তিনি কোন এক রকম নন। আমরা মুখস্থ করেছি—নরনারী, ধনিক শ্রমিক, রাজা প্রজা সব চূড়ান্ত বিরুদ্ধ এরা রাজা রাজাই, প্রজা প্রজাই, শ্রমিক শুধুই শ্রমিক, ধনিকও ধনিকই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-মতে নিশ্চিষ্ট মার্কামারা বলে কোন বস্তু নেই। অজ্ঞ জনের কাছে আয়সেনিক বিষ বলে মার্কামারা হয়ে রয়েছে—যেহেতু সে তার ব্যবহার জানে না। বিজ্ঞানী ঐ আয়সেনিক দিয়ে ওষুধ তৈরী করছেন যা মানুষকে বাঁচায়। শুধু মনুষ্য, শুধু নারীত্ব, শুধু প্রজার, শুধু রাজার বলে কিছু নেই—আছে মানুষ। এই সব মানুষ মিলে—তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গরাজ্য তৈরী করতে হবে যে স্বর্গে 'The Ruler and the Ruled will be ruled by the same rule'। রাজা যেখানে মানিতে নেমে এসে প্রজাকে তার সম স্তরে তুলে নিতে পারে সেখানেই

সে সত্যিকারের রাজা এবং তখনই তার রাজত্ব টিকবে অর্থাৎ যে রাজা প্রজার স্তরে নেমে আসতে পারে সে তথাকথিত রাজাই আর রইল না রাজা প্রজা মিলে সমগ্র সমাজ সৃষ্টি করতে হবে। এই রকম পণ্ডিত যখন তার পাণ্ডিত্যে অধিগত বিদ্যাকে হাতিয়ার না করে পাণ্ডিত্য অপণ্ডিতের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে অপণ্ডিতকে পণ্ডিত করে তুলতে সচেষ্ট প্রয়াস চালিয়ে যাবে— সেইখানে তার পাণ্ডিত্য সার্থক এবং কল্যাণকারী শ্রীকৃষ্ণ-জীবন জুড়ে এই কথা। এই চিন্তাধারার ও তাকে রূপ দেবার প্রক্রিয়ে প্রয়াসেই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে শোষণ স্তব্ধ হয়ে যায়। জড় জীবনের সর্বস্তরে ও তদুর্ধ্ব চৈতন্যের ক্ষেত্রেও শোষণহীন সমাজ-সৃষ্টিই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের পরম প্রয়োজন। শোষণহীন ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেমের সমন্বয়ে কি রকম মধুর ও মহান হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ-জীবন তারই দৃষ্টান্ত। ব্যক্তি বা সমাজ-জীবন যেখানে ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে ভালবাসার থাকবে পারস্পরিকতা, থাকবে সেবা-বুদ্ধি— যা অহংকেন্দ্রিক কামুকতা নয়, যে সমাজ-জীবন যান্ত্রিক নয়, তেমন শোষণহীন, সুন্দর পারস্পরিকতায় প্রাণোচ্ছল ব্যক্তি-সমাজ জীবন গঠনের দৃষ্টান্ত রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে। তাই আজকের দিনে তাঁর প্রয়োজন সকলের হয়ে কি করে নিজের হওয়া যায় এ কথা আজ শেখার দরকার হয়ে পড়েছে বলেই শ্রীকৃষ্ণকে জাতীয় জীবনে আজ চরম প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের কর্মত্যাগী চিন্তাধারা কর্মকে বন্ধন বলেছে, কর্ম করাকে দুঃখের বেগার খাটা মনে করতে শিখিয়েছে —তাই এ দেশের লোক কাজ করতে পছন্দ করে না, কাজ করতে হয় পার— বসে শুয়ে কাটাতে পারলে আনন্দ পায়। কিন্তু সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে আনন্দ পাওয়ার কোন প্রবণতা দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন এর বিপরীত। যেখানে এ দেশের মানুষ দুর্যোগ এড়িয়ে, কর্ম বা সৃষ্টির বেদনা এড়িয়ে আরামে থাকতে প্রয়াসী, সেখানে কিন্তু তারই দেশের শ্রীকৃষ্ণ-জীবন প্রথম থেকেই এর বিপরীত। দুর্যোগের পরিত্রাতা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দুর্যোগে, সারা জীবন কেটেছে অগণিত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যা মোটেই আরামের ছিল না। বাল্যকালেই তিনি বহু অসুর অসুরী বধ করেছেন। এই শুদ্ধি এবং কালীয় নাগকে যেভাবে দীর্ঘক্রম খেলায় পরাভূত করে তিনি কালিন্দীর জলকে নিরাপদ করে দেন, তাতে সেই অল্প বয়স থেকেই সামাজিক কল্যাণের, পরিবেশ শুদ্ধির তাঁর সচেতন সহানুভূতিপরিচয় পাওয়া যায়। কংসের অত্যাচার থেকে সর্বসাধারণকে রক্ষা করতে যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করলেন, তখন কংসের পিতাসহ বহুজনের অনুরোধেও মথুরার সিংহাসনে তিনি আরোহণ করেন নি। বলেছিলেন, 'আমার রাজ্যে প্রয়োজন বা নৃপাসনে আকাঙ্ক্ষা নেই'।

বৃন্দাবনে যে মানুষটি গো-গোপ-গয়লানীর মত সমাজের নিম্নতম স্তরের সঙ্গে প্রাণভরে মিশে আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন প্রত্যেককে মর্যাদা আর স্বীকৃতি, সেই শ্রীকৃষ্ণকে অসাধ্য সাধন করিতে হইয়াছে। কখনও বা স্বজনরক্ষার্থ, তখনও দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে মুনি ঋষি বা জনগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন এবং অনেক দুরাত্মার বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কংস, জরাসন্ধ, পঞ্চজন দৈত্য, কালযবন, শিশুপাল, পৃগাল, বাণাসুর, হংসডিম্বক,

—বকাসুর, বিকুণ্ঠ, পেণ্ড্রক প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত বীরগণ কৃষ্ণের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছেন। পরন্তু ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও যুদ্ধ করেন নাই। প্রত্যুত শত্রু-কর্তৃক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতেই সতত চেষ্টা পাইতেন।'

এই বহু ঘটনাসমৃদ্ধ বহু ক্ষেত্রবিহারী, সব ছোটর মধ্যেও সকলের স্বাতন্ত্র্য দানকারী শ্রীকৃষ্ণ-জীবন গভীর ও ব্যাপক ভাবে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবন একটি বাস্তব জীবন না দুর্বোধ্য অবোধ্য বহু ঘটনা সন্নিবেশে হয়ে অদ্ভুতপুর হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজগতের চিন্তাধারা বিভিন্ন চলের সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মা, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-পুরুষোত্তম বলে স্বীকার করেছেন। আগেই বলেছি তাঁর জীবন-তত্ত্ব ব্যক্তি ও সমাজকে শোষণ-হীন করবার পথের দিশারী। তিনি বৃন্দাবনে শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার একটা চিত্র স্থাপন করেছেন। বিশ্বের সকল দেশেই নারী অসহায়, পতিতের সমভাগী ছিল— a necessary evil—নরকের দ্বার, দিনকা রাতিনী রাতকা বাঘিনী ইত্যাদি। তার নিজস্ব কোন স্বাধীন চিন্তা বা চলা ছিল না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের আহ্বান করে বললেন, তোমাদেরও স্বাধীন সত্তা আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে, তোমরাও ভগবান লাভের অধিকারী। স্ত্রীকে স্বামীকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, জীবনে সামনের দিকের পথ চিরতরে ঐখানেই বন্ধ হয়ে যাবে তা হতে পারে না। পুরুষোত্তমকে জীবন দিয়ে বরণ করে নেবার অধিকার নারীর আছে, স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেমই সভ্যিকারের প্রেম—প্রভু-দাসীর সম্পর্ক যেখানে সেখানে সত্যিকারের প্রেম হতে পারে না—শ্রীকৃষ্ণ গোপেদের এই কথাগুলি শিখিয়ে তাদের সংসারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সংসার করবার মানসিকতা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই ব্রজ-লীলা সম্পর্কে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত লিখছেন ১০ম বর্ষ উদ্বোধনে তাঁর 'ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে রাসক্রীড়া' প্রবন্ধে, "স্বাধীনে স্বাধীনে প্রেমের নামই স্বকীয় প্রেম। ...স্বকীয় প্রেমে পুরুষ প্রকৃতিকে 'স্ব' বলিয়া, সম্পত্তি বলিয়া মনে করে, পুরুষ-নিরপেক্ষ প্রকৃতির কোন নিজস্ব মূল্য এখানে নাই। পুরুষের মানে (measure) প্রকৃতির মান।...এই 'স্ব' হইয়া গেলেই তাহাকে মানুষ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চায়। শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্যন্ত ইহা চলিয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উহার পরিবর্তন সাধন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হিসাবে দ্রৌপদীকে 'পণ' রাখার যুধিষ্ঠিরের কোন অধিকার ছিল না। সীতাকে না জানাইয়া, তাঁহার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া শ্রীরাম তাঁহাকে বনবাস দিয়াছিলেন, বারবার (একবার পুত্রদের সামনেও) অগ্নিপরীক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন। এই পুরুষ-কৌলীণ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া শ্রীসীতা যেখানে পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইখানে পৃথিবী ভেদ করিয়া শ্রীরাধা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।... যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া দ্রৌপদীর 'অপমান' করিয়া ছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তাহারই প্রতিশ্রুতি। 'নি স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—এই বাক্য অনুযায়ী সেদিন সমাজ-ব্যবস্থা গড়া ছিল। পুরুষের মানে প্রকৃতির মান, কিন্তু প্রকৃতির মানে তো পুরুষের মান নয়। ইহাতে প্রকৃতি যে মিথ্যা হয়, তাহা দার্শনিকভাবেও সত্য, সামাজিকভাবেও সত্য। প্রকৃতি মিথ্যা হইলে পুরুষও শূন্য। যেখানে দুইয়ের মানেই দুইয়ের মান, সেইখানেই তো বিশ্ব সত্য, বিশ্বনাথ সত্য।...

শ্রীরাধা-জীবন হইতেছে এইরূপ দার্শনিক-সামাজিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ। শ্রীরাধা বিপ্লবময়ী।"

নারীর মর্যাদাদাতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে যে রাস নৃত্যের সংঘটন করেছিলেন তাতে তখনকার লোক-চিত্র যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি এর পেছনে এক গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রতি অংশ নিয়ে এবং নিয়ে প্রতি অংশগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠবর্ধন করে সমগ্রকে আস্বাদন করতে পারে। এই সমগ্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অংশে রয়েছেন আবার কেন্দ্রে রয়েছেন। এই রাসতত্ত্ব মানুষী সত্তাতার এক অপূর্ব sublimation—ভাগবতীকৃত রূপ, উদ্বর্তন কাম নিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে সমস্যার অন্ত নাই। রাসলীলান্তর্গত এই কাম-প্রসঙ্গ সম্পর্কে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখছেন, "... সমগ্র মনে কামের কোন স্থান নাই। ব্রজ-প্রেমই 'সমগ্র'। কাম চিরদিনই অসমগ্রদর্শী ....সমগ্র মনের আস্বাদন পাইলে ই অংশের মনোজ্ঞ কাম সমগ্রের স্পর্শে প্রেমরূপে পরিণত হয়। ই অংশের আছই হৃদ্‌রোগ। কাম যে নিজে divine। এই divine কাম যখন অংশ ও সমগ্রে বিধাবিভক্ত হয়, যখন স্বার্থপরার্থভেদ পাকাপোক্ত হয়, তখনই কামের উদ্ভব। 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম'। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি যখন বিশ্বেন্দ্রিয়-প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই তাহা প্রেম। যাহা সমগ্র-কৈন্দ্রিক তাহাই প্রেম, যাহা আত্মকৈন্দ্রিক তাহাই কাম। সমগ্রে সমষ্টিও আছে, ব্যষ্টিও আছে। ব্রজ-প্রেমে স্বার্থ পরার্থ সমন্বিত। সমগ্র প্রেমে প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে। নাই শুধু একে দাবাইয়া অপরের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। রাসচক্রে প্রত্যেক গোপী কেবল, স্বতন্ত্র, কৃষ্ণকৈন্দ্রিক; তাই তাহারা অন্যোন্যবদ্ধবাহু। বিশ্বের বুকে এই সমগ্র সুরের খোঁজ, বিশ্ব-সঙ্ঘ রচনার খোঁজ দেওয়াও রাস-লীলার প্রয়োজন। কামই যদি তাহাদের মধ্যে থাকিত, একান্ত স্থূল দেহ, স্থূল রূপ স্থূল যৌবন লইয়াই যদি তাঁহারা আসিতেন, তবে লক্ষ লক্ষ ব্রজ-গোপী অন্যোন্যবদ্ধবাহু হইয়া কৃষ্ণকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে পারিতেন না। এত বড় প্রকৃতি-সাহচর্যের আদর্শস্থাপন কি কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারেন?....."

এইভাবে deductive ও inductive উভয় দৃষ্টিকোণদ্বারা উদ্ভূত ঘটনাবলী সমাবেশে সমগ্র হয়ে উঠে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও তত্ত্ব অনন্য ও কালজয়ী। আমাদের সীমিত পরিমিত একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা ঐ সমগ্রত্বের নাগাল পাই না বলেই এই অপূর্বত্ব অনেক সময়েই অনেকের চোখে প্রতিভাত হয় না। তিনি সুন্দর, তিনি রসরাজ, তিনি লোকধর্মী, তিনি হৃদয়বল্লভ, তিনি আপন জন—কেননা তিনি সমগ্র। তিনি কোন এক রকমের আপন জন নন, তিনি সকলের—তাই তিনি সুন্দর। তিনি নীচু সুরের সব সহস্পন্দবিরোধী মতবাদের ও পথেরও আপনজন। পরস্পরবিরুদ্ধগুলি পরিপাক প্রাপ্ত হয়ে যায় লোকধর্মী জীবনের মধ্যে। জীবনের মধ্য থেকেই তো সব দৃষ্টিভঙ্গিগুলি উদ্ভূত হয়েছিল—তাই লোকধর্মের সহায়ক যাতে তারা হয়ে না ওঠে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যাপক গভীর জীবন-রসধারা তাদের পরিপাক করে নেওয়া যে সম্ভব—তাই শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি অফুরাণ—অনেক ব্যাপক মানদণ্ডের বিচারেই তিনি অফুরাণ—তাই সেই ব্যাপক গভীর মানদণ্ডেই তিনি সুন্দর। তাঁর

জীবনকে অনুধাবন করলে প্রকৃতির বিচিত্রতাকে পরিপাক করবার শক্তি লাভ করা যাবে—তত যে তাঁর জীবনে ঘটনা ছিল তার হিসেব নেওয়াও দুরূহ। তাঁকে প্রণাম করি, তাঁকে নিজের সবটুকু দিয়ে তিনি হয়ে যাই, সেই তিনি হয়ে যাওয়া আমার সত্তা দিয়ে তাঁর জীবন-ধর্ম যে শোষণ-ধর্ম সেই শোষণ-তরাজুযায়ী মানুষের ব্যষ্টি সমষ্টি জীবন গড়ে তুলি—এইটাই মানুষের সাধনা। জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে শোষণকে—ব্যষ্টি ও সমষ্টি শোষণকে দূরীভূত করাই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের প্রয়োজন। প্রত্যেকের আধার সমান নয়—প্রত্যেককে তার তার মতো করেই তিনি সার্থক করেন, যাতে সে শোষিত না হয় তাই করেন। তিনি প্রত্যেককে ভজনা করেন, অপরেও তাঁর ভজনা করেন—এই পারস্পরিক ভজনার শোষণ নাই। অপরকে দাবিয়ে দেওয়া শ্রীকৃষ্ণ-জীবনদর্শনে নেই—আছে প্রত্যেককে তার তার মতো করে সার্থক হতে দেওয়া, করে তোলা। তাই তাঁকে নমস্কার, সেই অপরূপ সুন্দরকে, সেই অনুরাগকে নমস্কার। বিশ্বের সর্বত্র সব কিছু এই সুন্দরের, এই শোষণহীনতার ব্যাপক গভীর রসের অনুরণনে সুন্দরের হয়ে উঠুক—শোষণমুক্তি সেই অনুরাগ সুন্দরের কাছে তাঁর এই জন্ম-ক্ষণে সেই প্রার্থনা করি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের একটি পত্রাংশ

'ঠাকুর (শ্রীশ্রীগোপাল) বলিয়াছেন, 'ভয় কি টেনে তুলব'। বিশ্বাস তো আমার,··· তিনি কি আমায় টানিয়া তুলিবেন না? নিশ্চয়ই তুলিবেন। জীবনভরা তো দেখিলাম—জীবন দুর্যোগ, শেষে সব পরিষ্কার। অপরা প্রকৃতি যখন পুরুষোত্তম-অভিমুখিনী হইয়া পুরুষোত্তমের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তখনই তিনি পরাপ্রকৃতি। শ্রীরাধাই পরা প্রকৃতি। তিনি অযাচিত করুণায় দুয়ারে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ছাড়িতে পারেন না···। আমারও চতুর্দিকে আবেশের ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।··· শুধুই বলিতেছি, 'স্বস্তি অস্তু নঃ'—গীতা। বিশ্বরূপের মাঝে প্রলয়ের সূচনা দেখিয়া ঋষিগণ 'স্বস্তি অস্তু নঃ' বলিয়া গীতার প্রণতঃ হইয়াছিলেন।··· রাসপূর্ণিমার দিন ঠাকুরের ভোগ হইয়াছিল। আলোচনাও হইয়াছিল। রসের দৃষ্টি সব ছোটর দিকে, সব পতিতের দিকে, সব নোংড়ার দিকে; সেই সব ওছাকে ভাবের ভিতর, মহিমার ভিতর দিয়া ভাগবত রূপ দেওয়াই রাসলীলার প্রয়োজন। তাই বুঝি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সব নোংড়া আনিয়া হাজির হইতেছে ভাগবতরূপ লাভ করিবার জন্য। বিজ্ঞানে কি নোংড়ামির স্থান আছে? সে কে

অবিজ্ঞানের ক্ষেত্র। শ্রুতি তো তাই বলিয়াছেন, 'স তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্বম্ অসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।··· সচ্চ অভবৎ ত্যচ্চ অভবৎ।··· বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানং চ' ইত্যাদি। বিজ্ঞান যাহার খোঁজ পায় নাই এমন অনেক তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটিয়াছে। অবশ্য পরবর্তী বৈজ্ঞানিক উন্নতির ভিতর সেই অবৈজ্ঞানিকও পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক হইবে তখনও আবার বিজ্ঞানের সীমানার বাহিরে অনেক অবৈজ্ঞানিক ঘটনা ঘটিতে থাকিবে। এইভাবে প্রকৃতির রহস্যক্ষেত্রকে কোনও দিনই বিজ্ঞানের মধ্যে, তাহের মধ্যে ধরিয়া আটকাইয়া রাখা যাইবে না। প্রকৃতিও যে নিত্য, অনন্ত। প্রকৃতির সব ঘটনার ভিতর—তা যতই মহান হউক, যতই নোংরা হউক—পুরুষোত্তমের দিব্য স্পর্শ তোমার লাভ হউক—ইহাই আমার পরম কাম্য।···

মায়াবাদের 'এক' শুকনো ; প্রকৃতির 'এক' নির্গুণ এক নয়। তবে নির্গুণ এক যখন জীবনে সিদ্ধ হয়, তখন তাহার ক্ষেত্র হয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব। বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইল তেমনই সত্ত্ব, যে সত্ত্ব পুরুষোত্তমাভিমুখী, যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃর পুরুষোত্তমাভিমুখী সত্ত্বের অনুকূল হইয়া বিরাজ করিতেছে। মীমাংসাটা তো প্রকৃতির ক্ষেত্রে হয়। মীমাংসার ক্ষেত্র হইতেছে সাত্ত্বিকের ক্ষেত্র। কিন্তু এই সত্ত্বের সঙ্গে রজ বা তমঃর ক্ষেত্র লইয়া কাড়াকাড়ি নাই। সত্ত্বের ক্ষেত্রে যখন মীমাংসা হয় তখন তাহা static, absolute-এর মতই বটে। কিন্তু static বা absolute আবার নূতন রূপ ধারণ করিয়া flexible হয়, তখন সত্ত্ব রজ ও তমঃর মাঝে আবার বিবাদ সুরু হয়। এই ভাবে অনন্ত কাল চলিবে। ইহার বিরাম নাই। ইহাই জীবনের দোলনীলা। এই দোলে যাওয়া'র মধ্য দিয়া জীবন আসা'তের পর আসাতে নিত্য নূতন হইয়া চলিয়াছে।··· দুর্যোগের সার্থকতা সুযোগের মধ্যে নয়, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। দুর্যোগের সার্থকতা দুর্যোগের এতটী ক্ষণকে সার্থকতা দান করা— ইহাই দুর্যোগের মধ্য সুযোগ। দুর্যোগের বাহিরে সুযোগ দেখিলে উহাও হয় মায়াবাদ। দুর্যোগকে পুরুষোত্তম ভাব-এ আস্বাদন করাই দুর্যোগের সুযোগত্ব এবং তাহাতেই বাহিরেও সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্যোগ প্রতিক্ষণের চিন্তা প্রণালীর মধ্য দিয়াই বাহিরের সুযোগে গড়িয়া উঠিবে। সুযোগ প্রথম থাকে দুর্যোগের বুকের মাঝে, শেষে উহা জমিয়া উঠে বাহিরের আপেক্ষিকগত সুযোগে। দুর্যোগ হইতেছে জীবনের গতি, সুযোগে তাহার স্থিতি। একান্ত সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হইলেও আবার মায়াবাদ আসিয়া পড়িবে। সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইতে আবার আপেক্ষিকগত দুর্যোগের খেলা আরম্ভ হয়। এইভাবে অনাদি অনন্তে চলিয়াছে।'' ভাগবত লিখিতেছেন, 'কেন্দ্রপ্যপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিযোজয়েৎ'—যে কোন উপায়ে মন কৃষ্ণে নিয়োগ করিবে। কৃষ্ণে মনোযোগ আনিতে হইলে মনের উপরে যাইতে হয়। মনের উপর না গেলে মনোযোগ হয় না। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে একটা অদ্বৈতভাব আসেই। এই অদ্বৈত-সন্ধির ভিতর দিয়া মানুষ ভালবাসিতে বাসিতে বা দ্বেষ করিতে করিতে বদলাইয়া যায়। 'গোপা কামাৎ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ঃ নৃপঃ। সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বিভো'—শ্রীমান নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, হে বিভো, গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়হেতু, চেদিরাজশোভৃতি দ্বেষবশতঃ, বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত

সহধর্মচারী, আপনারা ভ্রাতৃবর্গ এবং আমরা
আমেরিকাবাসি ভক্তবৃন্দ একত্র হইয়া তাঁহাকে
পূজা-অর্চনা যে কোন বৃত্তি-

কলাপোনার হইতে পারে।
যোগ নিশ্চয়ই আছে।...

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

মাটিতে তাঁহার পা, আকাশে তাঁহার মস্তক। দুই মিলিয়াই পূর্ণ সত্তা। ঠাকুর, শ্রীম, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তোমাকে কত ছোট করিয়া আঁকিয়াছেন। তুমি শ্রীম সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছ, 'কথামৃত সম্বন্ধে লিখার হইল'। বলা কি হইয়াই গেল? কেহ কি বলিবে না? তবে বলিবে? আমি তো নানা হরমে হাত পা বাঁধা। আমাকে শক্তি দেও, সুযোগ দেও, মুক্ত কর। তোমার বলিবার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিব। বেলুড় মঠ-টার পর বাহির হয় কেবে একটার পূর্বে। অজিত নিজেই দীক্ষার কথা বলিয়াছিল প্রথমে আমি স্বীকারও করি নাই। পরে ভাবিলাম, গুরু করিয়াই যখন ফাঁসাদ তখন মন্ত্র নেওয়া উচিত। তাই হাসপুকিয়া কিম্বা আমার জন্মদিনে দীক্ষার কথা বলি। সে ঐ ২ দিন আসে নাই। জন্মদিনে তাহাকে যাইতেও বলা হইয়াছিল। তাহার মায়ের কাছে ইহা বলায় তিনি আসিতে দেন নাই। আজ সকালে মনে হইয়াছিল এই ইচ্ছাকৃত দীক্ষা না নেওয়ার কথা। সাংসারিক দৃষ্টিতে ইহা কত বড় অবিচার আমার উপর! অজিত কেন আমার কাছে এ কথা এতদিন গোপন করিল। আমার তো মোটেই কিছু মনে হয় নাই। সন্ধ্যার পর গুরুভ্রাতা কৃষ্ণ পণ্ডিতের পুত্র প্রণব আসে। তাহার গুরু বলিয়া দিয়াছেন এক-মাস হৈরুক সাধনা করার পর অবধূত সম্প্রদায়ে প্রবেশের কথা। সে সব দিক বিচার করিয়া আমার কাছেই শেষ মন্ত্র নিবার জন্য আসিয়াছে। সে দূরে বসিয়াই এতদিন আমায় ভালবাসিত। সংসার -সন্ন্যাস সমন্বয়ের কথা তাহার খুব ভাল লাগে। শনিবার ৪টায় কৃষ্ণ-কালী আশ্রমে বসিবার জন্য গৌর-নিতাগোপাল প্রতিষ্ঠার জন্য আসাকে যাইতে হইবে। ৬ টাকা দিয়া উদ্বোধনের গ্রাহক হইল। ছেলেটী বিচারবান। ১৫ই ডিসেম্বর

প্রথমবারের যাওয়া অদ্বৈতের আনন্দ, আত্মারামের আনন্দ। দ্বিতীয়টীতে দ্বৈতের বুকে অদ্বৈতের আনন্দ, পারস্পরিক দেহ-প্রাণ-বস্তুর interchange -এর ভিতর দিয়া অদ্বৈতের আস্বাদন, আত্মারামের আনন্দ। 'তাঁহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল, তারে মোর মত করি সে মোর মত হল।' এই মাল্যবদলের মধ্য দিয়া ভক্তের প্রাণ ভগবানের হয়, ভগবানের দেহ-প্রাণ ভক্তের হয়।

দুই ই নিদেহী অথচ দেহবান। ক'হারও নিজের দেহ মন বুদ্ধি নাই। সিদ্ধি এখানে পরিপূর্ণ ভাবে বিরাজমান। এই দেহ প্রাণ মনই পারমার্থিক, লীলাদেহ। এইখানেই লীলা-কৈবল্য। ঠাকুর, ঠাকুর, তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি আমার, আমি তোমার। 'নমস্তুভ্যং নমো মহ্যম্ তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ'। সকালে অতুলবাবু আসেন। অজিত আজ সকালে বৈকালে আসে নাই। সন্ধ্যায় আসে, তাহার ভাই-পোকে পড়াইবে, ১০০ টাকা পাইবে; অতএব তাহাকে আজই চাকুরীর সন্ধান করিতে হইবে। তাই সে চাকুরীর খোঁজ করিতেছে। আমি তাহার প্রতীক্ষায় অশান্তি ভোগ করিতেছি। প্রাণ নাই, বুদ্ধি তো নাই-ই। তাহার কথার আচার মা বুঝিয়াছে যে, আমি অজিতের একজন অভিভাবক হইতেছি। ইহা তাহারা বরদাস্ত করিবে কেন? আগামী কাল ১০ টাকা দিবার কথা বলিয়াছি দেখি যদি ধীরে ধীরে সুস্থ করা যায়। প্রণব আসে ৮৫০ টার পর। কাল বিদায় জন্য ১টার পূর্বে আসিবে, বিভাগোপালের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমি বিভাগোপালের বিবেক নন্দ, একদিন মহানির্বাণ মঠের কর্তৃপক্ষ আমাকে নামিয়া ট্রাস্টী করিবে—ইত্যাদি সে তাহার বাবার নিকট বলিয়াছে। ক্ষিতীন রায় এক চিঠিতে অপ্রকাশচন্দ্রের 'ভারতীয় সংবিধানে নারীর স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধের বহু বহু মাসিক বা দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ প্রচার প্রয়োজন বলিয়া লিখিয়াছে, যতীন দাসগুপ্ত তাহা লিখিয়াছে। দুর্গামোহনবাবুও প্রশংসা করিয়াছে। ১৬ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, কৃষ্ণানন্দ বিজয়ার্থীতে কাজ করিতেন, তোমারই আশ্রিত), আজও কত লোক। গতকাল প্রণব বলিল যে, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন রামকৃষ্ণের, পুরুষোত্তমানন্দ তেমনি বিভাগোপালের। সত্যই কি তোমাকে বহন করিয়া বিশ্বময়বাসে পৌঁছাইবার মত অধিকার ও যোগ্যতা হইবে? বিশ্বগ্রাসী একটা প্রেরণা ও বেদনা বুকের ভিতর টের পাই, কিন্তু যেন পথ পাইতেছি না। তুমি কি চুপ করিয়া, লেপ মুড়ি দিয়াই থাকিবে? তোমার এই সর্বাত্মস্বরূপ, সর্বসমন্বয়কারী দর্শন কি এমনই পড়িয়া থাকিবে? আমিই কি তোমার দর্শনকে এত বড় করিয়া দেখিতেছি, অথচ তাহা এত বড় নয়? তোমার দর্শন যে এত বড়, তাহা তোমার প্রতি আমার অন্ধ বিশ্বাস বা মোহবশতঃ কি? আমি তো চুলচেরা বিচার করিয়াই দেখিতেছি। তোমার দর্শন unique, তোমার জীবন unique। আমি তোমাকে লইয়া এমন অসাধ্যের মত যে আর পড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না ঠাকুর! তোমাকে লইয়াই তো আমার বিপদ, আমার দায়। আমাকে দায়মুক্ত কর। অজিত সকালে আসে। ১টার পূর্বে কলেজ যাইবার জন্য আসিতে বলিয়াছিলাম। ১টাতে আসিল না। আমি উদ্যোগী প্রতিভা যেন চোখা এইটুকু হাটিয়া গিয়া মোড় হইতে ট্যাক্সীতে প্রণবসহ কলেজ যাই।... আমি ঠাকুরের প্রতিকৃতি বেদীতে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ও বুক চাপিয়া ধরিয়া বসাইয়া দেই।—মন্ত্র জপ করি। বেশ লোক হইয়া গিয়াছিল—স্ত্রী পুরুষ। স্নানের অসুবিধা জন্য অনেক লোক ফিরিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের অবতরণের প্রয়োজনীয়তা বলি, 'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি', জড়াজড় সমন্বয়ের উপযোগিতা ও তাৎপর্য, আমার বাবার কথা—সারারাত নাম জপ করি; 'বহু দিন শ্রবণে শুনেছি ও নাম'—ঠাকুরের দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ সব কিছু নূতন। 'মন্নানাং অশরিঃ'।

প্রণব পূর্ব অবস্থা হইতে শূন্যের ভিতর দিয়া অবধূত আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে, তাই প্রয়োজন এই শূন্যের ভিতর আশ্রমকে ও নিত্যগোপালকে রহিবে। এক স্বর ও পরবর্তী স্বরের মাঝে নিছক শূন্য। এই শূন্য পার হইবার জন্য চাই কোনও বাস্তব মানুষের সহানুভূতি। হৃষ্টা আলোচনা হয়। সকল সমস্যার সমাধানে যে নিত্যগোপাল তাহা জোর বলি। সকল নিরাশাকে নিত্যগোপালের সেবা করিতে বলিয়া আসিলাম। প্রচুর প্রসাদ— সেরাপা, ছানাপাজি, কমলা, সন্দেশ ইত্যাদি।··· জীবনে এক নতুন অধ্যায় সুরু হইল। মনোহরণ গুপ্ত ও নিরঞ্জন ঘোষ আসে ৮টার পর রাত্রিতে।···১৭ই ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি আবার প্রণবকে আমার জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিলে। সে আমার ও তোমার কি সেবা করিবে তুমি জান। সে কোন সমস্যা নিয়া আসে নাই। অজিত কুমার প্রভৃতি সবাই তো আদিক সমস্যার ভিতর আমাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। প্রণবের ব্যক্তিত্ব আছে, সে কলেজের popular, বিচারবান, হৃদয়বও আছে। সে বলে, যাহা আমি বলি সেখান হইতে নিড়াইয়া যাই না। শক্তিমান, কর্মীও বটে। বক্তৃতা দিতেও পারিবে। সুভাষবাবুর দলের। আমার সেবার দিকে তাহার দৃষ্টি আছে। কালিকার যাতায়াত খরচ তো সে খোলা প্রাণেই দিয়াছে। কল মিষ্টির ব্যবস্থাও সে করিতেছে। আড়ম্বর নাই, সহজ সরল জীবন। ঠাকুর পূজার আচার বাতুলতা তো নাই, বরং আর একটু থাকিলে ভালই হয়। আমার দর্শনের সঙ্গে সে কিছু দিন হইতেই পরিচিত। সে মঠে আমার ট্রাস্টী না হওয়ার খবর রাখে। কলকাতা অন্য কোন আশ্রম নাই ঠাকুর, তুমি এই স্থানটীতে একটু আঁকিয়া বস আমার জীবনের আকৃতি, হটকারিতা কি এমনিই ব্যর্থ হইবে? তোমায় বাহন করিয়া তোমাকে বহিয়া বেড়াইব, তোমার জীবন ও দর্শন সর্বত্র ছড়াইব— ইহাই তো সারা জীবনের কামনা। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। হেদুয়ার মঠে স্কুল আনিবার পথে শ্যামসুন্দরানন্দের শিষ্য হরিপদ বসুর সঙ্গে পথে অনেক কথা হয়। জ্যোতিষচন্দ্র বাবু হেদুকে গুরুত্যাগী ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইহারা এইরূপ কুৎসা করিয়াই বেড়ায়। হরিপদকে 'সদ্গুরু মূর্তি নিত্যগোপাল' এই তাহিনীবাবু দিতে গেলে জ্যোতিষচন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন, 'ইহা পড়িলে misguided হইবে'। অথচ ঐ একটুকু ছোট বই-ই এই সম্প্রদায় হইতে শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে বাহির হইয়াছে। অন্ধগুলি বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে চলিবে না। অজিত পাঠের মধ্যে আসে। সেও দাবী সুরু করিয়াছে। কেন আমি আগে জিজ্ঞাসা করি না তাহার কোন কিছু সম্বন্ধে। একতরফা ভালবাসিতে গেলে মানুষ এমনি পাইয়া বসিতে চায়। তাই ঐশ্বর্যের সাধনাও করাইতে হয়। আজিকার পাঠের মধ্যে এই আলোচনা হয় প্রেম-প্রেমাভক্তি-ভক্তি এই তিন স্তর ট্রেনিং দরকার। নিত্যস্বরূপানন্দ স্বামীর বক্তৃতার উপর এই আলোচনা হয়। হৃটার পাঠ আরম্ভ হয়। বিমলা আসে, পুরী কচুরী আনে। ভিনু আসে···। অজিত হৃটাকা আনিয়াছে একজন গ্রাহকের বাবদ। রাজেন বিষ্ণুপদ আসে। বিষ্ণুপদ নিজে ৫টাকা পরিবর্তনার জন্য দিয়াছে। হরিপদ পাঠের শেষে আসে। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আলোচনা হয়। হৃটা হইতে ৯টা অনর্গল কথা

বলা হয়। রাত্রি ১টায় প্রস্রাব করি, আর ৪।৫টায়। তিনু চাউল ও একটা মানকচু আনে। প্রাতঃস্নিগ্ধ সঙ্গীত গাহিয়াই সে চলিয়া যায়। নীলরতনবাবু ও সেবারঞ্জ আসে। অনন্ত দত্ত আসে। ইন্দুলেখা আসে, চিঠি আসে। ১৮ই ডিসেম্বর

'প্রেমে তত্ত্বা আত্মরত: আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' অবস্থার পরও তো 'দর্শনেন কামিনাং চৈত্য স্ত্রীণাং দুরাত্মতাম্' রাধারাণীর মনে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি আসে, এবং সেইজন্য মহাপ্রস্থানিকের কাঁধে উঠিবার কথা মনে উঠে। তাই প্রেম হইলেও প্রেমাভক্তি বা ভক্তির স্তরের সাধনাগুলি সব করিতে হয় বা করাইতে হয়। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় অর্থাৎ অহঙ্কারের স্তর হইতে সাধনার যে স্তরগুলি ক্রমে ক্রমে ইহা প্রেমে পৌঁছিতে হয়, তাসবত ধর্মে প্রথমে মনবুদ্ধি লয়, অহং লয় ও প্রেম হইতে সাধনার আরম্ভ হইলেও ঐ স্তরগুলির আস্বাদন অবশ্যই করিতে হয়। এমন কি রাধারাণীদেরও করিতে হইয়াছিল। প্রকৃতির পট পরিবর্তন যে অনন্ত। কোনও বিশেষ এক ধারায় চলা যে প্রকৃতির স্বভাব নয়। সে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া চলিবেই। এটা যে রিমানের দেশ, আইন্টাইনের curved space, নিউটনের straight space নয়। এ দেশে বাঁকা পথে চলাই সহজ পথ, সোজা পথ। Short cut করিতে গেলে তাহাই বাঁকাইয়া যায়, আর সাপও বাঁকাইতে গিয়া জড়াইয়া পড়ে, অন্তরায় দেখে। রহিম ক্ষেত্রে সোজা চলিবার নীতিই ব্রহ্মে রাসচক্রে নিখিতে হয়। প্রেম-প্রেমাভক্তি-ভক্তি এই তিনটী ভঙ্গিতে চলিবার যোগাড়া শ্রীনিতাগোপালের পরম প্রেমে লাভ হয়। মাধুর্য-মাধুর্যমিশ্র ঐশ্বর্য -ঐশ্বর্যের পরপর এবং ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তখনই পরম প্রেমের ভজন। শ্রীনিতাগোপাল অন্তর্যুক্ত হউন। অজিত সকালে আসিয়া আলিপুর যাইবে বলিয়া চলিয়া যায়। আর সারাদিন আসে না। আমারও বসিয়া বসিয়া কথা বলিবার মত মন হইল না। বেণু ১১টার পূর্বে যায়ও, প্রিয়নাথ হইয়া দক্ষিণেশ্বর চলিয়া যায়।....সন্ধ্যার কেত্রে....বসিয়া বসিয়া ভাবি, আমি কেন 'মানুষ' চাই। কোনও অভিসন্ধি তো টের পাই না। তবে মানুষ আসিবে, ঠাকুরের কাজ করিবে, নিজেরা ধন্য হইবে ও সমাজ গড়িবে— ইহা চাই বটে। এমন কোনও মানুষই তো আসে নাই যাহার সমস্যা মাথায় না নিয়াছি। আমার নিতাগোপাল-দার হইতে মুক্ত করিতে কয় জন আসিল? ১৯শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমার স্পর্শ লাভ করিবার পর মানুষকে মানুষের সমান দিতে পারিয়াছি। আমতার ঐ দিকে একবার পালকিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যতক্ষণ পালকিতে ছিলাম শুধু এই ভাবনাই হইতেছিল—পালকির ভিতর যে আছে তাহার স্থলে তুমি থাক ঠাকুর। তোমাকে কাঁধে বহিলে মানুষের কাঁধের অসম্মান হইবে না। আমার কি অধিকার আছে মানুষের কাঁধে উঠিবার? তবে ছেলে যেমন বাপের কাঁধে ওঠে তেমনি ইহাদের কাঁধে উঠিতে পারি যদি পালকি বাহকদের পিতৃ সদৃশ মনে করি। কাঁথিতে যখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য পালকির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া tour করিতে ছিলাম, তখন পালকি হইতে নামিয়া বাহকদের কোল দিতাম। পা ছুঁইতে গেলে ইহারা ১০ হাত দূরে লাফ দিয়া যাইত। ইহারা অবাক বনিত ও কত ভালবাসিত। প্রথমবার যখন জেলে যাই, জেলের শেষ ভাগে

ছিলাম আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমি। আমি ছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। আর তখন রাজনৈতিক বলিয়া কোন শ্রেণী-বিভাগ ছিল না। সকলের এক রকম খাদ্য ছিল। বাহির হইবার কয়েকদিন পূর্বে শ্রেণী-বিভাগ হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরা দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণীর খাদ্য নেন। আমি নিলাম না, সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে তাহাদের খাদ্য খাইতাম। অন্য cell-এ যাইবার সুবিধা থাকিলেও সকলের শুদ্ধা cell ঐ ম্যাজেষ্ট্রেট সেলেই ছিলাম। সেখানে থাকিত criminal-রা। ডেপুটি ডাক্তারদাদার অনুরোধে ভাল সেলে থাকার প্রস্তাব করিলেও বলিয়াছি—যেখানে ভাল সেল লইয়া বন্ধুদের মধ্যে হাতাহাতি দেখিয়াছি, সেখানে যে সেলে থাকিবার জন্য কেহ চাহে না, সেই cellই আমার পছন্দ। সকলের পিছনে থাকিয়াই আগে যাইব। কোথায় আগ, কোথায় পিছন? তুমিই আমার সর্বত্র। অজিত সারাদিন আসে নাই কুসুম, রামগোপাল প্রবোধ ভৌমিক প্রভৃতির কাছে পত্র দেওয়া হয়। 'রুশ-ভারত মৈত্রী'—সাময়িকী কারারুদ্ধ করি। ১০ শে ডিসেম্বর

জীবনে প্রায় ১৫ হাজার বক্তৃতা দিয়াছি, চক্ষের জলে বাংলার মাটি সিক্ত করিয়াছি, ১৫ জন লোকও তো পাইলাম না। পুরুষোত্তম-কৃষ্টির খবরই তো পৌঁছাইয়াছি। বক্তৃতায় কি কিছু হয় না? মানুষ কি আমার বেদনাতুর জীবনের দিকে আকৃষ্ট হইল না? মনে আছে একদিন নাটোরে বক্তৃতা দিতেছিলাম। ৺ দেবতী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নিকা দিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার লিখিত 'এ হৃদয়' গ্রন্থ আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতে 'রাধা রাধা' বলিয়া এমন ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলাম যে, সভাস্থ লোকজন বিচলিত হইয়া দেবতীবাবুকে সান্ত্বনা করিতে বলিলেন। দেবতীবাবু বলিয়াছিলেন, যাহার নাম নিতেছেন, তিনিই সুস্থ করিবেন'। মনে হয় এত কাঁদা কাঁদিয়াছি যে চোখের কোন পুত্র-শোকাতুরা জননী বা সদ্যঃ বিধবা কোনও নারী এত কাঁদে নাই। মনে পড়ে, 'নয়নের বারি পূর্ণ করে বাড়ি নারি নারি সব রাধা গিয়াছে' গোবিন্দের পা দুইয়া দিবার জন্য। এত চোখের জলেও কি বাঙালীর হৃদয় গলিল না? একদিন জিতেন কুশারীর দেশ বাহারকে দুপুর বেলায় কতগুলি মেয়েদের সভায় এমন করিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে ছিলাম যে, মেয়েরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। একটী বৃদ্ধা সমস্ত মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া আবেগ ভরে বলিলেন, ওরে হতভাগীর দল, ছেলে এই দুপুরে এমন কাঁদিতেছে, আর তোরা চুপ করিয়া শুনিতেছিস? ছেলে যা চায় তা দিবি বল না। চরকা কাটিবার কথা ছেলে বলিতেছে। তোরা স্বীকার কর। এ কান্না আর সহ্য হয় না। মেয়েরা সূতা কাটিতে রাজী হইয়া গেলেন। এমন কান্না কাঁদিতাম যেন কান্নার প্লাবন বহিয়া যাইত। ঠাকুর, সে তো তোমার অকৃত্রিম কান্না। দেখা দেও সজ্ঞানে—ব্যক্তিগত ভাবে তোমায় পাইয়াছি। অজিত ১০টার আসে, বৈকালেও আসে। বৈকালে লালবিহারী দত্ত (সংকর্ষণ) আসেন... বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠাই তাঁহার লক্ষ্য। কিন্তু উহা তো বর্তমানে হইবার নয়। বর্তমানে যে সব প্রতিলোম বিবাহের ঘটনা ঘটিতেছে। তাহার ব্যাখ্যা দিতে হইলে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের সমন্বয় হইতে পারে এমন একটী উচ্চতর

আইনের প্রয়োগ। ব্যতিক্রম বলিয়া আমাদের কাছে ঘটনার সত্য ব্যাখ্যা হয় না। নিউটনের আইনদ্বারা গ্র্যাভিট্রেশনের যে সব ঘটনার ব্যাখ্যা হয় না, আইনস্টাইন তাঁহার আইনদ্বারা সে সবের ব্যাখ্যা দিয়াই আজ বিশ্বজয়ী। বর্ণাশ্রম ও সহজিয়াকে একই উচ্চতর আইনদ্বারা ব্যাখ্যা নিত্যগোপাল-দর্শনে সম্ভবপর। বেণু জি দি মুখার্জীর ওখানে যায়। ওষুধ দেন। ২১শে ডিসেম্বর

জীবনকে deductively ও inductively, from universal to particular ও from particular to universal, সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে এবং ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে দেখিলেই সমগ্রভাবে দেখা হয়। 'এক' দুই রকমের—বহুকে বহু রাখিয়া এক 'এক', আর বহুকে abstract করিয়া 'এক'। এই দুই একের যে সমন্বয়, তাহাই 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্'। 'অদ্বিতীয়' শব্দের অর্থ তাই শ্রীনিত্যগোপাল 'দ্বিতীয়রহিত' করিয়াছেন। বহুর মাঝে, অনেকের মাঝে ঐক্যই ঐক্যবোধ। অনেক, নাই, ঐক্য আছে—ইহার কোন অর্থ হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, একের মাঝে ঐক্য নাই। অরবিন্দ পুরুষোত্তমের decent -এর কথা বলিয়াছেন এবং সাধকের ascent-এর। কিন্তু এই ascent কি সম্ভব হইবে যদি সে অনন্ত particular সাধকের বা ঘটনার সঙ্গে একায় হইয়া না চলে? সাধক ব্যষ্টিভাবে (সমষ্টির সম্পর্ক ছাড়িয়া প্রচলিত বৈরাগ্যের পথে, তমঃ হইতে তমে এবং রজ হইতেও সত্ত্বে, বিশ্বজনীন না হইয়া) ঊর্ধ্বগতিতে গেলে কি পুরুষোত্তমের অবতরণ ধারণ করিতে পারিবে? অনন্ত particular-এর সমন্বয় না হইলে universal-এর দেখা মিলিবে কি করিয়া? 'Man is mortal'-কে বুঝিতে হইলে 'Ram is man', 'Shyam is man' এই ভাবে অন্তত মানুষের mortality-র সঙ্গে পরিচিতও হইতে হইবে। এই দ্বিমুখী সমন্বয় করিতে হইলে চাই একটা বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ ও শরণাগতি। কেননা একান্ত universal ও একান্ত particular দুই-ই abstract bloodless category পুরুষের রূপ ধরেই, প্রাণের ঠাকুরই তা। উহারা বাস্তব ও সমন্বিত। সমগ্রের অবতরণকে ধরিতে হইলে সমগ্রের জন্যই সাধকের নিজেকে unfold করিতে হইবে। সমগ্রের জন্যই তো unfolding-এর মূল প্রয়োজন। সাধকের তো প্রথমে শক্তি 'folded' থাকে। Universal বা particular দুই-ই তো 'folded' অবস্থা। শরণাগতি দ্বিমুখী হইলে সাধক 'ভূমুখ' হয়, unfold করে। তখন ভগবানের সঙ্গে একত্ব আসে, 'সাধর্ম্যমাপন্নাঃ'। অভিজ্ঞের সঙ্গে সকালে Either-or-নিয়া hot আলোচনা হয় সে বলে যে ditto দিয়া আমি উহা মানিতে প্রস্তুত নই। গোড়ায় hypothesis-এই complementary ও antagonism একাত্মবোধে না মানিলে আলোচনা চলে না। এই বয়সে এত অসহায়তার মধ্যে রাত্রি ২টার প্রাক্‌কালে অভিজ্ঞের সঙ্গে এ আলোচনা শোভন বা সঙ্গত কিছুই নয়। বৈকালে আসে নাই। বেণু প্রিয়ব্রতকে ফোন করিয়া আসে। সন্ধ্যায় পল হরিপদ আসে। কিছু কথা হয়—কেন আমার মহানির্বাণ মঠের সঙ্গে আলোচনা ও কর্মের মধ্য দিয়া যুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তাহা নিয়া। নিত্যগোপালের দর্শন ও জীবন লইয়াই প্রকাণ্ড মত-পার্থক্য। ২২শে ডিসেম্বর

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের শ্রীকৃষ্ণ

—শ্রীসুনীতি সান্যাল

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে যে মানুষটী জন্মেছিলেন বিশ্বের আলো মাতাদের অন্তরালে, দুর্যোগময় রাত্রিতে অহং-সর্ব্বস্ব অত্যাচারী কংসের কারাগারে, সমগ্র ভারতবর্ষের তো বটেই, বিশ্বের মানুষেরও কাছে আজও তিনি হারিয়ে যাননি, শেষ হয়নি তাঁর অদ্ভুত লীলা রহস্যের অবসর-উদ্‌ঘাটন। সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লগ্নে তাঁকে হৃদয় দিয়ে স্মরণ করি, ধ্যান করি তাঁর লীলা-জীবনের।

আজও এই পরম মানুষটী আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাননি বটে কিন্তু যিনি "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই বাণী-মন্ত্র জীবন খানি নিয়ে সেদিন এসেছিলেন, তাঁর তাৎপর্য্য বা তত্ত্বরহস্য পর্য্যন্তও আমাদের কাছে ধরা পড়ল না। তাই জীবন্ত কৃষ্ণের পূজা আমরা আমাদের জীবন দিয়ে জীবনের সকল বৃত্তি দিয়ে করে কৃষ্ণময় জীবনের অধিকারী হতে পারছি না। তিনি এসেছিলেন ধর্ম্মের গ্লানি দূর করতে, এসেছিলেন সকল কালের সকল অনাচারের ভার হরণ করতে। ভাগবতে তাঁর উক্তি—"আত্মানেকাত্মশোচাম্যভবস্তৎকৃতানহং। দেবান ঋষিন্ পিতৃন্ সাধূন্ সর্ব্বান্ বর্ণান্ ভবাশ্রমান্।" বহনী ধর্ম্মের কাছে গেলেন প্রার্থনা করে—বললেন, হে ধর্ম্ম, তোমার জন্যও আমি অনুশোচনা করছি, অনুশোচনা করছি দেবতাকুল, পিতৃকুল, ঋষিকুল এবং সর্ব্ব বর্ণ সর্ব্ব আশ্রমের জন্যও; অর্থাৎ সে দিনের সমাজ-চিত্রে দেখা যায় প্রতি স্তরের মানুষ সত্য ধর্ম্ম, আত্ম ধর্ম্ম, অনাত্ম ধর্ম্ম এক কথায় মানুষ জীবনের প্রকৃত পথ থেকে সরে। তাই না ধরিত্রী মাতার এই কান্না।

তাই তিনি এলেন প্রকৃতির নন্দনরূপে যে বিশ্ব-প্রকৃতি ছিল আত্মার্থিত জগতের কাছে অস্পৃষ্টা, হেয়া, তিনি তার মান দান করলেন—'দেহি পদপল্লবম্'—বলে। বিশ্বনাথ হয়ে বিশ্ব-প্রকৃতির চরণে মাথা নত করলেন। ধরার ধূলিকে ব্রহ্মধূলির সম মান দিলেন। মাটীর মহিমা জীবজগতের কাছে প্রচার করলেন। তাই তো শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এবার এবজন কৃষ্ণানুরাগের সাধনার বস্তু হয়েছিলেন, উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর অবতরণের গূঢ় তাৎপর্য। তাই তো শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের শ্রীকৃষ্ণ শুধু মঠ মন্দিরেই পূজা নন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্ব-চরাচরে চিন্তায়, কর্ম্মে আচরণে, ভাষণে, লেখনে ছড়িয়ে রয়েছেন—এ না হলে বিশ্ব কল্যাণের কোন সম্ভাবনা সম্ভব নয়।

দীর্ঘ যুগ ধরে ভারতবর্ষ অখণ্ড ব্রহ্মের উপাসনায় জড়ীয় আস্বাদনের সমস্ত বৃত্তিকে সমস্ত বস্তুকে কর্তৃতন্ত্র বুদ্ধির নিষ্পেষণে পদদলিত করেছে। হৃদয়কে ঠেকেছিল সে দিন স্তব্ধ। একান্ত অজড় দর্শনের অত্যাচারের ইতিহাস ধরিত্রী মাতার বক্ষ হতে আজও মুছে যায়নি। অজড়বাদী ভারতবর্ষ তার সব কিছু সুখ শান্তি আনন্দ খুঁজেছিল আকাশে, গোলোকে, বৈকুণ্ঠে; কিন্তু হৃদয় তাতে জুড়ায় নি।

ডালের ঘাড়ে চেপে ঝড়ের বেগে অতীত পর্বতের দুর্গমের চারপাড়া বুদ্ধিগুলোকে মেরে করে ফেলল ছুঁচিক্ষ-পীড়িত ক্ষুধিতের মত। বাস্তবের ভোগ-সামগ্রী তার বুদ্ধিকে দিল তলিয়ে। কোন একান্ত দর্শনেই মিলল না তৃপ্তি, মিলল না শান্তি।

আজ পরম মানুষ এই শ্রীকৃষ্ণের জীবন অনুধ্যান করলে নিঃসন্দেহে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভারতবর্ষের এই গৌরবময় মাটীর বুকে তনু পরিগ্রহ করে কলিযুগের সর্ব্ব ভাবে উৎপ্রত মানুষের জন্য তিনি বিশেষ মন্ত্র রেখে গেছেন জড়-অজড়ের গ্লানির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে হলে জড়-অজড় সমন্বিত একমাত্র কৃষ্ণ-দর্শনের ছাঁচে বিশ্বকে নতুন করে গড়তে হবে এ কথা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর সকল ভাষ্যের মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে রেখে গেছেন। তিনি তাঁর 'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকায় লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র ধর্ম্মের কাটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটী স্বয়ংমূল্য আস্বাদন ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendental) দিক্, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (inmanent) দিক্। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুই-ই। তাই তো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ', ভোজপতি কংসের মৃত্যু বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতি রূপে 'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্', যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য। শ্রীকৃষ্ণই ভারতের রাষ্ট্রপতি, ধর্ম্মপতি; তাঁহার দর্শনের ছাঁচেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বিশ্ব ভারত, উজ্জ্বলভারত।"

তাই আজকের এই বিষয় যুগে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের উপলব্ধি নিয়ে জড়াজড় সমন্বিত এই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের খোঁজে আমরা সচেষ্ট না হলে কোন একান্ত মতবাদের দ্বারা মানব সভ্যতার শান্তিপূর্ণ স্থিতি সম্ভব নয়। জাগতিক জীবন যাপনের পথে প্রতিটী সৃষ্টি-কণা থেকে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনেই তত্ত্বং সমাধান পাওয়া যায়।

একটি চিত্রে দেখিতে পাই—বৃন্দাবনে অনা-বৃষ্টি ব্রজবাসীগণ ইন্দ্র-যজ্ঞ উৎসবে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ 'পিতা নন্দ মহারাজকে' জিজ্ঞেস করলেন—'এ কিসের উৎসব'? পিতা তদুত্তরে বললেন ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা, তাঁর আরাধনায় পরঃ বর্ষিত হবে। গাভী সকল তৃণ খেয়ে দুগ্ধ প্রদান করবে, আমরা গোকুল, আমাদের জীবিকার সন্ধানে নিশ্চিন্ত হব। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণের পর বললেন, কর্ম্ম দ্বারাই জন্তু জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্ম দ্বারাই তাহাদের প্রলয় ঘটে। সুখ দুঃখ ভয় এবং কাম কর্ম্মদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। কর্ম্মের বাইরে কোনও ঈশ্বর যদি থাকেন তিনিও তো কর্ত্তার কর্ম্মেরই ভজনা করেন কর্ম্ম না করলে তাহাকে যেমন তিনি ফল দান করতে পারেন না, কর্ম্ম করলেও তেমনি তাহার ফল আটকাতেও পারেন না। একমাত্র কর্ম্মই মানুষের শত্রু মিত্র উদাসীন, শুরু ঈশ্বর; কর্ম্মের দেবতাকে খুঁজতে হবে কর্ম্মেরই অন্তরে ঐ কর্ম্মেতেই ব্রহ্মরূপে। কর্ম্মের বাইরে কর্ম্ম-ফল দাতা কোনও দেবতা নেই। 'মহেন্দ্র কিং করিষ্যতি'—মহেন্দ্র কি করবেন। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যে সব দ্রব্য-সম্ভার আপনারা সংগ্রহ করেছেন তা দিয়ে এই গো, গোবর্দ্ধন ব্রাহ্মণদের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ বিধান করুন। আপনাদের

শাস্ত্রে অনধিকারী অজ্ঞ যে সব চতুর ও পণ্ডিত ভাবছ এই ব্রজে হয়েছেন তাদের সম্মান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করুন, গোপিগণকে উৎকৃষ্ট ভাব প্রেম ও গোবর্দ্ধন গিরিকে এই সব উপচার নিবেদন পূর্বক ইন্দ্র যজ্ঞের বাস্তব সার্থকতা আস্বাদন করুন'।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে ব্রজবাসীগণ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহরিত সমস্ত উপকরণ জড় প্রকৃতির প্রতীক (symbol) গোবর্দ্ধন গিরিকে উপহার প্রদান করলেন। আকাশের দেবতা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ঝড় বজ্রপাত, প্রবল বর্ষণের দ্বারা ব্রজবাসীর ত্রাসের সঞ্চার করলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে 'শৈলোঽস্মি'—'আমিই শৈল' বলে ঊর্দ্ধে তুলে ধরলেন।

এই কাহিনীর ভেতরে যে তত্ত্ব রয়েছে তা অনুধাবন করতে পারলে 'জগৎ মিথ্যা' জ্ঞান করে আমরা বাস্তবের হাতের এমন কঠোর আঘাতের সম্মুখীন হতাম না। এই মাটীর জগতের থেকে পরে মানুষ বেঁচে থাকে, তাকে অমৃত করে গোলোক বৈকুণ্ঠের ধ্যানে বিভোর থেকে একান্ত মাটীর টান মানুষকে করেছে আদর্শ হীন। তাই শ্রীকৃষ্ণ মাটীকে গৌরব দান করে তাকে আদর্শের সম স্থান দিয়ে ঊর্দ্ধে তুলে ধরলেন, জড়-অজড়ের কোলাকুলি করালেন। জড়ের বুকেই অজড় ব্রহ্মের আস্বাদনের অবসর পৌঁছালেন। আজ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর আগের ঐ মানুষটী মাটীর মূল্য কর্ম্মের মূল্য স্বীকার করে গেছেন, মান দান করে গেছেন। তাই তো শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বললেন, 'Sri krishna is the communist of all communists.' আজ বহু মত বাদে জর্জ্জরিত পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে ধর্ম্মে এক কথায় বাস্তব জীবনের সমস্যা-জর্জ্জরিত সর্ব্বক্ষেত্রের শান্তি-পূর্ণ সমাধান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও দর্শন দ্বারাই সমাধান প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। এ কথায় সমাজের ভেতরে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র যাদের হাতে বর্ত্তাবে সেই যুব সমাজের ভেতরে বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণের এই সর্ব্বাঙ্গীণ দর্শন অনুপ্রবেশের প্রয়াস আমাদের অবশ্য করণীয়। তা হলেই তাঁর জন্মোৎসব পালন হবে সার্থক।

এমনি করে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার প্রত্যেকটী ঘটনাকে তত্ত্বতঃ বিশ্লেষণ করলে সমস্যা-সঙ্কুল বিশ্বের সব চলার পথের সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি যে নিজ মুখেই বলেছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।' 'কৃষ্ণ যেমন যার কাছে যেমন'। তাই তো অভাচোরী রাজা কংস-ভয় মনে তিনি—মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ

স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজ পতেঃ বিরাড় বিদুষাম্
তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গত সাগ্রজঃ।' ভাগবত।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যেমন করে যার যার দৃষ্টিকোণে ধরা পড়েছিলেন তারই চিত্রে দেখি তিনি মল্লদিগের চোখে সাক্ষাৎ অশনি, নরনারীদের কাছে নরবর, স্ত্রীদের কাছে সাক্ষাৎ মন্মথ, গোপকুলের আপন জন, আবার তিনিই অসৎ ক্ষিতি-পোষকদের শাসক, দেবকী বসুদেবের নন্দন, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ

ধর্ম, অবিদ্বানদের দৃষ্টিতে তিনি বিশ্রী, যোগিগণের পরতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, বৃষ্ণিকুলের পর দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মতো এত খানি ব্যাপকতা, এত খানি গভীরতা দিয়ে আজ বিশ্বের সকল স্তরের মীমাংসার কৌশল শিখতে হবে।

অত্যাচারী রাজা দুর্যোধনের রাজত্বের অত্যাচারকে স্তব্ধ করে তিনি পুরুষোত্তম রাজ্যে অর্থাৎ যে রাজ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, কলা, কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি, জড় জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎ প্রভৃতির সম মূল্য ও সম মানে আস্বাদিত হতে পারে তেমনি রাজ্য গড়বার জন্য অর্জুনকে তিনি 'রাজ্য, ভুঞ্জ বাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জগৎ সংসারের সব জটীলতা কুটীলতাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে অর্জুনকে তিনি প্রচলিত বৈরাগ্যের পথে উদ্বুদ্ধ করেন নি। কোন রকম ক্লীবত্বের সমর্থন পুরুষোত্তম-দর্শনে নেই। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত দর্শনই সুদর্শন। এমনই একখানি সুদর্শন নিয়ে বিপ্লবী শ্রীকৃষ্ণ ধরার সকল বেদনার ভার হরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বিশ্বের জন্যও তাঁর বাণী ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন—জাগতিক ধর্ম্ম পারমার্থিক ধর্ম্মের গ্লানিতে বিপর্যস্ত ধরার বুকে সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করতে সম্ভবামি যুগে যুগে—আমি যুগে যুগে আসি। তিনি আসেন এই তো আমাদের ভরসা। তিনি আসবেন অথচ আমরা প্রস্তুত হব না, সুন্দর হব না তা তো হয় না। বাড়ীতে জামাই এলে আমরা ঘর দুয়ার গুছিয়ে সুন্দর করে রাখা হয়, আর ঈশ্বর মানুষ শ্রীকৃষ্ণ আসবেন—আমাদের জীবনকে সুন্দর তো করতেই হবে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ভাষায় "গীতায় কৌশল বুদ্ধি-কৌশল ও ভক্তি-কৌশল। মানুষ যে কোনও কর্ম্মের সাধনায় রত থাকুন না কেন, সব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে যদি সে তাহার কৌশলটী জানিতে পারে। পথের বাড়াবাড়ি, সাধনার বাড়াবাড়ি গীতায় নাই। তিন কিংবা অতিন হইতে হইবে—ইহার কোন কথাই গীতায় নাই। গীতায় আছে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' কলিতে প্রকৃতি প্রতিকূলা। যোগও প্রতিকূল, ভোগও প্রতিকূল। যোগশাস্ত্র, ভোগশাস্ত্র, সব আজ ভোঁতা। আজ বিশ্ব ব্যর্থ ধনুর্দ্ধর। বিশ্বে অপ্রতিকারের সাধনা ছাড়া অন্য কোন পথেই তো সে আর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। পাশ্চাত্য ভাবিতেছে সে অস্ত্রের পথে সার্থক সফল হইবে। ইহা তাহার কালগতি সম্বন্ধে অতি অজ্ঞতাই নিদর্শন মাত্র। পাশ্চাত্য কালজ্ঞ নয়।' মাঝে মাঝে তাহাকেও নিরস্ত্রীকরণের বুলি যন্ত্রের মত আওড়াইতে কাল বাধ্য করিতেছে। নিরস্ত্রীকরণই যে বর্ত্তমান কালধর্ম্ম।··· শ্রীকৃষ্ণ এক নিষ্কল, সার্ব্বকালিক সার্ব্বভৌম মহামানব, মহাপুরুষ, পুরুষ প্রধান।"

সাময়িকী

রথযাত্রা:— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীবিভোগোপালকে তাঁর অপূর্ব সংগ্রামের তত্ত্ব ও জীবনের লক্ষ্য তাঁকে জগন্নাথরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৫৫ সনের রথযাত্রার দিনে তিনি লিখেছেন, "জগন্নাথ আমার, জগৎ + নাথ আমার। তুমি মন্দির ছাড়িয়া আজ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। মন্দিরে ছিলে তুমি স্পৃশ্যের ঠাকুর, কুলীনের ঠাকুর, ভদ্রের ঠাকুর, উচ্চ বর্ণের ঠাকুর। পথে দাঁড়াইয়া আজ তুমি অস্পৃশ্যের ঠাকুর, অন্ত্যজের ঠাকুর, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজের ঠাকুর। আজ তুমি জনসাধারণের হাতে তোমার রথরজ্জু টানিবার অধিকার দিলে। তুমি আজ অনাদৃতের প্রেম যাচ্ঞা করিবার জন্য জনগণের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। অভিমানী পণ্ডিত স্পৃশ্যেরা তোমাকে ঐ রূপ দিয়াছে, জনসাধারণের দ্বারে আসিয়া তুমি হইবে পদ্মপলাশলোচন, দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুযুগলভূষিত, শ্রীচরণযুক্ত ঐশ্বর্যের তুমি কেউ নও তুমি মাধুর্যের ঠাকুর। 'নাথ' শব্দ যে যাচ্ঞা করে—জগৎ তুমি যাচ্ঞা কর, তাই তুমি জগন্নাথ। তোমার রথযাত্রা অন্তর্যুক্ত হউক, সকলের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তোমার রথ টানিবার, বহন করিবার শক্তি দেও"। ১৯৫৭-এর রথযাত্রার পরে তিনি সাময়িকীতে এ সম্বন্ধে লিখছেন, "বিশ্বের আদি যাত্রী জগন্নাথদেব রথযাত্রায় বাহির হইয়াছেন— বিশ্বাতীত যিনি তিনি বিশ্ব-পরিক্রমায় নামিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহার পথ-চলাকে নমস্কার। বিশ্বের পথ বাহিয়া তিনি চলিয়াছেন— তাই বিশ্ব আজ পরম তীর্থ ক্ষেত্র, তাই বিশ্বে আজ universal federation বা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বই আজ তীর্থ শ্রীবিভোগোপাল লিখিয়াছেন, 'এই বিশ্বই আমার মহাপীঠ'। জগন্নাথদেব বিশ্বপথে রওনা হইয়াছেন, তাই সমগ্র বিশ্বই তীর্থ, সকল বিশ্বের সকল মানুষ আমার ভাই, সকলের জন্যই আমার অন্ন। মানুষের দুর্বুদ্ধি— তাই জগন্নাথদেবের চলার পথকে সংকুচিত করিয়া কেবল শ্রীক্ষেত্র পুরীতেই তাহা সীমাবদ্ধ করিয়াছে —তাই সেখানেই শুধু সকলের অন্ন এক, সেখানেই শুধু ব্রাহ্মণ শূদ্রের জাত বিচারের প্রশ্ন না উঠিবার কথা। কিন্তু ইহাতে কি জগন্নাথদেবের জগন্নাথত্ব রহিল?... তিনি সমগ্র জগতের বুকে নামিয়া আসিয়াছেন— বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করিয়াছেন।

তিনি এই সংসার-পথ পরিক্রমা করিবেন, পথে পথে তিনি তাঁহার পদচিহ্ন রাখিয়া যাইবেন। কে তাঁহার রথ টানিবে? নিজে তিনি অচল। তাঁহার ভার বহিবে মানুষ—নিজেকে অচল করিয়া এ গৌরব—তাঁহাকে বহন করিবার গৌরব— মানুষকে তিনি দিলেন। মানুষকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, জগন্নাথের রথের রজ্জু তুমি নাও, তাঁহার রথ টান, তাঁহার ভার বও, জগতের সেবা কর—তোমার ভার তিনি বহিবেন।... তাঁহার জগতের ভার তুমি লও, তাঁহার রথ টানিয়া চল— তোমার ভার হাল্কা হইবে। তাঁহার জগৎ অর্থ

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মুচি মেথর—তাঁহার জগৎ অর্থ কর্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেম। জগন্নাথ জগতে নামিলেন অর্থাৎ এই সব কিছুই—মানুষের মধ্যে তাঁহার সকল প্রকাশ—ব্রাহ্মণরূপে, ক্ষত্রিয়রূপে, বৈশ্যরূপে শূদ্র রূপে সমস্ত প্রকাশ—এবং চিত্ত ও মনের সমস্ত বৃত্তি—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম—তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা লাভ করিয়াছে।...

জগতের বুকে যোগমায়া-প্রভাবে নামের প্রতিষ্ঠাই শ্রীমিতারোলেলেবের জড়াজড় সমন্বয়। বৈকুণ্ঠের ঠাকুরের মাটীর বুকে নামিয়া আসাই জড়ের বুকে অজড়ের প্রতিষ্ঠা।...আদি যাত্রীর চিরন্তন যাত্রাকে বিশেষ দিনে আস্বাদন করিবার এই দেশ-যাত্রাকে আমাদের প্রণতি জানাই তিনি চলিয়াছেন—আমরা চলিব—তাঁহার রসের রসে আমরা ভাসিব, আমরা ধন্য হইব।"

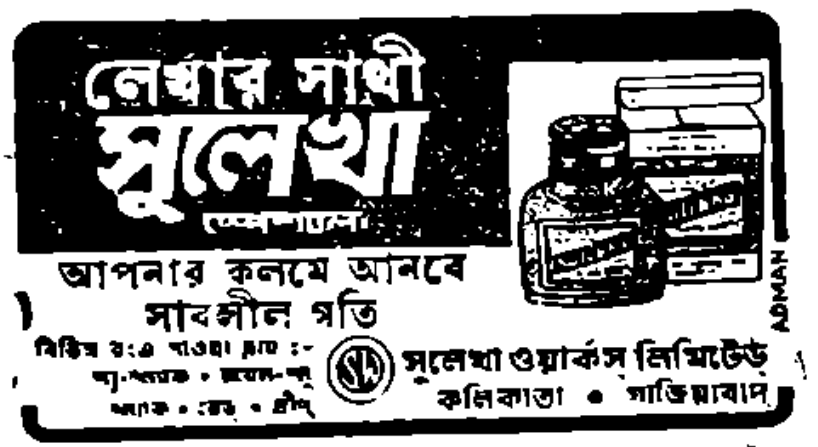

ন দিনে বলা যায়

...মেলে জুতোর খবর

মানা
সাইজ ছো/ব/বা •
১১.১৫ টাকা

ব্রেজেল
সাইজ ৫-১
১৬.১৫ টাকা

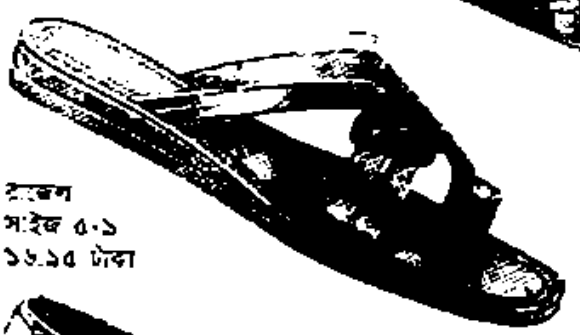

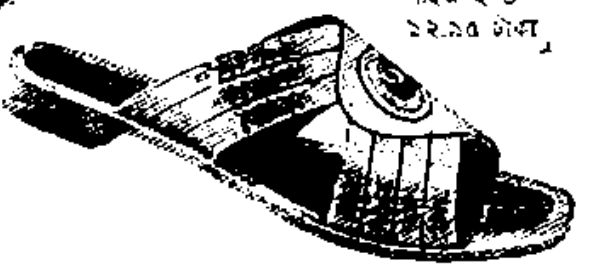

লোলানী
সাইজ ২-১
১২.১৫ টাকা

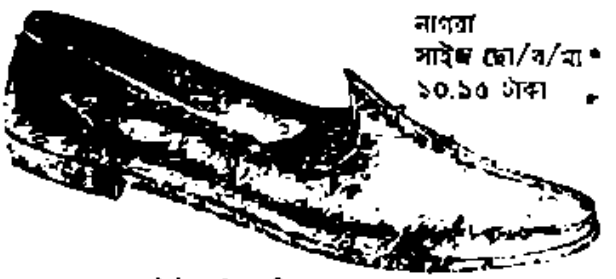

নাগরা
সাইজ ছো/ব/বা •
১০.১৫ টাকা

• ছোট/বড়/মাঝারি

Bata স্যানডাক আর ভালকান বানিয়েছে

ঃ অমৃত বাণী ঃ

'সর্ব্ব ধর্ম্মী, সর্ব্ব গুণকর্ম্মধাম, সর্ব্ব যোগাচার্য্যসম্পন্ন, জ্ঞানভক্তি-প্রেমের সমন্বয়-মূর্ত্তি নিত্যগোপাল শেষ সময়ে বলিয়াছেন, 'জাগো, জাগো, নিয়ত জাগো। এ সংসার অতি ভীষণ স্থান। এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়। অর্থে সুখ নাই, যশে সুখ নাই, প্রকৃত সুখ ভগবানের দর্শনে, স্পর্শনে, তাঁর গুণকীর্ত্তনে। .....।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

(শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে, পৃঃ ১৭৮)

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2541 UJJIVALBHARAT

কৃষাকে কৃষির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহতীন আত্মা যেমন অবাস্তব, কৃষিহীন তত্ত্বও উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সন্ধান আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

" Occasional Speeches —Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে জগৎ-জগৎ বদলাবার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার হদিস পাবেন নীচের বইগুলিতে—

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ॥

॥ মুদ্রিত ॥

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)
২য় খণ্ড (১ম অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ

শ্রীনিতাগোপাল—জীবনে ও দর্শনে ৫·০০
স্বরাজের পূর্ণরূপ ০·৫০
গীতাতত্ত্বদীপ ০·৬০
উজ্জ্বলভারত (পুস্তিকা) ০·৫০
মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে
—পুরুষোত্তম-দৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১·০০

॥ পাণ্ডুলিপি ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী ভাষণ
ইত্যাদি।

॥ ৺ প্রতিভা রায়ের ॥

নারী-প্রগতির অন্তরায়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য
নিতাগোপাল ও শিল্পী সুধার কথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥

১। সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল
২। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
৩। শরৎচন্দ্রের শেষ-প্রশ্ন

ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত

৪। রবীন্দ্র ছন্দ ৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর, জেলা—চব্বিশপরগণা, কলিকাতা ৫৯) ১৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o জে, বি, আইব্রেরী) হাজিরাড়া হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তীর্থপূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

॥ শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
"আমি বিশ্ব-নাগরিক" আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়। "এই বিশ্ব-ই আমার মহামঠ"
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

ফাল্গুন ১৩৮৪, খ্রীঃ ১৯৭৭] সম্পাদিকা-শ্রীমতী মিত্র [ত্রিংশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

দশের কল্যাণে

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

নির্বিঘ্ন যাত্রায় পূজার আনন্দ নিবিড় হোক

পূর্ব রেলওয়ে

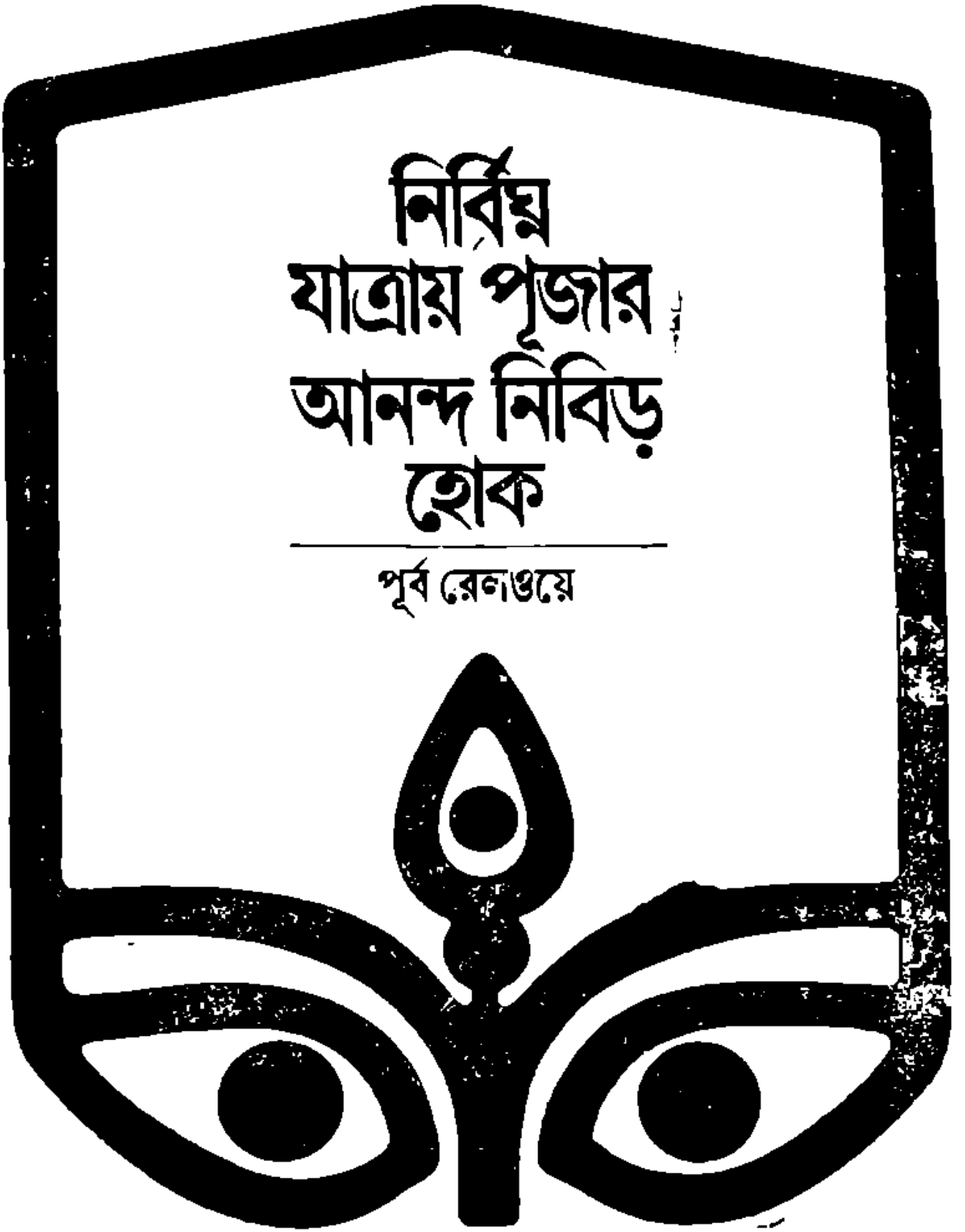

গীতাস্বামী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা।

মূল, অন্বয়, অনুবাদ টীকা টিপ্পনী ভাষ্য বৃহদ্ভাষ্য ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অধ্যাত্মপ্রাণিক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও তত্ত্বমূলক উপসংহার বৃহত্তর আকারে ও বড় টাইপে মুদ্রিত নূতন সংস্করণ আর্টকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০ টাকা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, আর্টকেট সহ ১২·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সদাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	১·০০
পদ্য গীতা	১·০০		

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১২·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৭·৫০
কর্মবাণী		Soul of India speaks	৭·৫০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম, এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের মহাগুরু	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	১·৩০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
বাংলার ক্ষত্রি	৭·৫০	আচার্যদেব শ্রীনীহার সরকারের	
বাংলার বিদুষী	৪·০০	শরীর ও শক্তি	৬·০০
ব্রাহ্মর্ষি রামমোহন	৪·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৫·০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০	সরল যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৬·০০
রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌনিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

ফার্সী আরবদের [redacted] ও শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত

[redacted] শব্দকোষ ১৮·০০

বর্তমান ব্যবহার প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

উজ্জ্বলভারত

শারদীয়া ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, ইং: ১৯৭৭

শক্তি

মহেশ্বরী মহাশক্তি, পরেশী পরমাশক্তি,
কৈলাসে রামেশ্বরী—শ্রীকৃষ্ণের বামে।
ধ্যানে তব অধিষ্ঠান, সমাধিতে বিদ্যমান,
তত্ত্বমসি মহাবাক্য—তোমার উদ্দেশে।
তুমি তত্ত্বমসি তারা, চিন্ময়ী চেতনাধারা,
সর্ব্ব তন্ত্রের ঐক্য শ—তোমার প্রকাশে।
যজ্ঞে তুমি যজ্ঞেশ্বরী যোগে তুমি যোগেশ্বরী
তপোময়ী হয়ে আছ—পরম তাপসে।
তুমি তপন তাপেতে, চাঁদ জ্যোৎস্না কিরণেতে,
মহেশের ললাটেতে—আছ মা মহেশে।
শস্যেতে তুমি শাকম্ভরী, মাধবে তুমি মাধবী,
দুর্গতিহা মহাদেবী—মায়ার বিকাশে।
নিত্যে তুমি নিত্যাশক্তি, নিত্যময়ী আদ্যাশক্তি
প্রাণে প্রাণময়ী তুমি—প্রাণের উচ্ছ্বাসে।
তুমি পরম জ্ঞানেতে, আছ মা পরাভক্তিতে,
পরমা শান্তিতে আছ—পরম সন্তোষে।
তুমি পুণ্যতমী শক্তি, (কত) হও নবীনতমী শক্তি,

৺ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৺

তুমি বিশ্বেশ্বরী শক্তি—বিশ্বের (ধ্বংসের) সকাশে
প্রলয়ে প্রলয়ী শক্তি, নিত্যের নিত্যাশী শক্তি,
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি—বাসিছ বা বিশ্বে।
ব্যাপ্ত তুমি পৃথিবীতে, ব্যাপ্ত আছ নভোতলে
ব্যাপ্ত বিমল বায়ুতে—অনল আকাশে
সর্ব্বভূতময়ী শক্তি, পার্থিবী বারুণী শক্তি,
অগ্নিতে আগ্নেয়ী শক্তি—তেইশ তত্ত্বে আসে।
তুমি মা বারুণী শক্তি, আকাশেতে তুমি
তুমি মা জ্ঞানদা শক্তি—সবার মরমে
সত্ত্বা সত্তাবতী শক্তি, দিবা প্রেমময়ী শক্তি,
মহাভাবময়ী শক্তি—(কৃপাবলে) প্রেমানন্দ হবে
শক্তি মায়ার বিনাশে, বিশ্বের জীব তোমাকে
রক্ষা কর বলি ডাকে—রক্ষাকালী ত্রাসে।
স্নেহময়ী স্নেহ ভরে, বিশ্বের জীব সমরে,
শান্তনা কর আশ্বাসে—মধুর আশ্বাসে।
তুমি রাজরাজেশ্বরী, তুমি মা ভুবনেশ্বরী,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে—(পুত) তব কর যশ

মায়ের পূজা

—শ্রীসুনীতি সান্যাল

মা! মা! এ শব্দটী কত মমতাযুক্ত, কত প্রশান্তিকর দৈহিক মানসিক সকল বেদনার ফাঁক দিয়ে অজ্ঞাতসারেই যেন মা শব্দটী মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। সেই মুহূর্ত্তে দেহে মনে কেমন স্নিগ্ধতাও যেন লাগে। কে এই মা? যাঁকে ডাকলে আমার ভাল লাগে—যাঁর সঙ্গ আমার অভয় করে? "ঘরে আমার মা আছে রে—ওরে শমন আমায় নিতে পারবি নারে" বলে মৃত্যু-ভয়ও নিবারিত হয়? এ বিশ্ব-সংসারে সন্তানের জন্য দুঃখের সাগর পাড়ি দেন হাসি মুখে—কে সেই মা? বিশ্বসৃষ্টির এই মা আর মাতৃত্ব শক্তি যদি কল্পনা করি তখন আর থৈ পাই না। দেখতে গেলে, শুনতে গেলে, বলতে গেলে লাগে শুধু বিস্ময় "আশ্চর্য্য"। কেননা, সমস্ত জীব গোষ্ঠীর ভেতরে যে এই মাতৃত্ব শক্তি অনুস্যূত রয়েছে; তাই তো এ জগৎ নূতন নূতন রূপে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। যে শক্তিতে বিশ্বের সব কিছু ওতপ্রোত সেই শক্তিই যে মাতৃশক্তি তা ঋষিদের চক্ষে একদিন ধরা পড়েছিল। তাঁরা নমস্কার করলেন "যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু, মাতৃরূপেন সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ"। এই শক্তির আনন্দেই চন্দ্র সূর্য্য আলোর তরঙ্গ মাচে, বাতাসে ঢেউ খেলে যায়, ঋতুচক্র নতুন বেশে আসে যায়; বনী সাগরে জোয়ার ভাটা খেলে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সৃষ্টির আনন্দে মরণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। শক্তির এই ঐশ্বরিক রূপকে জীবনে ধ্যান করা খুবই শক্ত। অথচ শক্তির এই প্রকাশকে জীবনে বরণ করতে না পারলে গৃহ কোণের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে জীবনের ক্ষুদ্র বৃত্তগুলো ছিন্ন করে এই প্রকাশকে ধারণাতেই আনতে পারবে না। কিন্তু সব কিছু প্রকাশের মধ্যে যদি আমাদের মায়ের রূপই দেখি তা হলেই আশ্বস্থ হতে পারি এবং তখনই সব কিছু মধুর হয়ে যায়। তখনই জীবনের সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতে সুস্থ থাকবার চিত্তবৃত্তি লাভ করতে পারি। এবং আমাদের দেহস্থের একান্ত জৈব প্রবৃত্তিগুলোর বহিঃ প্রকাশ, ক্ষুদ্রতার প্রতি আসক্তি, এবং সেই আসক্তি থেকে জাত ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঘৃণা বিদ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলোও অপনীত হয়ে যায়। তাই যুগে যুগে মানুষ এই মাকেই জানবার জন্য কত রকমে প্রয়াস পেয়েছেন। শ্রীশ্রী চণ্ডী উপ্যা-খানে পাই রাজা সুরথ আর বৈশ্য সমাধির কথা। রাজা সুরথ রাজ্যচ্যুত হয়েছেন। প্রজারা তাঁকে বিতাড়িত করেছেন। বৈশ্য সমাধিও তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদ্বারা বিতাড়িত। সবই তাঁদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য যারা তাঁদের পরিত্যাগ করেছে, সুরথ সমাধির মন কিন্তু সেখানেই পড়ে আছে। রাজা তাঁর হাতিটার কথাও ভুলতে পারছেন না। তাঁর প্রিয় হাতিটা সমর মত বাস জল পেল কিনা সে চিন্তায় ভেতরটা কেমন টনটন্ করে। বৈশ্য সমাধিরও একই অবস্থা। স্ত্রী পুত্র কন্যা তাড়িয়ে দিয়েছে তবুও তাদেরই জন্য মন পোড়ে মায়া অথ? বনের

ভেতরে দুজনের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আলাপ চলে দুজনেরই এই আলা ও মোহকর অবস্থা নিয়ে। তাঁরা গেলেন যেমন মুনির আশ্রমে, তাঁদের দুর্দশার কথা আর মানসিক অস্থিরতার কথা জানালেন মুনিবরকে। কিন্তু তিনি তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যা করলেন মাতৃতত্ত্বের ইতিহাস। তিনি তো শান্তি না দেবার মত উপদেশ শোনাতে পারতেন কিন্তু তা না করে এই দেহ মন প্রাণ এবং মায়া মোহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলো যাঁর থেকে প্রকাশ সেই বিশ্ব-মায়ের ইতিহাস শোনালেন যাঁর কাছে রয়েছে সকল প্রকার মোহকে হজম করবার কৌশল মায়ের তিনটি চরিত্রের বর্ণনায়।

কালের যাত্রা বেয়ে যুগে যুগে মায়ের এই রূপেরই পূজা চলে আসছে। ভারতবাসী আমরা দীর্ঘ যুগ ধরে দুর্গতিনাশ করে মাকে ধ্যান করে আসছি। এক রূপে তিনি অসুরনাশিনী দশভুজা দুর্গা ভয়ঙ্কর রূপে। এই বিরাট রূপ কি আমরা সব সময়ে আত্মস্থ করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? তাই তিনি এলেন আমাদের কাছে হিমালয় দুহিতা উমা হৈমবতী রূপে। এই মাকে শুদ্ধ ভক্তি দিয়ে কন্যারূপে সৃষ্টি করে একেবারে ঘরের মেয়ে করে নার্থক হয়েছে। মাতৃরূপে তিনি সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টি করেছেন আবার বিশ্ব তাঁকে সৃষ্টি করেছে কন্যা-রূপে। কী অপূর্ব আস্বাদন! এর সত্যতা পাশ্চাত্য দার্শনিকের God creates world, world creates God-এর ভাষায়ও ধরা পড়েছে। তিন দিনের মায়ের এই পূজায় মাকে আমরা দেখব কেমন বুদ্ধি দিয়ে? পূজা মানে যার যা ওস্ত তাই দিয়ে তাঁকে জানব। মাকে জানব মায়ের বুদ্ধির শরণ নিয়েই—"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—গীতা। আমাদের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দিয়ে মাকে দেখা বিড়ম্বনা মাত্র।

তাই পূজার প্রথমে বোধনের অনুষ্ঠান। আমাদের অহংকারের চোখ দিয়ে দেখি মা ঘুমিয়ে আছেন—আমরা তাঁকে জাগাই। কিন্তু মা আমার চির জাগ্রতা বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অনিমেষ আঁখি তুমি ধ্রুব তারা"—তিনি জেগে আছেন বলেই তো বিশ্বের অস্তিত্ব আছে। জীবনের সকল সত্তায় মায়ের আগমন যদি উপলব্ধি না হয় তখনই মনে হয় মা-ই বুঝি নিদ্রিতা—আমি মাকে জাগাব।

তাই বোধনের দিনে মায়ের শরণাগত হয়ে নিজের বিচ্ছিন্ন অহংকে মায়ের কাছে বলি দেব, তবেই মা আমার সকল সত্তার অধিকার করে বসবেন এবং তখনই হবে অধিবাসের আয়োজন সার্থক।

মহাসপ্তমীর পূজায় পাই—মাকে আমার সকল সত্তায় উপলব্ধি করেও বহুযুগ সঞ্চিত সকল ভালমন্দ সংস্কারগুলো আমায় নতুন সৃষ্টির পথে এগোতে দিচ্ছে না। যেমন হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ- সখা অর্জুনের জীবনে। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলে শরণাগত হয়েও তবু বলছেন, "যুদ্ধ আমি করব না"। পূর্ব্ব সংস্কার তখনও তাঁর চলার পথে বাধা দিচ্ছে। তাই সপ্তমী পূজার দিনে মহাকালী-রূপিণী মায়ের আরাধনা করে মধু-কৈটভরূপী অতীতের মু ও মু সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে "চণ্ডৈবেতি" মন্ত্রে হব দীক্ষিত। কোন সংস্কার তখন আর আপকতর জীবন যাপনের অগ্রগমনের পথে বাধা দেবে না।

দ্বিতীয় দিনের মহাষ্টমীতে মহালক্ষ্মীর পূজা করে আমরা কী হব? নতুন সৃষ্টির প্রভাতে সকলে মিলেমিশে সংঘবদ্ধ ভাবে চলতে না পারলে সৃষ্টি তো দিব্য সৃষ্টিতে গড়ে উঠতে পারে না। এই দিনের পূজায় মাকে দেখি সকল দেবশক্তির বিশ্বোত্তমা মা আমাদের। সকল দেবতাদেহের সংঘবদ্ধ শক্তিতে বিচ্ছিন্নতারূপী মহিষাসুর নিহত হয়েছে। তাই এই পূজার দিনে সকল স্তরের মানুষের ডাক পড়ে। সমাজের পতিত স্তরের মানুষেরও প্রয়োজন পড়ে এই পূজায়। এই দিনে মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করব মা, আমরা সকলে মিলে মিশে তোমার পূজার কাজ করব, তোমার সৃষ্টিকে সংঘবদ্ধভাবে সুন্দর করে গড়ে তুলব। মহিষাসুরের নিম্নী ভেদবুদ্ধি অপনীত হয়ে সমাজের সকলের সুখ দুঃখে সমভাগী হয়ে চলবার বুদ্ধি লাভ করবার সাধনায় ব্রতী হব। "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"—মায়ের আহ্বানে মায়ের পদপ্রান্তে সবাই মিলতে পেরেছি ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, নরনারী, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলকে সাথে নিয়ে মায়ের কাছে আসতে পেরেছি। তাই সর্বব্যাপ্তি-হারিণী মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাব আমাদের সকলের শক্তি পূর্ণ করবার সাধনায় আমরা ব্রতী হব। তবেই হবে গণতান্ত্রিক কাঠামো সার্থক। মাকে প্রণাম জানাবার প্রণত হব এই বলে—বিশ্বের স্বধারূপে তোমায় নমস্কার, তৃষ্ণারূপে তোমায় নমস্কার, শান্তিরূপে তোমায় নমস্কার, ভ্রান্তিরূপে তোমায় নমস্কার, শান্তিরূপে তোমায় নমস্কার। আমাদের ব্যক্তি-জীবনের যা-কিছু ঐহিক পারত্রিক সব কিছু সর্বস্ব হয়ে গড়ে উঠুক তোমার পূজা—অন্তর জীবনে গড়ে উঠুক, বহির্জীবনে গড়ে উঠুক

তৃতীয় দিনের পূজায় পাই মাকে মহাসরস্বতী রূপে। সপ্তমী, অষ্টমী পূজার সংস্কার-মুক্ত সংঘবদ্ধ জীবনে যা কিছু সৎ বস্তু আমাদের সামনে এল, সেই বস্তুকে ভোগ করব কোন্ বুদ্ধি দিয়ে তা নিখর মায়ের এই নবমী দিনে মহা সরস্বতী পূজায়। ব্যক্তিগত ভোগবাদের প্রতীক ত্রিলোকের অধিপতি শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়। শুম্ভ-নিশুম্ভরূপী আসুরিক প্রবৃত্তির নাশে হয়ে "ত্রৈলোক্য তৃপ্তিকারিণী"-এই কৌশল নিখর নবমীপূজায়। এদিন মায়ের দেখি হিমালয়-দুহিতা উমা হৈমবতীর মানবী মূর্তি। ছোট মেয়ে জাহ্নবীতে জল আনতে এলেন। কিন্তু শুম্ভ নিশুম্ভের চর তাঁর অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হল। শুম্ভ নিশুম্ভকে জানাল এই নারীকে স্ত্রী রূপে লাভ করতে। গর্বিত ভ্রাতৃদ্বয় দূত পাঠালেন তাঁর কাছে তাঁদের যোগ্য পতিত্বের সংবাদ দিতে। হিমাচল-কন্যা তাঁর বাল্যের প্রতিজ্ঞার কথা জানালেন দূতকে—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি"। বিশ্ব-প্রকৃতির এই চ্যালেঞ্জ, প্রকৃতি-জাত প্রতিটী বস্তুর এই চ্যালেঞ্জ প্রতি নিয়ত ঘটছে। সেদিনের চিত্রে শুম্ভ-নিশুম্ভের অতুল ঐশ্বর্য আর দুজনের তপস্যা সত্ত্বেও তাদের বিনাশ ঘটে ছিল। তাই নবমী পূজার দিনে আমরা নিখর কেমন করে ভোগ্য বস্তুকে শুভবুদ্ধি দিয়ে দেখে ভোগ করব। ব্যক্তিগত বিদ্যা, জ্ঞান, বল, ধন সব কিছুকেই বিশ্বগত না করে যদি একলা ভোগ করতে চাই, কালে কালে তা মরণ-ই ডেকে আনবে। তাই মায়ের কাছ থেকে নিখর সকল প্রবৃত্তি পরিচালনার মূল মন্ত্র।

কত যুগ আগে এত বড় বিরাট পরিকল্পনা সত্য-

দ্রষ্টা ঋষিরা দেখে গেছেন মানব সমাজের কাছে। এই পরিকল্পনা আজও রূপ পেল না পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে অথচ বহুর বহুর আমরা এই ঐশ্বর্যময়ী মাধুর্যময়ী মায়ের পূজা করে আসছি কিন্তু পুরাতনের ভাল-মন্দ সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র সংবেদনার মধ্য আজও বিশ্ব-জীবনে রূপ পায় নি। বিশ্ব-ক্ষুধাকে নিজের ক্ষুধা মনে করে ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষা, অর্থ করতে পারি নি।

তাই সমাজের ক্ষেত্রে বিজয়া আমাদের কোথায়? প্রাণের কোলাকুলি আজ কোথায়? সবই যেন বহিরঙ্গের ব্যাপার। তবু ভরসা রাখব মায়ের আগমন সার্থক হবে ভারতবাসীর জীবনে। মায়ের অযাচিত করুণাতেই ভারতবাসী তার সম্বিৎ ফিরে পাবে। "আজকের পূজার দিনে শ্রীদুর্গা-চরণ বন্দনা কালে আমরা যেন জানি এই পরাশক্তিই আমার স্বদেশ। রাজনীতি যখন করব, তখন যেন মনে রাখি ঐ শক্তিরই আরাধনা করছি। শ্রীদুর্গা-চরণে অঞ্জলি দেবার সময় যেন মনে রাখি আমার দৈনন্দিন জীবনে আমার পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুরুষকন্যা, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, দেশবাসীর মধ্য দিয়ে এই আদ্যা শক্তিরই বিকাশ তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে আমার যে ব্যবহারিক জীবন, সে সকল ব্যবহার এমনই যেন হয় যা দিয়ে সেই মহাশক্তিরই পূজা হয়। আমাদের স্বদেশ-সেবা যে সেই মহাশক্তিরই পূজা সে কথা যেন বুঝতে পারি। আমাদের মন্ত্র, তন্ত্র জপ, ধ্যানধারণা সব জীবনের বাইরে না থাকে।" শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

সকলের মা শ্রীশ্রীদুর্গা

—শ্রীরেণু মিত্র

সকলের মা যিনি তাঁর নাম শ্রীশ্রীদুর্গা—ভারতের সাধক তাঁকে জগন্মাতা বলে দেখতে চেয়েছেন—কোন একটা দলের, দেশের বা সমাজের তিনি নন। ভারতীয় বর্ণাশ্রমের সিঁড়িতন্ত্র ব্রাহ্মণ শূদ্র, সত্ত্ব রজো তম প্রভৃতিতে বড় ছোট ভেদ করে যে অসাম্য গড়ে তুলেছিল এবং যে ব্যবস্থায় সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছিল সমাজের কয়েক জনের জন্য, সেই সিঁড়িতন্ত্রেরই পাশাপাশি এই ভারতেরই চণ্ডী গীতা উপনিষদ ভাগবতে একটা চিন্তাধারা বয়ে চলেছে যা সর্বের জন্য—সর্ব কালের সর্ব দেশের সর্ব মানুষের জন্য। এই দশভূজা পূজাতেও সেই সর্বের কথা। সকলের মা যিনি তিনি শ্রীশ্রীদুর্গা। সকলের মা এই দুর্গা তাই 'মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী', আবার 'সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী'। সকলের মা বলেই তিনি 'মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ। মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী'। তিনি সকলের মা তাই তিনি 'প্রসন্নবদনা বাধিলাম্বিকা'। তিনি 'সর্বদেবশরীরেভ্যঃ বলেই

সকলের মা হতে পেরেছেন।' 'সমস্তদেবানাং তেজোরাশিং সমুদ্ভবম্' বলেই তিনি সকলের। সকলের মধ্যে—সমস্তদেবের—তিনি বিবিধ রূপে, বিবিধ বৃত্তিতে—বিরুদ্ধ বৃত্তিতেও—চড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রণাম মন্ত্রে তাঁর সর্বভূতের মধ্যের প্রকাশ বিচ্ছুরিত হয়েছে। বিরুদ্ধ রূপসহ তাঁর সর্বাত্মিকা রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর প্রণাম মন্ত্রে—মুমুক্ষুর মতই বার বার উচ্চারণ করে অবগাহন করি সেই সর্বাত্মিকা রূপের মধ্যে—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।
কল্যাণ্যৈ প্রণতাং বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ॥
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ।
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দেবী-
স্থিতা সর্বেষু সকলা জগৎসু
যস্যৈকা পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্য পরাপরোক্তিঃ॥'

শক্তির এই সর্বাত্মিকা রূপ শ্রীশ্রীদুর্গাকে জানাতে বলি কেন? আমার মা আমাকে ভালবাসেন, তোমার মা তোমাকে ভালবাসেন—বিশ্বের এই শক্তিময়ী যে সকলকে ভালবাসেন—তাই তিনি অভয়দাত্রী। ঘৃণা বিদ্বেষ ভয় হীনমন্যতা প্রভৃতি প্রভৃতি অনেক কিছুর অধিকারী মানুষের মন নামক বস্তুটী। এই সব কিছু থেকে হেঁচাই পেতে পারি তখনই যখন আমি ভালবাসি—প্রেমেই মুক্তি আনন্দ ও স্থিতি; তাছাড়া আর কিছুতে আমাকে অভয়ও দেবে না, আনন্দও দেবে না, স্থিতিও দেবে না। ছোট্ট শিশুর কাছে তার মা যতই বড় হোক তার কোন ভয় নেই ভাবনা নেই, কেননা এ বোধ তার স্বতঃসিদ্ধ যে ঐ মা আর আমি এক। মায়ের সঙ্গের এই অদ্বৈতবোধই তার নির্ভয়তা, তার নিশ্চিন্ত শান্তি দান করে। এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে কতটুকু আমি। কী আমার ক্ষমতা? এক ফুৎকারে নিভে যায় সবৈশ্বর্য নিয়ে গর্বিত জীবন-প্রদীপ! কিছু করবার থাকে কি? কিন্তু এতবড় সত্যকে মেনে নিয়েই এ কথা সত্য যে যখনই বিরাটকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে পারি, ভালবাসার বিহ্বলতা দিয়ে তাকে জড়াই, তখনই 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম' লাভ করি। সংসারের সবত্রই এ কথা সত্য। যেখানে প্রেম, ভালবাসার অদ্বৈততা-বোধ নেই, নেই প্রাণখোলা পারস্পরিকতা—সেখানের মানুষে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে মুক্তি সোয়াস্তি আনন্দ অভয়—কিছুই পাওয়া যায় না। সেখানে মানুষ মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত হয়ে কোনমতে দিন কাটায়। কিন্তু যখনই কোথাও প্রেমের অদ্বৈততা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই অসুয়া কাটে, ঘৃণা ভয় বিদ্বেষ হীনমন্যতা প্রভৃতি কাটে—সত্য বিশ্বের আনন্দের ধারি হয় না। মানুষ যেহেতু হৃদয়বান, তাকে অপর কোন হৃদয়ে স্থান পেতে হবে, তাই বিশ্ব-শক্তিকে মা বলে বোধ করে তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা। এ যে কত বড় মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা তা মনস্তত্ত্ববিদেরা বুঝবেন। যতক্ষণ মানুষের হৃদয় তৃপ্ত না হয়, ততক্ষণ মানুষ

বহুবিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পায় না। অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাধান প্রাপ্ত হলেই মানুষ স্বস্তি পায়, শান্তি পায়। বিশ্ব-শক্তিকে বিরাট বলে ভয় করে চললে দ্বন্দ্ব আমার কোনমতেই ঘুচতো না। মা বলতে পেরে বেঁচে গেলাম। আরও আছে তিনি তো শুধু আমার মা নন, তাই আমারই অধীনও নন। সেইখানে তাঁর সীমার আছে। আরও কথা হল আমি যতক্ষণ একলা ততক্ষণ আমার সীমিত শক্তি, ঠিক একটি বড়র সঙ্গে যখন আমি সমাকররূপে মিলিত হই, তখন ঐ সীমিত শক্তিসম্পন্ন আমার মধ্যেই অসীমের প্রবেশ ও প্রকাশ অনির্বচনীয়ভাবে সত্য হয়ে ওঠে। তখন আমি নির্ভয় হই, শান্ত হই, তৃপ্ত হই। তাই সেই শক্তিময়ীকে মা বলি। আরও বাকি আছে। এর পর তাঁর সঙ্গের অদ্বৈততা বোধকে যখন বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে অনুভব করি তখনই নির্ভয়তা তৃপ্তি ও শান্তি বাস্তবের মধ্যে রূপ লাভ করে।

দৈনন্দিনতা নিয়ে ব্যস্ত মানুষ যিনি আমার অতীত সত্তা, তাঁকে আমার মধ্যে অনুধ্যান করবার সময় সুযোগ আমার নিত্যকার কাজের হিসাবের মধ্যে সংকুচিত থাকে তাতে মন ভরে না—তাই বিশেষ দিনে তাঁর পূজার রীতি। বর্ষ ক্লান্ত মানুষের কাছে শরৎ উপস্থিত হয় তার ঝরঝরে আকাশের নীলের নীচে স্নিগ্ধ প্রশান্তি নিয়ে। সেই সময়ে নবান্নের সুবাস মাকে আহ্বান করা হয়—মাটি আর আকাশের জল তখন শুকিয়েছে, নদী তখনও ভরা—চাঁদের আলোয় তখন মাধুর্য ঝরে। তেমনই দিনে সর্বভূতাত্মিকা এই মায়ের পূজায় সকলের ডাক পড়ে—এমন একটা সামাজিক উৎসবের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করতে পারলে এই জাতীয় উৎসব জাতির জীবনের একটা মহৎ লাভ। সকলকে ডাকা হয়—কিন্তু বর্ণাশ্রম কাঠামোর ছোট বড়র, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদবাদের কঙ্কাল-প্রোত ভেতরে ভেতরে আজও চলে। সে ভেদ-চিন্তা আজকের দিনে ভেঙে দিতে হবে মায়ের স্বরূপের সঙ্গে মিল রেখে। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের অনেক উচ্চ শ্রেণীর চিন্তায় পড়তে পড়তে অনেক কুসংস্কার, অনেক ক্ষুদ্রতা বাসা বেঁধে ফেলেছে। আজ তাকে দার্শনিক ভাবে বিদূরিত করতে হবে।

সাধক মাতৃশক্তিকে তিন দিনে তিন ভাবে দেখে পূজো করেছেন। মায়ের কাছে সাধক সৃষ্টি-শক্তি প্রার্থনা করেছেন। সব ভেঙে চুরে নূতন করে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র-জীবনকে গড়বার প্রয়োজন যুগে যুগে অনুভূত হয়েই। তাই নূতন সৃষ্টির কৌশল, নূতন করে সৃষ্টি করবার শক্তি সাধক এই বিশ্বময়ী শক্তিময়ীর কাছে শিখতে চাইছেন। নূতন সৃষ্টি করতে অতীতের অনেক মুণ্ড কুণ্ড ভুলতে হয় —তারই নাম মধু ও কৈটভ-বধ। আজকের মুখে মায়ের যে মূর্তি তা মহাকালীরূপা। দ্বিতীয় দিনে বিচ্ছিন্নতার অসুর মহিষাসুরকে বধ করে সঙ্ঘবদ্ধতার সাধনা শিখে মহালক্ষ্মীরূপা মায়ের কাছে। তৃতীয় দিনে নিজের সৃষ্টিকে ভোগ করবার প্রবৃত্তিরূপ শুম্ভনিশুম্ভ অসুর দুজনকে বধ করে সৃষ্টিকে সর্বভূতের কল্যাণে নিয়োজিত করা মহাসরস্বতী রূপা মায়ের জ্ঞান-সাধনায়। নূতন সৃষ্টির জন্য পুরাতন দীর্ঘ অভ্যাসের ভালো মন্দকে বিস্মৃত হওয়া যেমন সহজ নয়, সহজ নয় যেমন নূতনকে প্রাণভরে গ্রহণ করা, তেমনি একলায় সৃষ্টির সত্যিকারের কল্যাণ আসবে না—তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে সর্বদেব-

শরীরজ মায়ের ধ্যানে সকলের জন্ম সৃষ্টি-বিচ্ছিন্নতাই পাপ, বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু—ব্যক্তিরও, সমাজেরও, রাষ্ট্রেরও। সকলের দ্বারা সকলের জন্য নূতন সমাজ রাষ্ট্র যখন ব্যক্তিকে সুস্থ করল, তখনই সাবধান হতে হবে সে সৃষ্টিকে ব্যক্তিগত ভোগে লাগানোর সনাতন প্রবৃত্তি থেকে সাধকের এই খানে আর একবার পরীক্ষা। ব্যক্তিগত ভোগলিপ্সা-রূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় করে সৃষ্টিকে সর্বভূতায় ছড়িয়ে দিয়ে ধরে যাতে কোনমতেই তা কেন্দ্রীভূত না হতে পারে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পশ্চাতের এতখানি কথা যদি মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে পারি, তাহলে দুর্গাপূজা তত্ত্বের মহত্ত্বে ও বাস্তবের আনন্দোৎসবে অপরূপ হয়ে উঠত। কিন্তু তা তো হচ্ছে না—বর্তমানের মানুষগুলি এত হাল্কা হয়ে গেছে—গভীর ব্যাপক কথা শুনতে বুঝতে তার একটা যাকে বলে অনীহা, তা এত প্রবল যে তাকে যে করে জীবনের সবকিছুকে নূতনভাবে ভেবে দেখতে শেখানো যাবে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবু আমাদের পূজাপার্বণগুলির যেগুলির পশ্চাতে এমন সামগ্রিক তত্ত্ব ও প্রেরণা রয়েছে, সেগুলিকে নূতন রূপে নূতন মূল্যে যদি সমাজ-চেতনায় তুলে ধরবার অনলস প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে নূতন যুগের ভোরে একদিন তার ফল দেখা দেবে বৈকি। ফুলঝোর যেমন ভাঙ্গব, তেমনি বড় বড় পূজা অনুষ্ঠানের পশ্চাতে নূতন যুগের চিন্তাধারা পাওয়া যায় কিনা তাও খুব ভেবে দেখব নিশ্চয়। শ্রীশ্রীদুর্গাতত্ত্ব অতিশয় ব্যাপক ও গভীর। সেই স্নেহময়ী মহা শক্তি ভক্তিময়ী মাতাকে তাঁর সর্বাত্মকরূপের মধ্যে অবগাহন করিয়ে নিন, আজ দুর্গাপূজার দিনে এই প্রার্থনা করি।

সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জ প্রশান্ত পাষাণ

—শ্রী নিখিল রঞ্জন রায়

ভুবনেশ্বরের মন্দির দর্শন করে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন—

"উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। যেন বুঝিলাম এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে, সে কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত থাকিয়া, মূক থাকিয়া, হৃদয়ে আরও যেন বেশি করিয়া আঘাত করে। ভক্ত হৃদয়ের কবি মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন; এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টি গোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের হৃদয় এখানে কী কথা গাঁথিয়াছে? ভক্তি কী রহস্য

প্রকাশ করিয়াছে? মানুষ অনন্তের জন্য হইতে আপন অন্তঃকরণে এমন কী পাইয়াছিল যাহার প্রকাশের প্রবল চেষ্টায় এই শৈলসমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে!"

মেয়েপুরুষ সৌখীন ট্যুরিস্টরা কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ায়, তার যখন তখন ফটো তুলে নেয়। তাদের দেখা চোখের দেখাও নয়, ক্যামেরার লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখা সেই ছবি দেখে আমরা কতোটুকু বা তাহিক করি। কিন্তু আমরা কি দেখি! শুধু মন্দিরের বাইরের খোলসটা। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বহতী শিল্প-সৃষ্টির নিগূঢ় সৌন্দর্য উপলব্ধি করার যোগ্যতা আছে কয় জনের!

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন মহাবলবর পল্লব রাজারা। স্কুলপাঠ্য ভারতেতিহাসের পাতায় পল্লবদের নাম থাকলেও তাঁদের বল-বিক্রম ও কীর্তি কলাপের বিশদ কাহিনীর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অথচ পল্লবরা ছিলেন সমাগরা সাম্রাজ্যের অধিপতি, অশেষ পরাক্রমশালী, নৌবলে বলীয়ান এবং সর্বোপরি সাহিত্য ও শিল্প কলার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। পল্লব রাজ্যের প্রধান সমুদ্র-বন্দর মহাবলীপুরম্ বা মামল্লপুরম্ নানা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন বুকে নিয়ে আজও শিল্পরসিকের বিস্ময় উৎপাদন করছে। মহাবলীপুরমের ইতিহাস আজ বিস্মৃতপ্রায়। তার পূর্ব সমৃদ্ধি ও গৌরব আজ ধূসর অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত। নিষ্ফল ক্রোশে অনন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ নিরন্তর জলসঙ্গীতের মর্মর প্রাচীরে মাথা কুটছে। আজ সেখানে পুণ্যলোভীর ভিড় নেই, নেই সমুদ্রগামী জাহাজের সমারোহ, নেই সার্থবাহ, বণিক ব্যবসায়ীর আনাগোনা, লেনদেন। আছে শুধু সৌখীন পর্যটকদের ব্যস্তসমস্তভাবে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা। মহাবলীপুরম্ থেকে অনধিক চল্লিশ মাইল দূরেই পল্লবদের একদা রাজধানী বিখ্যাত কাঞ্চীপুরম্ তাদের সপ্ততীর্থের অন্যতম।

অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী,
হরিদ্বার, উজ্জয়িনী দ্বারকা—কতই যাত্রি।

স্বর্ণপুরী কাঞ্চী—দক্ষিণাপথের বারাণসী মন্দিরময় পুণ্যতীর্থ। পল্লব সম্রাট দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মন, মহেন্দ্র বর্মন ও মামল্ল নরসিংহ বর্মণের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সময়ে সহস্রাধিক মন্দির নির্মিত হয়েছিল সে-সব ছোট বড় মন্দিরের অনেকগুলিই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শুধু আছে গুটিকো চল্লিশেক শৈবপৌঠ শক্তি ও বৈষ্ণব সাধনার মহাবন্ধান পীঠ কাঞ্চীপুরম্, শৈব মন্দির কৈলাসনাথ, বিষ্ণুমন্দির বৈকুণ্ঠনাথ পেরুমল যেন ধর্ম সমন্বয়ের শান্তিবাণী ঘোষণা করছে ধর্মে ধর্মে কোন বিদ্বেষ বা বিরোধ নেই। পূজার্থীরা উভয় মন্দিরেই কুলচন্দনে অর্ঘ্য নিবেদন করে একই দেবতার পায়, যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির গাত্রে পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষের ছবিও উৎকীর্ণ আছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো দীর্ঘ দিন ধরে। যুদ্ধে হারজিৎ যারি হোক না কেন, শিল্পের ট্র্যাডিশন কিন্তু চলত অব্যাহত। বিজয়ী চালুক্যেরা পল্লবদের অনুসৃত শিল্প কর্মের ধারা এতটুকু ব্যাহত হতে দেন নি। অনেক অসমাপ্ত মেটলের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে বিজয়ী চালুক্যদের আনুকূল্যে। একাম্বরনাথের মন্দির এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় সৌধ। পল্লব...

বিশিষ্ট গোপুরটি উচ্চতায় প্রায় ছশো ফীট। সুদর্শন স্থাপত্যে এই গোপুর সারা দেহ সুশোভিত। আর আছে ভরদ্বাজ স্বামীর মন্দিরের একশো ফীট উঁচু সমুন্নত চূড়া। বিমানচূড়াটি নানা বৃক্ষখচিত মর্মর স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের মূল মণ্ডপ।

মন্দিরের বহির্গাত্রের অনুপম শিল্প সৌন্দর্যের মতোই মনোরম তার অন্তর্সজ্জা। অগণিত দৃশ্যে চন্দিত্রপাত্র অলঙ্কৃত। চিত্রগুলির পরিকল্পনা ও রচনায় শিল্পীর নিপুণতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু যে অসাধারণ শিল্পীর গভীর সাধনায় এই অতুলনীয় শিল্পকর্ম তাঁর নাম বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। এই বিরাট শিল্প-যজ্ঞের যিনি বা যাঁরা ছিলেন হোতা তাঁদের কোন কথাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু ইতিহাস নীরব হলেও প্রবাদ বচনের সৌরভে তাঁরা আজও বহুজনস্মৃত। হোয়ার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ। যে নিষ্ঠা, প্রতিভা ও সাধনার সমন্বয়ে এই অনন্ত শিল্প স্রষ্টাগণ কাঞ্চীপুর, তাঞ্জোর, তিরুপতি ইত্যাদি স্থানের দেবদেউলগুলির অলঙ্করণ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি আজও প্রচলিত।

"রাজার নির্দেশে শিল্পী রচিছে দেউল কাঞ্চীপুরে, পরশে তাহার শিলা পায় প্রাণ কারুকাজ-প্রায় ফুরে!" কাঞ্চী-নরেশ দ্বিতীয় নরসীবর্মনের ঔদ্যোগে বিরাট বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির নির্মীয়মান। প্রধান শিল্পী গুণরাজ সাধকপ্রবর গুণী। তাঁরই তত্ত্বাবধানে চলেছে মন্দিরের নির্মাণ ও অলঙ্করণ কার্য। প্রভাতের অরুণালোকের স্পর্শে যেমন মুদিত কমল-কলিকার লজ্জাজড়িত ওষ্ঠাধর ধীরে ধীরে, স্নিগ্ধ হাস্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি শিল্প-সম্রাট গুণরাজের সুনিপুণ হাতের স্পর্শে ধীরে ধীরে একের পর এক কঠোর কর্কশ পাথরের বুকে ফুটে উঠতে থাকে বিচিত্র সুন্দর মূর্তিগুলি।

একান্ত নিভৃত কর্মশালায় শিল্পী হাতুড়ি ও ছেনী হাতে তন্ময় চিত্তে তাঁর কাজ করে চলেছেন। সেই কর্মশালায় কারুর প্রবেশাধিকার নেই কেবল স্বয়ং সম্রাট ও শিল্পীর প্রিয় শিষ্য একজন ছাড়া। দিনরাত কোন দিক দিয়ে কি ভাবে কেটে যাচ্ছে শিল্পীর কোন হুঁশ নেই। নিবিড় ক্লান্তিহীন কর্মের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী গুণরাজ অন্যমনস্কে দৃষ্টি না ফিরিয়েই পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। প্রিয় শিষ্য একজন পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকে প্রতি নিহত হাতে নিয়ে পান তাম্বুলের করঙ্ক। গুরুর প্রসারিত করপুটে পান তাম্বুল তুলে দেওয়াই তার কাজ। এই ভাবেই কাটছে প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন। একদিন ঘটল সেই নিশ্চিন্ত কর্মগুহায় একটু ব্যতিক্রম। কলাটের স্বেদ মুক্ত করতে গিয়ে শিল্পীর ছেনী হঠাৎ হাত কয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল! ছেনীটি ভূতল থেকে তুলবার প্রয়াসে পেছন ফিরে তাকালেন শিল্পী। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাম্বুলকরঙ্কবাহী শিষ্য কোথায়। এ যে স্বয়ং কাঞ্চী-নরেশ তাম্বুলকরঙ্ক হাতে দাঁড়িয়ে! স্তব্ধে বিস্ময়ে হতবাক গুণরাজ। নত শিরে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন সম্রাটের কাছে। অজান্তে তত অপরাধই না করেছেন মহামহিম রাজাধিরাজের কাছে! কাঞ্চী-নরেশ শিল্পীকে সাদর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন, "গুণি, আমি যে তোমার কাজে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে গেছি। যখন তুমি তোমার একনিষ্ঠ সাধনায় ব্যস্ত তখন তোর পাওনি যখন আমি এসেছিলাম।

আমারি ইঙ্গিতে তোমার শিষ্য আমার হাতে পানের ডিবাটি দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। তিন দিন তিন রাত একঠায় দাঁড়িয়ে মুক্ত ভক্তের মতোই তোমার হাতে পান তাম্বুল তুলে দিয়ে আমি ধন্য হয়েছি। হে মহান্ শিল্পী, তপস্বী, তুমি পুরস্কার প্রার্থনা কর। সম্রাটের মহানুভবতা ও গুণগ্রাহিতার কৃতার্থ শিল্পী নিবেদন করলেন, মহারাজ, আপনার প্রেমাশিসই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আপনার উদার প্রীতি চির অম্লান হয়ে থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

"শিল্পীর রাজা গুণী গুণরাজ খটিক শিল্পের কবি, পুষ্পিয়া উঠে কঠিন পাষাণ পরশ তাঁহার লভি

শ্রীকান্তের অন্নদাদিদি প্রসঙ্গে

—শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী

পশু-পালন সভ্যতার ধনোর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়া পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত জন-মানসের মর্মমূলে সুদৃঢ় শিকড় স্থাপন করিল। সুদীর্ঘ কালের আত্মকেন্দ্রিকতায় তাহার অন্তরাত্মায় যে পুঞ্জীভূত গ্লানি জমিয়া উঠে, যে সকল মনীষা তাহার বিরুদ্ধে তাঁর মন বাক্য সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় অন্যতম। সেই হইতে শুরু করিয়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি চিরৈতসী চিন্তাবিদ্‌গণ বিভিন্ন দিক হইতে উক্ত গ্লানির প্রতি কটাক্ষ করেন। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যে মানুষটি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তাঁহার সর্ব উচ্চ আসনখানি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। যে চরিত্রটি লইয়া এই আলোচনার অবতারণা তাহা তাঁহারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'র অন্নদাদিদি। এই চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কোথাও যদি লেখকের প্রতি অভিযোগ করিতে হয় তাহা হইলে সে অপরাধ লেখকেরই কাহার আগে এমন একজন লেখকের সৃষ্ট চরিত্র লইয়া আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি যিনি নারীর প্রতি পুরুষের কোন অত্যাচারের সহিত কোনদিন আপোষ করেন নাই। তাঁহারই সৃষ্ট অন্যান্য চরিত্রের উপস্থাপনায় অন্নদাদিদির চরিত্র বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইব।

একটি অঞ্চল পরিবেশে অন্নদাদিদির সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। একটি পর্ণ কুটিরে মাত্র দুইটি মানুষ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি। পর্ণ কুটিরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা-গোছের লোক প্রবল কাশির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোট বড় মালা। গায়ের জামা এবং পরণের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং এক প্রকার হলদে রঙে ছোপানো ...সে সাপুড়ে।...ইন্দ্র তাহাকে শ্রীকান্তজী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, তার

তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া, আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল এবং প্রস্তুত হইলে সাহজী সেই কলিকার উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে আশঙ্কায় নাকে মুখে হাত কয়েকটা চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, দিয়ো।··· ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন ঘরের বারান্দায় আসিয়া পড়িল, তখন সে মোড় ফিরিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, কেমন ইন্দ্রনাথ, কি বুঝেচ বলত? ইন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ঠকিয়ে এত দিন টাকা নিচ্ছিলে, তার জবাব দাও। সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে? ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐ স্তব্ধ নদীটির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে। তোমার কাণাকড়ির বিদ্যে নেই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যেবাদী চোর সাহজীর চোখ দুটা সরু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।···কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই সাহজীর কণ্ঠস্বর আমার কানে আসিল—কেন বলনি? আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ চারদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আর্তস্বর নিকটের আঁধার কুটির হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল। অনেক বিলম্বে যখন কোনমতে সাহজীর বাড়ির প্রাঙ্গনের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি সেই প্রাঙ্গনেরই এক প্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে শুরু-শিষ্যের হীরামত মজবুত বাঁধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।··· বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। কম্বলের প্রথমে নজরে পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড় আমা শুদ্ধ ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপমারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরেছে যে লাঠিটায় আমাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ইন্দ্র কহিল, কি বেমক্কা হারাম শয়তান এই ব্যাটা। বাবার কত টাকা যে চুরি করে একে দিয়েছি, তারও হয়তো দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত।··· সেই দিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে খুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে।··· দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া সাহজীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।' ইহার পরবর্তী অধ্যায় অতি সংক্ষিপ্ত। সাহজীর জীবনলীলার সমাপ্তি, তাহার সমাধি, অন্নদাদিদির বৈধব্য ও নিরুদ্দেশ। কাজেই আমাদের আলোচনার শেষ আশ্রয় দিদির অহস্ত-লিখিত একখানি মাত্র চিঠি।

"শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের

আশীর্বাদ করিতেছি শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব কিন্তু আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিতো না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নিরস্ত করিতো। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয় কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই তো তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পারিতাম অথচ কেন যে বলি নাই, বলি-বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা আবার তাও ভাল কথা নয়। এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্ব জন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তর্বিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোনমতেই বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অভয়া। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, কারণ এই লেখাটুকুর শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন—ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুষ্কর্ম কেন করিয়াছিলেন, তাঁহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক, বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়? এ লজ্জা কি মর্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল কিন্তু স্বামী হইয়া সে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির যায় নাই। যাক্ সে কথা। তার পরে পাঁচ বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁহাকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা; তবুও একদিন গভীর রাত্রে, খিড়কির দ্বার খুলিয়া স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল সবাই জানিল, অভয়া কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে! এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্ম প্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম, তিনি কোনমতেই

ঁার সন্তানবতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা ছাড়া আমি আবার মুসলমানী।.... তোমাদের দিদি অন্নদা।"

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের মুখে শুনিতে পাই মর্মান্তিক আক্ষেপ—"ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মিনীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি।..... কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এত বড় বিড়ম্বনা বরাদ্দ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এত বড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে, সমাজ সংসার সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। একেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা সাবিত্রী সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ মা আত্মীয়-স্বজন শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া?..... হায় রে, কোথায় তাঁহার এই সব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যেখানে যত দূরেই হউক, এ দেশের বাহিরে হইলেও হয়তো এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এ তোমাদের অন্নদা। এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে ঝুলতাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকাল বেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।"

অন্নদাদিদির চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের উপরোক্ত আক্ষেপের মধ্য হইতে একটি প্রশ্ন স্বতঃই জাগিয়া উঠে যে লেখক অন্নদাদিদির চরিত্রের মধ্য দিয়া আমাদের কি কথা বলিতে চাহিয়াছেন? যদি তিনি সতী-ধর্মের অবগান বাসনায় উক্ত চরিত্রের অবতারণা করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা একটি প্রতর্কের বিষয়। কারণ সীতা রামের সাহচর্যেই বনগমন করিয়া অশেষ দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে পারেন, সাবিত্রী সত্যবানের জন্যই যম রাজার পিছনে পিছনে জীবন পণ করিতে পারেন এবং শিব অর্থাৎ মঙ্গলের মহিমা প্রচারে অবলীলায় সতী পারেন আত্মাহুতি দিতে। তাই বলিয়া একমাত্র স্বামীদের বন্ধনকেই শিরোধার্য করিয়া একজন নীচ, লম্পট মানুষের সহিত নিজের মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে যে সতী-ধর্মের কোন্ মহান আদর্শ নিহিত আছে তাহা চিন্তাশীল চেতনার অতীত। যে স্বামী সাত বৎসর পূর্বে বড় শ্যালিকার সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া অথবা অবৈধ সম্পর্কদ্বারা দণ্ডিত হইয়া জানাজানির ভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়া নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, সেই স্বামীকেই একান্ত করিয়া অন্নদার মত শিক্ষিতা, বীরা, স্থিরা নারীর বিনা প্রতিবাদে গৃহত্যাগ করা যে কোন্ উচ্চ আদর্শকে বহন করে তাহা ভাবিবার বিষয়। অন্নদা যে স্বামী কর্তৃক কোন অমানুষিক অত্যাচারের ভয়ে ঐ পথকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা অন্ততঃ তাহার চিঠি হইতে প্রকাশ পায় নাই বা

লেখকও অনুরূপ ইঙ্গিত দেন নাই। তাহার সৃষ্টি হইতে যেটুকু জানিতে পারি তাহা হইল—"এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি।" কিন্তু যেহেতু শ্রীকান্ত তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা সেই হেতু তাঁহার মন্তব্যকেও পরিণত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। আর সেই কারণেই আমাদের প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে। ইহা যদি রমা, শ্যামা জাতীয় মানুষের রচনা হইত তাহা হইলে কেবল মাত্র সুরপাঠ্য বলিয়াই মানিয়া লইতে দ্বিধা থাকিত না। একই ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করিয়া অন্ন চরিত্র সম্বন্ধে তিনি অন্য রূপ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার রচনার মধ্যেই দেখিতে পাই। তাঁহারই রচিত শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বের অভয়ার স্বামী পরিত্যক্ত। অভয়ার স্বামীও লম্পট, নীচ এবং অন্য স্ত্রীতে বর্তমান। সে অবস্থায় অসহায় অভয়া প্রতিবেশী রোহিনীদাকে লইয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত স্বামীর খোঁজে। সেই অভয়া যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর সন্ধান পায় নাই বা তাহার হীনমন্যতার বিন্দুমাত্র পরিচয় পায় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তান সতীনের ঘর করিতেও তাহার আপত্তি নাই শুধুমাত্র স্বামী বাঁচিয়া থাকিলেই যথেষ্ট। "আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হল। ...আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করব।" অথচ সেই অভয়া যখন স্বামীর সন্ধান পাইয়া তাহার ঘর করার পরিবর্তে চাবুক খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া রোহিনীকেই জীবনের সব সঙ্গী করিয়া চলিতে সংকল্প করিল তখন লেখকের মুখেই শুনিতে পাই—"সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল মুহূর্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এমনিই বটে। সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্ত মাংস আছে যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিও না আবার যে নীচ, লম্পট স্বামীর সহিত অভয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় লেখক কোনও কটাক্ষ করেন নাই পরন্তু সতী নারী সহধর্মিণীর কার্য করিয়াছে বলিয়া সতী ধর্মের জয় কীর্তন করিয়াছেন তাঁহাকেই যখন অভয়ার স্বামী সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে শুনি—পতি নারীর দেবতা—তাহার ইহকাল-পরকাল; সবই জানি কিন্তু, এই মূর্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার সমস্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক, সে সুশ্রী এবং মার্জিতরুচি ভদ্র মহিলা, কিন্তু এই মহিলাটা যে বর্মার কোন্ পতীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা যে দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই জানেন।" আবার "লোকটার প্রতি চাহিবা মাত্রই সর্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল।"

একই ঘটনার অবতারণায় দুই ভিন্ন সুরকে কোন ক্রমেই মিলাইতে পারা যায় না সেখানে মেলে তাহা হইল সংস্কার। সেই সংস্কারের মধ্য হইতে যে সুরটি ঝঙ্কারিত হয় তাহা হইল উভয় ক্ষেত্রেই স্বামীকে মানিয়া লইবার মত একটি সহজ

প্রাণ-বায়ু, যে প্রাণ নারী-জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কিন্তু সে প্রাণ তো স্বামী-গৃহ হইতে প্রত্যাগত অভয়ার কম ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না। যদি প্রাণ-প্রাচুর্যই না থাকিত তাহা হইলে একজন পর পুরুষকে বিশ্বাস করিয়া অপরিচিত বসামুলুকে আসিবার সাহস অভয়া পাইত কোথায়? সব জানিয়া শুনিয়াও সতীনের ঘর মানিয়া লইল কি করিয়া? সর্বোপরি রোহিণীর জীবনে প্রাণের বন্যা আসিল কোথা হইতে? রোহিণী সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য—"যদিচ তাঁহার গায়ের জামা কাপড় ছেঁড়া জীর্ণতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে—ইহার হোত্রে মাথায় একটা ছাতি পর্যন্ত নাই, কিন্তু আহার দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিতেছেন, সে দিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই-বাছাইয়ের অবধি নাই। হাঙ্গামা ও পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে।……

ঐ যে শীর্ণ লোকটি হেঁসুনের রাজপথ দিয়া একরাশ মোট হাতে লইয়া শতছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃকপাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে আমাকাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই আকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে।" যাহাতে প্রাণ নাই তাহা প্রাণে মেশে না। অথচ ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয় শরৎচন্দ্রের মত একজন এতবড় প্রাণ-প্রধান মানুষ শাহ্‌জীর মত একটি গাঁজাখোর দুশ্চরিত্র নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ, খুনীকে অন্নদাদিদির মত একজন স্নেহশীলা, প্রাণবতী মানুষের নিছিদায়ে মানিয়া লওয়াকে কেমন করিয়া বরদাস্ত করিলেন? কেমন করিয়া হজম করিলেন? সে কি শুধু সাত পাকে বাঁধার চিরকালীন সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইয়া? তাই যদি হয় তাহা হইলে অভয়া যখন বলে—"স্বামী যখন শুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেয়, তার সঙ্গেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা… তিনিও তো আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে তো এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ বলে আমারি উপরে?…… যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেছে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারা জীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারী-জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না?……
…একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্মেই এ

অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?' তখন তিনি তার মৃদু-উচ্চ প্রতিবাদে না করিয়া মৌন হইয়া থাকেন কি করিয়া? ইহার তাৎপর্য একটা কথা খুবই পরিষ্কার যে অভয়ার যুক্তির কাছে তাঁহার স্বভাব মানসিকতা প্রতিবাদ করিতে পারে না। কারণ আগেই বলিয়াছি কোন অন্যায়ের সহিত কোনদিন তিনি আপোষ করেন নাই। অথচ অন্নদা দিদির জীবনকে ঘিরিয়া কেন যে তিনি এমন দুর্বল তাহা আমাদের বিচার বুদ্ধির সহিত মেলে না। অন্নদা দিদির প্রসঙ্গে তিনি অভয়াকে বলিয়াছেন "দুঃখের ইতিহাসে এঁদের কারুর স্থানই আপনার নীচে নয় তাহাতেই কি সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়? দুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া স্বামীর অন্যায় বোধের অতীত হইলেই যে সে চরিত্র অভ্রান্ত বা আদর্শ চরিত্র তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইবে কেমন করিয়া? স্বামী নিরুদ্দেশ হইবার পরে যে সাত বৎসর অন্নদা দিদি পিতৃগৃহে নিদারুণ দুঃখের মধ্যে ছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার হয়তো বা সান্ত্বনা ছিল যে তিনি তাঁহার স্বামীর কদর্যতার সঙ্গী হয়েন নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত বাহির হইয়া গিয়া তাঁহার দুঃখ কি দ্বিগুণ বা তাহার বেশী পরিমাণ বাড়িয়া যায় নাই? প্রথমতঃ একটি সর্বপ্রকারে কলঙ্কিত চরিত্রের সহিত প্রতি মুহূর্ত বাস করা অন্নদাদিদির মত একটি চরিত্রের পক্ষে অসহনীয়; দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্য দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া সমস্ত সম্ভাবনার অপচয় এবং আত্ম-অবমাননার বিকারে আত্ম প্রত্যয়ের অবলুপ্তি; তৃতীয়তঃ সমাজ-সংসার, আত্মীয়-স্বজন হইতে নির্বাসিত হইয়া সহজ সরল জীবনের হত্যাসাধন এবং সর্বোপরি সর্ব প্রাণী কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া প্রতি মুহূর্তের আত্ম-নিপীড়ণ। এই যে ঘোরতর বাস্তব দুঃখ তাহা অন্নদাদিদির জীবনে কোন্ বিশিষ্টতা দান করিয়াছে? বয়স্ক সূক্ষ্ম দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিচারে ইহা তাঁহাকে আমাদের হৃদয় হইতে বহু দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে; ইহা দ্বারা তাঁহার সতীত্বকে উজ্জ্বল করিতে পারে নাই। সতীত্ব কথাটি একটি আপেক্ষিক সত্য। যে দেশ-কাল পরিবেশে যাহা সতীত্বের গৌরব লাভ করে তাহা অন্য দেশ-কাল -পরিবেশে অবান্তর হইতে পারে যে সতীদাহ প্রথা একদিন নারীর অহংকারের বিষয় ছিল, তাহাই একদিন রামমোহন রায়ের মত মানুষের কাছে পাশবিকতার নামান্তরে পর্যবসিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে, তাহার ধ্বংসে তাঁহাকে জীবন-পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। শেষ প্রশ্ন উপন্যাসে কমলের মুখ হইতেও লেখক এ কথাকে স্বীকার করিয়াছেন। "সতী স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল,—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজে সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে"।

অতএব ঐ সতীত্বকে জিয়াইয়া রাখিবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা দেহ মনের বিকার ছাড়া আর কি হইতে পারে? স্বামী হইল স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ অথচ সেই অঙ্গ যখন অপর অঙ্গের কোন কাজে লাগে না পরন্তু বিরক্তির কারণ এবং অসহনীয় যন্ত্রণার কারণ হয় তখন তাহাকে না ফিরা বহিয়া বেড়াইতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? "দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে নিয়ে কাজ করাতে গেলেই সবচেয়ে বেশী বাজে" (শেষ প্রশ্ন)।

তথাপি যেহেতু একদিন মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা কোন একটি ঘটনাকে স্বীকার করা হইয়াছে সুতরাং সহস্র প্রকার অত্যাচারের মধ্যেও তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে ইহা ভদ্রতার লক্ষণ। প্রয়োজনে তাহাকে ভাঙিয়া নূতন জীবন-যাত্রার পথের সন্ধান করিতেই হইবে। কেবলমাত্র অনুষ্ঠানের জোরেই জীবনযাত্রার নতুন পথ ও পরিবেশকে অস্বীকার করা কখনই জীবনের প্রগতি হইতে পারে না।

"একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার অবাধগতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না" (শেষ প্রশ্ন)। মনের বন্ধন হইতে অন্তরের বন্ধনই হইল বড় বন্ধন, সত্য বন্ধন। সে বন্ধন যে দিন অন্নদাদিদির ছিন্ন হইয়াছে সেইদিনই তাঁহার বোঝা উচিত ছিল এ জীবনে তাহার স্বামীর কাছ হইতে লাভ করিবার অবশিষ্ট কিছুই নাই। যাহা আছে তাহা শুধু দেহ। স্বামী নায়ক প্রিয়-জীবনের পূজায় যে বিশুদ্ধ দেহ নারীর সমস্ত রক্ষিত, তাহা অন্তরের বিশুদ্ধতা ও মমতার দ্বারা পরিস্নাত হইতে বাধ্য। নতুবা তাহা দ্বারা দেহদান চলিতে পারে কিন্তু পূজা পরবাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের যে সমাজ নারীর অন্তরকে কোনদিন মূল্য দিল না—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' বলিয়া যাহারা নারীর জীবনে আনিল নিদারুণ অপমানের গ্লানি, সেই অন্ধ সংস্কারকেই সর্বস্ব করিয়া যখন অন্নদাদিদি খিড়কির দ্বার দিয়া সকলের অলক্ষ্যে স্বামীর সহিত নিরুদ্দেশ হয় তখন কি চিন্তাশীল হৃদয় মর্মান্তিক বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠে না? লেখকের হৃদয়কেও কি এই সত্য কম আলোড়িত করিয়াছে? তাহা না হইলে শেষ প্রশ্নের কমলের মুখ হইতে তুমি কেন—"একদিন যারা বলেছিল নর-নারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্ছে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাসে, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল বেশী, কিন্তু যারা ঘোষণা করে-ছিল, পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন, তারা মেয়ে-দের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয় নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল, এবং সেই অসত্যের পরেই ভিত পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হলো না।" সত্যেই দুঃখের আজিও কিনারা হয় নাই। আজিও সংসারের বহু স্ত্রী তাহার তথাকথিত সতীত্বটুকু রক্ষা করিতে ব্যস্ততা জীবনে প্রতিনিয়ত মানসিক বিক্ষোভের শত সহস্র পাঁজর আবর্ত সৃষ্টি করিয়াও দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সংসারে স্বামীর সহধর্মিনীর আসনটুকু বজায় রাখিতেছে। যেখানে স্বামী সেটুকু ছাড়া স্বামীর কাছ হইতে তাহার আর কিছুই পাইবার নাই সেখানেও তাহারা যে সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর অন্তর্দশা ঘুচাইয়া কোন সুবৃহৎ আত্মিক মুক্তি লাভ করিবে সে মেরুদণ্ডটুকু পর্যন্ত তাহাদের ভাঙিয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারা যাইবে না যে,—"সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, তার বেশী নয়, ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেদিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি" (শেষ প্রশ্ন)। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ট্র্যাজিডির কথা জানিয়া শুনিয়াও তাহারা ইহাকে কাটাইয়া উঠিতে পারে না। অন্ধ সংস্কার তাহাদের এমন করিয়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, স্বামীর অপরাধকেও তাহারা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইয়া সেই স্বামীর

সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কাঠ কুড়াইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া পাঁচজনের পরসা যোগাড় করিয়া দেয় এবং পরিবর্তে স্বামীর লাথির ঘায়ে মূর্ছা গিয়াও স্বামীর শারীরিক বা মানসিক কষ্টে বেদনা বোধ করে। এমন নারীর সংখ্যা আজিও বিরল নয় যে, মাতাল স্বামী-দ্বারা প্রহৃত হইয়া প্রতিবেশীর নিকট বাঁচাও বাঁচাও বলিয়া আবেদন করে কিন্তু প্রতিবেশীরা বাঁচাইতে গেলে স্বামীর পক্ষ লইয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রেণী বা কৃষ্টি-বিভাগে কখনই তাহারা অন্নদাদিদির সমগোত্রীয় নয়। আর সেই কারণেই লেখকের প্রতি আমাদের সব চাইতে বড় অভিযোগ অন্নদাদিদির মত এমন একটি অমূল্য চরিত্রকে ঐ সঙ্কলনের সহিত নির্বিবাদে মিলাইয়া দিয়া আমাদের এমন করিয়া নিরাশ করিলেন কেন? অমন একটি চরিত্র হইতে তিনি তো শাহ্‌জীর মত সমাজ-চরিত্রের প্রতি আরও বড় রকমের আঘাত হানিতে পারিতেন। তাহাতে আর যাহাই হউক সারা জীবন অন্নদা-দিদিকে এমন করিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হইত না। আর যদি তিনি বলেন যে, ইহা তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র নয়, প্রত্যক্ষ চরিত্র, যেমনটি দেখিয়াছেন তেমনটি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা হইলেও আমাদের বক্তব্য এ চরিত্র আমাদের কাছে তথ্যের কথায় উপস্থা দিবার চরিত্র নয়। তিনি স্বামী-পরিত্যক্তা হউন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ চরিত্রকে মহান করিয়া সতীধর্মের আদর্শ কীর্তনে সীতা, সাবিত্রী, সতীর সহিত অন্নদাদিদিকে একাসনে স্থাপন করা আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯৪৫

শ্রীনিতাগোপালের সহজ জীবন ও সহজ দর্শন লইয়াই আমি আজ এসেছি, অসহায় বুদ্ধিমান মানুষ 'সহজে'র মাধুর্য বুঝিবে কি করিয়া? তাহারা হয় উঠা (ascent) নয় নামা বুঝে। কিন্তু জীবন যে উঠা-নামার সমন্বয়, কোনও এক বিশেষ পথে কোন এক সময়েই চলে না, এ সংসারটাই যে curved space-এর দেশ, এখানে কিছুই যে সরল রেখায় চলে না, সরল রেখায় চলিলে যে সৃষ্টি closed circle-এ পরিণত হইত, মুক্তিরই পথ নিরুদ্ধ হইত, চক্রাকারে আটকাইয়া গিয়া মানুষ পড়িত, তাহা কে মনগড়া যুক্তি করিতে পারে? অথচ এই পথেই প্রবেশ সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়াছে ইহা তাহাদের সাধুগণ হইয়া গিয়াছে পাশ্চাত্যের প্রাণের এ দেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, ভূত-সৃষ্টিকে গ্রাসও করিয়াছে, কিন্তু ইস্ত্রিয়বর্গ ও আধিকারিকদের বদলাইতে পারিতেছে না চলিতেছে আধিকারিক-দের ঘাঁটি আগলাইয়া যারে যাহারা তাঁহাদের

সঙ্গে লড়াই, vested interest-ওয়ালাদের সঙ্গে লড়াই। 'প্রত্যন্তবাসী' হইয়াদের আধিকারিক-দের রক্তে আনিতে হইবে, ইহার বরণ তাহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। যাহারা জড় দর্শনের আমলে আধিকারিক (bureaucratic) ছিল ও আছে, তাহাদের সঙ্গেই তো নিত্যগোপালের লড়াই, কাজেই আমাকেও লড়াইতে হৃদয় দ্বারাই জয় করিতে হইবে। 'জড়' যাহাদের কাছে একটা 'commodity', তাহারা এই বৈশ্যবৃত্তি সহজে ছাড়িবে কেন? ইহাতে যে তাহাদের অস্তিত্ব হইয়াই টান পড়ে সত্যকে চায়? যুগের দিকে চাহিয়া সভার নব রূপের খোঁজ কে রাখিবে? সকালেই ঘড়ঘড়িকা হোতে আসিয়া চলিয়াছে ঠাকুর, ঠাকুর, তুমি প্রকাশিত হও স্ব মহিমায়, স্ব মহত্বে হেথা প্রিয়তাহ, হাইটাস' হিন্দি, যুগান্তর ও আনন্দবাজারে যায়। আগামী রবিবারে সীতা-জয়ন্তীর বিজ্ঞাপন পড়িবার দিয়া আসে। অজিত একবার একটু আসিয়া চলিয়া যায়। সারা দিনে আর আসে না। উপনিষদের অধীত ছাত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের পাদ (প্রাক্-কথা) আজ পাঠ করি। খুব ভাল হয় গেছে ঠাকুর নিজের ধ্যান নিজে করিবেন কে তাঁর ধ্যান করিবে তিনি নিজে ছাড়া। আমিও নিজের লেখা নিজে পড়ি। কে আমার লেখা পড়িবার জন্য বসিয়া আছে? আমিই পড়িয়া যাই ১১।০টার পর জ্যোতিঃপ্রকাশ ও তাহার এক বন্ধু আসে। ২৩শে ডিসেম্বর

মানুষকে 'আত্মবান' হওয়ারূপ ফলসিদ্ধির কথা শুনানো হইয়াছে বলিয়া কেহ প্রথমে process-এর মধ্য দিয়া তাহা পাইতে চাহে নাই, 'নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ নিষ্যোগক্ষেম' হয় নাই। আমার শরণাগত হইয়া আমার সেবার জন্য কেহ পড়িয়া থাকে নাই। তাহাদের ফলসিদ্ধি আমার কাছে আসিয়া কতখানি হইয়াছে বা হইতেছে, ইহাই দিনের পর দিন হিসাব করিত। সত্য বটে, প্রাণ খুলিয়া আমার জীবনে জীবন মিলাইয়া আমার সেবায় লাগিয়া থাকিলেই সব সহজ সম্ভব ও অতি অল্প সময়ে হইত, কিন্তু সকলেরই যে ফলাকাঙ্ক্ষা পাইয়া বসে। এখানে আসা শুধু আমার সেবার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নয়— ইহা জানিয়া যে আসিবে, তাহারই সংসার-জীবনে শ্রীর প্রতিষ্ঠা আসিবে সে তো তাহার সংসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিতে পারিবে না, উহা আসিবে আমার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া। আমাকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া কেমন করিয়া সে নিজের প্রতিষ্ঠা-ভূমি পাইবে? কর করিবার আদর্শ দিয়াছি, কিন্তু 'মুক্তি'রই ঘন আস্বাদন যে কর্ম— আমার এই বাণী তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তাহারা আমার জীবনে যুক্ত না হইয়াই কর্মের জন্য ছুটিতে চায়। অজিতেরও তো তাহাই হইয়াছে। সে আমার সেবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। সে তাহার পূর্বের প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। গিনি মাসেদন হইতে ২৫০৲ টাকার চেক নিয়া আসে। অজিত আজ সারা দিন আসিল না। সংসার করিয়া কি সবই এই রকম? সেই গত শনিবার প্রণবের অনুরোধে কলকা তাহার আশ্রমে নিত্যগোপাল-প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আসি। আজ দেখা নাই। ইহা কি রকম? কোনও ছন্দবোধ কি চালচলনে কথাবার্তায় থাকিবে না? ইহার মধ্যে কেমন করিয়া থাকি? কোথায়ই বা

যাইব? ঠাকুরের দর্শন ও জীবন লইয়া গর্জন করিয়া উঠিব তাহারও তো সাধ্যি নাই। বিদ্যা-গোপাল-দর্শন বুঝিবার মত কয়েকটী প্রাণও নাই। 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থ বেণু বৈকালে ও সন্ধ্যার পর পাঠ করে। রামচন্দ্রপুরের শচীন গুহ চৌধুরী দুটাকা পরিকল্পনা বাবদ দিয়া যায় সে দিন চাহিয়াছিলাম। ১৪শে ডিসেম্বর

গীতাজয়ন্তী: অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী। ঠাকুর, তুমিই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপে আজিকার মত শুক্লা একাদশী তিথিতে কুরুক্ষেত্র বুকে দাঁড়াইয়া শ্রীগীতাবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলে গীতার যে নূতন অর্থ নূতনরূপে আমার কাছে প্রকট করিয়াছ, উহাই তো সত্য বলিয়া মনে হয় অন্যেরা যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, সবই মনের স্থূলে দাঁড়াইয়া দেখা আমার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে প্রাণের প্রেমের ভাষ্য—সবসময়ময়ী। গীতার প্রকাশ-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র, সর্ববিধ জটিল কুটিল সমস্যার উদ্ভব ক্ষেত্র। গীতা আরণ্যক উপনিষদ নহে, গীতা যুদ্ধক্ষেত্রের উপনিষৎ অর্জুন চাহিয়াছিলেন 'to shrink from fact' তুমি তাহা দিলে না প্রত্যক্ষ ঘটনার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাকে এতদিনকার ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে, ধ্যান যোগের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া তুমি অদ্ভুত গীতা প্রচার করিলে। 'No two facts are incompatible.' যুদ্ধ ও ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ চলিবে। কি তাহার দর্শন? তাহাই তো প্রাণে প্রাণে আমাকে শিখাইলে। সেদিন শ্রীগৌররূপে যেভাবে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া স্বধর্মাচরণ হইতে সুরু করিয়া সর্বসাধ্যসার 'প্রেমে' আসিয়া পৌঁছিয়া ছিলে, এবার তাহা হইতেও গভীরতর রূপে 'প্রেমের' ছবি আঁকিয়া দিলে। 'Love is static, helpfulness and service is dynamic.'—এই মহা সত্য লক্ষ্য করিয়া প্রেমের সঙ্গে জ্ঞানের, প্রেমের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় করিলে। কর্মহীন জ্ঞান বা প্রেম static গীতার মূল প্রতিপাদ্যও তো তাই। আমাকে এই গীতাতত্ত্ব দিয়া বিপদে ফেলিয়াছ। ইহার তো প্রচলিত ব্যাখ্যাধারার সঙ্গে তাদৃশ মিল নাই। তুমি বলে ইহা প্রচার কর গীতার অর্থে গোপার জন্ম সার্থক হউক। শান্তিনিকেতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত সর্দার পাণ্ডিকরের মনোজ্ঞ বক্তৃতা সকালে আনন্দবাজার ও যুগান্তর হইতে পাঠ করি। একটী অমৃতবাজারও কিনিয়া আনি। 'চন্দু পরিমল ও নীপু ওটার আসে। বহু লোক হয় রামকৃষ্ণ-মতবাদের শ্রোতা কেহ কেহ আসেন। বিশ্বনাথ মণ্ডল, হাজেনদা, বিলাসবাবু, লক্ষিতবাবু, দেবানন্দ; নূতন লোকও আসেন। পাণ্ডিকরের বক্তৃতা পাঠ হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা হয় ৭-১৫ পর্যন্ত অথচ আজও সাহানির আসিল না। জ্ঞানিবাবু মাখনবাবু আসেন। হরিপদ আসিয়াছিল ১১টার পর।... মঠ হইতে গোপা ও বেণু প্রচুর ফুল আনে। ১৫ই ডিসেম্বর

প্রাকৃতিক নিয়মে, স্বাভাবিক-ভাবে পূর্বে ঘটনা ঘটিয়া যায়, পরে তাহাকে হজম করিবার উপযোগী দর্শন আসে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা আসার পরে জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, একান্নবর্তী পরিবার নষ্ট হওয়া, মেয়েদের হাস্তার বাহির হওয়া, নগরের উপর ঝোঁক, civil marriage প্রভৃতি আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ এইগুলি প্রচলিত ভারতীয় সভ্যতার বিরোধী। মানুষ এই dualism

লইয়া বেশ চলিতেছে। তারতীয়েরা দাঁড়াইয়া আছে বর্তমানে, অথচ সে দর্শনে ও স্মৃতিতে রহিয়াছে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া। স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মোত্তরের মহিমা, গীতাপাঠ হইতে ফুটবল খেলার শ্রেষ্ঠত্ব, আগামী ৫০ বৎসরে দেশমাতৃকার পূজার কথা বলিয়া যে বহুলস্তীর ঘোষণা করিয়াছেন, পাশ্চিত্যের বক্তৃতায় তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। তিনি দার্শনিক কাঠামো বদলাইতে পারেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হিসাবে শ্রীবিভাগোপাল-শ্রীচরণাশ্রিত দাস আমি তাহা করিয়াছি। East-West-এর synthesis চাই-ই। শ্রীকৃষ্ণ এই সমন্বয়-মূর্তি। কিছুতেই পাশ্চাত্যকে ভারতীয় জীবন হইতে বহিষ্কার করা যাইবে না, তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে বর্তমান যুগে বিভাগোপাল ছাড়া দ্বিতীয় কেহ নাই যে এইখানে পথ দেখাইবে ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড transition-এর মধ্য দিয়া যাইতেছে যতদিন না একটা দার্শনিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, ততদিন পাশ্চিত্যের প্রভৃতির বক্তৃতা থেকেও থাকিবে। যেমন বিবেকানন্দের বক্তৃতা আসিয়া গিয়াছে—উহা এখন মাত্র পুঁথিগত হইয়াছে ওজস্বলভারত এই কাজ হাতে নিয়াছে শ্রীবিভাগোপাল, তোমার দর্শন ও জীবন আমরা লাভ করিব। অজিত সারাদিন আসে নাই। প্রণব আসে ১১।-টার পর। প্রায় ১ ঘণ্টা থাকে। তাহার অর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আসিবে বলিল। ২৬ শে ডিসেম্বর

সৎ (Being) ভাবাত্মক ও অসৎ (Non-Being) অভাবাত্মক অসতের সাধনা, অভাবের সাধনা সতের বা ভাবের সঙ্গে সমন্বিত না হইলে, ভাবের সাধনার আসে অহংকার, বিকৃতি, পরস্পরধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতা। নঞ্-এর সাধনা ও আকারের সাধনা সমন্বিত সাধনাই নিরাকারের সাধনা। 'না'-এর সাধনার উপর ভিত্তি করিলেই হাঁ-এর সাধনা হয় নির্বিকার। 'Negation is the foundation of all determinateness'—হেগেল। 'না'-এর সাধনা করা হইতেছে না বলিয়াই 'আকার' লইয়া, 'রূপ' লইয়া এত দলাদলি। 'না'-এর সাধনা অন্তর 'আকার' সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-র ফাঁকে ফাঁকে থাকিলে সব আকারই নির্গুণ হইত, সব রূপই নির্গুণ হইত প্রতি আকারেই নিরাকারের ঘন আস্বাদন সর্ব আকার সমন্বয়ই নিরাকার প্রতিটী আকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'না'-ভাবটী, অসৎ ভাবটী, রস-ভাবটী গুপ্ত রহিয়াছে। অসৎ-এর বুকে সতের প্রকাশ, 'অসতো সৎ জায়তে'—ইহাই সত্য। রসের সাগরে ভাব জন্ম লইতেছে যে সব শিশু খেলাধূলি করে, তাহারা পিতামাতা বা গুরুজনদের নিশ্চিন্ত ভালবাসার উপর দাঁড়াইয়াই করিতে সুযোগ পায় যদি তাহারা টের পায় যে তাহাদের পায়ের নীচ হইতে স্নেহ-ভূমি (Being) সরিয়া গিয়া non-being হয়, তখনই তাহাদের মাথা ঠাণ্ডা হয় মিনু পুদির। লিখিয়া বুঝিতেছে ও লিখিতেছে, 'তোমরাই আমার একমাত্র আশ্রয়'। ইহা ঠিক ঠিক বুঝিলে সকল লাফালাফির অবসান হইত। গোপার জন্যও এই সাধনার প্রয়োজন আছে রেণু বাহ্ক, প্রিয়িয়ার, বাকলী, চাকেশ্বরী, স্টু, ভার্ড কটো, হিন্দুস্থান হইয়া সন্ধ্যায় ফেরে। অজিত আজও আসিল না। ২৭ শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তুমি মূর্তিমান প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমন্বয়-মূর্তি। সংবাদ পাত্রিকায় সেদিন ২৪শে ডিসেম্বর তোমারই আগমন-বার্তা, নূতন এক কৃষ্টির আগমনের কথা শুনাইয়াছেন প্রতীচ্য মহারথ। এদেশের উপর cultural conquest করিতে চাহিয়াছিল, অনেক দানি করিয়া ছিলও। কিন্তু তোমার কৃপায় হঠাৎ পট পরিবর্তন হইল, এ-দেশ স্বরাজ লাভ করিল, কৃষ্টি-বিজয়কে প্রতিরোধ করিবার পথ পাইল। যে সঙ্ঘর্ষ দুর্যোধন ও অর্জুনে, সেই একই সঙ্ঘর্ষ প্রতীচ্য ও প্রাচ্যে। যুদ্ধের ফলে যেকুসলাশ, সনাতন ধর্মলোপ, খ্রীষ্টানের দুষ্টা হওয়ার আশঙ্কা অর্জুন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে দুর্যোধনের রাজত্বে। অর্জুন শুধু fact হইতে shrink করিতে ছিলেন, fact কে face করিতে সাহসী হইতে ছিলেন না। পাশ্চাত্যের আগমনে ভারতের সনাতন ঐতিহ্য, কুল, নারীদের পূর্বের গৌরব কিছু আছে কি? একান্নবর্তী পরিবার নাই, সিভিল বিবাহ আইন-সিদ্ধ, জড়বাদের কাছে সনাতনের মূল্য কি? অর্জুন সনাতন ধর্ম অনুসরণ করিয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেও চাহিয়াছিলেন। ইহা কি poverty-র পূজা নয়? 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ', 'মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্', 'কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে ...ধনজনযৌবন' ইত্যাদি বাণী কি এদেশকে দারিদ্র্যের পূজা শেখায় নাই এবং ইহার পরিণাম স্বরূপই কি এ দেশ উৎকট লোভের দাস হয় নাই? পাত্রিকার ঘটনার গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সমস্যার 'উপর উপর' দেখিয়াছেন বলিয়া স্পষ্ট হইয়া সমাধান ফুটিয়া উঠে নাই। তাই সমালোচনা করার সুযোগ লোক পাইয়াছে। ঠাকুর, তুমি স্পষ্ট করিয়া সব বল। রেণু ও আমি মন্মথবাবুর বাসায় গিয়া আমার উইল ও কবালা রেজিষ্ট্রারী করিয়া দিবার সম্বন্ধে আলোচনা করি। মন্মথবাবু প্রথমে ট্রাস্টী সমূহ করার কথা বলেন, কিন্তু উহার সম্ভাবনা না থাকায় রেণুকেই একমাত্র ট্রাস্টী করার কথা বলেন। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, উহার ফল ভাল হইবে না। রেণু প্রস্তুত নয়। নীরেন চৌধুরী, জিতেন কুমারী, সত্যব্রত, রেণু-প্রতিভা, চিনু, নীনু, মন্তুর কথা মনে হয়। কিছুই ঠিক হয় নাই পূর্বে মন্মথ, নীনু ও রেণুর আবেগ দিয়া রেখে। পরে ওখানে গিয়া সাত্ত্বা হয় স্থির করা যাইবে। রেণু পি সাত্ত্বার ওখানে যায় তোমার কাজ আগাইয়া দিবার জন্য কেহই কি নাই? প্রতিভা ভট্টার পর মঠে কাল ১৩ই বাবার জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দবাবা অনুষ্ঠিত উৎসবের তত্ত্বাবধানে কুটিতে যায়। অজিত আজও অনুপস্থিত ২৮শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও সমাজ-ব্যবস্থা এমন করিয়া ভারতীয় অজড়বাদ ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিজয় লাভ করিয়াছে যে ইহাকে পরিপাক করিয়া অঙ্গীভূত করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। এই বিজয় সর্বক্ষেত্রে এ দেশের হাড়ে মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে কতটুকু আর পাত্রিকার উদ্ঘাটন করিয়াছেন? এক স্বামী থাকিতে মেয়েরা অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়াছে, ইহার ২টি দৃষ্টান্ত তো আমাদেরই জানা আছে। মামাতো-পিসতুত ভাই বোনে বিবাহ হইতেছে প্রতি-লোম বিবাহ তো হরদম চলিতেছে কোনও ব্যক্তি বিশেষই তো ইহার জন্য দায়ী নয়। ইহা না অনুমোদন করে প্রাচীন স্মৃতি, না করে

ভাবনীয় সংবিধান। একটা উদার ও যুক্তিসঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থা যদি স্থাপিত না হয়, এত বিকৃতি সমাজ কতদিন সহ্য করিতে পারিবে? আনন্দ-বাজার বলিতেছে, পানিক্করের ভারত-বর্ণনা 'কার্টুন' মাত্র, প্রকৃত নয়। আমার মনে হয় বর্তমান সমাজ-চিত্রে পানিক্করের চিত্রের চেয়ে আরও বীভৎস। উহাও অনেকখানি আড়াল করিয়া ভদ্র ভাষায় বলা হইয়াছে। এখনও এদেশের সমাজ-পতি ও পত্রিকাওয়ালারা 'ঢাক ঢাক' ধ্বনি করিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে রোগের বীভৎসতা। ঢাকিতেও ইহারা সঙ্কুচিত হয়। অথচ রোগ-নিরাকরণের জন্য চুল-চেরা diagonesis হওয়া দরকার। পানিক্কর কোনও পথের খবর দিতে পারেন নাই তিনি রোগের নিদানও জানেন না। তিনি বাহিরের কতকগুলি symptom দিয়াছেন শ্রীনিতাগোপাল একমাত্র বৈদ্য যিনি রোগের নিদান ও ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। সেই ঔষধ হইতেছে 'ভাঙাভেড় সমন্বয়-দর্শন' ও তদনুযায়ী সমাজ সংগঠন। আমি সভাস্থলে মঠে যাই। ১৩ই পৌষ দাদার জন্মদিন। শ্যামসুন্দরানন্দের সঙ্গে নিতাইবাবু ও ঠাকুরের কথা হয়।... প্রণব আসে ১২।টায়।... রেণু প্রেমে যায়। মনুজেশ্বর বাবুর বাসায় তাঁহার সঙ্গে ও তাঁহার এক বন্ধুর সঙ্গে ২ ঘণ্টা আমাদের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে। উহাতেই খুব খুশী হইয়াছে। নীলুর পোস্টকার্ড আসিয়াছে।... প্রায় ১১ টায় ধীরেন আসে। তাহার জ্বর হইয়াছিল।...২২শে ডিসেম্বর

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মহাপ্রভু-রায় রামানন্দ-সম্বাদে যে 'আগে কহ আর'-প্রক্রিয়া অনুসৃত হইয়াছে, তাহা মায়াবাদের 'নেতি নেতি' বিচার প্রক্রিয়ার অনুরূপ। একটা প্রোপথে, দ্বিতীয়টী অবরোহপথে, দুই-ই static ভাবে পৌঁছাইয়া দিবে। নির্বিশেষ প্রেম বা নির্বিশেষ জ্ঞান দুই-ই ভাবুকতার সৃষ্টি করে, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। ইহাদের কাছে মায়া তুচ্ছ, জ্ঞান বা প্রেম-দ্বারা বিনাশ্য। কিন্তু বস্তু তো মায়া-ব্রহ্ম সমন্বিত। শ্রীনিতাগোপাল ইহার মূর্তিমান প্রতিবাদ। 'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু-ভক্তি হয়'—রায় রামানন্দের এই কথা অর্থদ্যোতক। যাহাতে 'বিষ্ণু-ভক্তি' হয়, তাহা সিঁড়ির নিম্নতম ধাপ হইবে কেন? বিষ্ণু-ভক্তির 'আগে' কি আছে? বিষ্ণু-ভক্তিই তো চরম ও পরম। তবে কি এখানে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের মধ্যে তরতম বিভাগ করা হইয়াছে? বিষ্ণু-ভক্তির আগে কি আবার কহিবার থাকিতে পারে? বিষ্ণু-ভক্তির চেয়েও কি কর্মত্যাগ 'আগের' বস্তু? শ্রীনিতাগোপাল 'ভক্তিযোগদর্শনে' ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে মায়াবাদের বিরুদ্ধে মহাপ্রভুর অভিযান, তথায়ে সেই মায়াবাদই আবার আসিয়া পড়িল। 'কৃষ্ণকে বাহির না করিবে ব্রজ হইতে'—এখানেও মায়াবাদ রহিয়াছে। মনে হয় মহাপ্রভুর প্রাণ-ধর্মকে গোস্বামীগণ বর্ণাশ্রমের চাঁদে ঢাকিয়া পরিবেশন করিয়াছেন বলিয়া উহা সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর সাধন-দ্বারা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিয়াছে, দুই-ই-নৈষ্কর্ম্যবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী লিখিলেন, 'ভক্তি জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতা'। শ্রীজীব আরও পাঁচ কদিয়া দিলেন; বলিলেন, 'জ্ঞান-কর্মাদি শূন্য'। ঠিক মায়াবাদ! শ্রীনিতাগোপাল তাই না এই অবরুদ্ধ প্রেম-সাধনাকে পুনঃপ্রবর্তিত করিতে আসিলেন এবং লিখিলেন নিজ শ্রীহস্তে 'ভক্তিযোগদর্শন'? এবার তাহাতেও উপর লিখিবার ভার রাখিলেন না, পাছে তেউ বিকৃত (distort) করে। শ্রীনিতাগোপাল অন্তর্যুক্ত হইল। ১ টায় পত্র

অমরেশ আসে .. খেজুরী পাটালী গুড় আনে বেণু যুগান্তরে যায়, সেখানে কুপতি সেন আসেন বনোয়ারীলাল আশ্রমের অর্থের 'আবেদনটা' যুগান্তরে ছাপিবার জন্য দিয়া আসে। বৈকালে মিনুর দাদা যৌদি আসে। সেবানন্দ আসে এবার আর অবনী-প্রতাপ নিতাগোপাল বন্ধের অভ্যর্থনায় এখানে আসে নাই, চিঠি দিয়াই সারিয়াছে। শুনিলাম, আমাকে গতবার মত সম্মান দিবার জন্য তাহারা তৈরি হইয়াছিল। এবং অবনী-প্রতাপ না পাওয়া ক্ষমা চাহিয়াছে। আমি জীবন লইয়া চলিব। কাহারও সঙ্গে বিরোধ আমার নাই নিতাগোপাল আমার জীবনের সবকিছু এই তো ধর্মাপত্তিভায়া চিঠি দিয়াছে আর গ্রাহক থাকিবে না বলিয়া। কি আর করিব? চলিয়াছ, চলিব। ৩০ শে ডিসেম্বর

ঠাকুর, তোমাকে লইয়া তোমার ভক্তেরা যাহা করিয়াছেন, তাহাকে তোমার লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি বলিব? কোথায় তোমার জীবন, কোথায় তোমার দর্শন? তুমি তো কাহারও ব্যবহারিক জীবনে আসিলে না? তুমি রহিয়াছ জীবনের বাহিরে। কোথায় তোমার জগন্নাথ রূপ? বিশ্বনাথী কাহার জীবনে তোমার সাক্ষাৎ প্রভাব পতিত হইল? দীক্ষার ভিতর দিয়া তোমার সম্প্রদায়ের লোক বাড়িতেছে, কিন্তু তাহারা কি 'জীবন' লাভ করিল? কোন কিছু গড়িল? সেই মৃত, সেই মৃত। আমি শুধু জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। মরিতে দুঃখ নাই। আর কিছুই যখন করিতে পারিলাম না, বাঁচিয়া আর কি দরকার? কিন্তু তোমায় যে স্থান করিতে পারিলাম না, 'কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব,' তাই মরা হইল না। তোমাকে কাহারও কাছে রাখিয়া যাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্ত মরিতে পারিতাম। মরিয়াও তো সুখ নাই।... কত কথাই তুমি বিলাইছ। কাহার জন্য? কে নিবে? প্রাণের স্তরের স্পর্শ না হইলে অন্তরিক্ষের নীচ হইতে জীবের উপরে উঠা (ascent) ও অতিমানসের ঊর্ধ্ব হইতে নীচে নামার মিল হয় না। অধঃ কিছুতেই ঊর্ধ্বে ওঠে না, অধাই থাকিয়া যায় যদি তাহা প্রাণ-স্পর্শ না করে ঊর্ধ্ব ও ঊর্ধ্বে থাকিয়া যায় কিছুতেই অধে নামিতে পারে না যদি তাহা প্রাণের চুম্বন না পায় অধঃ ও ঊর্ধ্ব যে পরস্পর প্রাণ ছাড়া কে উহাদের যোগ ঘটাইবে? প্রাণই দেশে কালে মন বুদ্ধির মনেরই বিভাগ ঊর্ধ্ব-অধঃ, পূর্ব-অপর। উহা কালের অধীন। প্রাণ নিতাগোপাল, তোমার জন্য হউক আমার সর্বচিত্তবৃত্তিতে। ডাক্তার ডাকিতে দিয়া যাও। ময়মনসিংহের কলেজের 'প্রিন্সিপাল কুমুদবাবুর স্ত্রী বেণুর সঙ্গে প্রাইভেট করা (তাহার জীবনের দুর্বলতার কাহিনী) বলিতে আসেন বেণু ২ টাকা দেয় সন্ধ্যার পর যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন, ১ ঘণ্টার উপর থাকেন। কর্পোরেশনের শ্যামল দত্ত 'গোপী গীতা' শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরে পাঠ করিতেছে। সর্বত্র নাকি চিঠি দিয়াছে। কলিকাতার লোক কি যে হইয়া গেল! এই ক্ষেত্রে বেশ রস আছে বোধহয় ২ পয়সা করিয়া লওয়া সহজ। সকালে বেড়াবার বাহির হইয়া একটু দূরে ছিলাম ঠাকুর, আমার দেহ প্রাণ মন, বেচা সুখ শান্তি, আশা নিরাশা তোমাকে কেন্দ্র করিয়া চলুক। আমি সর্বতোভাবে তোমার হইব। জয় নিতাগোপাল। ৩১ শে ডিসেম্বর

সুফীজম্ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ

জনাব রেজাউল করীম

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন যে ধর্মের দুটো দিক আছে—বাহিরের দিক আর ভিতরের দিক বাহিরের দিকটা বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক আর ভিতরের দিকটা হল ভক্তি ও আনন্দের দিক। আমরা জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে বুঝতে চাই। তাই এল শাস্ত্র, তন্ত্র, আচার বিচার, অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ড। কিন্তু যখন হৃদয় দিয়ে আনন্দ দিয়ে ধর্মকে বুঝতে চাই তখনই তাকে সহিতায় জানা হবে সুফী মতবাদ বা মরমী মতবাদ হৃদয় দিয়ে আনন্দ দিয়ে প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে চায়। তাই এই মতে আচার ও ক্রিয়া কাণ্ডের স্থান নাই বা খুব কম। সুফী মতবাদ ও বৈষ্ণব মতবাদ কতকটা একই রূপ।

সুফী মতবাদ সম্বন্ধে নানা জনে নানা রূপ মত পোষণ করেন। কারুর মত 'সুফী' শব্দটা আরবী "সাফা" ধাতু থেকে এসেছে। সাফা শব্দের অর্থ পরিষ্কার আমরা যেমন কাপড়চোপড় পরিষ্কার করি, সেইরূপ অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা মনকেও পরিষ্কার করতে হবে সুফীগণ এই মন পরিষ্কারের দিকেই অধিকতর আগ্রহ দেখান। তাই তাঁরা "সুফী"। আবার সুফী কথাটার আর এক প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। অতীত কালে বহু বিশুদ্ধ মুসলিম সমাজের বাইরে থেকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ লোকের নিকট থেকে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মধ্যযুগে খৃষ্টান সমাজেও এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হত যেমন ডিকটাইন মঙ্ক (Monk)—সুফীরাও ছিলেন কতকটা সেইরূপ। আর এক প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে, সেটাও উল্লেখ করা দরকার। এই মতানুসারে সুফী কথাটা এসেছে আরবী 'সুফ' শব্দ থেকে। "সুফ" শব্দের অর্থ পশম প্রাথমিক যুগের সুফীগণ পশমের জামা পরিধান করে সংসার থেকে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতেন। এইভাবে ধর্মচর্চা করে জীবন অতিবাহিত করতেন সুফী অর্থাৎ পশম বস্ত্র পরিধানকারী সাধুগণ সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হতেন। সেই থেকে তাঁদের সাধারণ নাম দেওয়া হয় 'সুফী'। শব্দটার ধাতুগত অর্থ যাই হোক না কেন প্রথম যুগের সুফীগণ ছিলেন সাধক ও সৎ ব্যক্তি। তাঁরা সংসারের বাইরে থাকতেন, ধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মের কোন প্রকার গোঁড়ামী ছিল না। আবার ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার বিদ্রোহ ভাবও তাঁরা পোষণ করতেন না। তাঁরা সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শকে স্বীকার করতেন। সকল দেশের সুফীগণ সমন্বয়বাদী ছিলেন।

হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ ধর্ম নিয়ে চিন্তা করে আসছে। এই চিন্তা কখনও তাকে নিয়ে গিয়েছে ক্রিয়াকাণ্ডের দিকে, আবার কোন কোন মানুষকে নিয়ে গিয়েছে আরও গভীরে আরও আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে। তাকে বলেছে মিষ্টিক বা মরমী। ধর্মের অন্তরালে ও মর্ম মূলে প্রবেশ করাই হল মিষ্টিসিজমের অর্থাৎ সুফী মতবাদের

সার কথা। বস্তুত সুফী মতবাদ মানুষের মিষ্টিক জ্ঞানের একটা অভেদন ফুরণ। সেজন্য সুফীগণ কোনদিন ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর কোন গুরুত্ব দেন না। তাঁরা ধর্মের মর্মগত সার সত্যের উপর বিশেষ জোর দেন। সুফী মনসুর হল্লাজ যখন ঘোষণা করলেন—'আমিই ঈশ্বর বা সোঽহং' তখন ধর্মান্ধ সমাজ তাঁকে সহ্য করল না তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে হত্যা করল। আজ তিনি মহর্ষি মনসুর। এইভাবে তিনি আত্মবলিদান করে সুফী মতবাদের আদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাতে প্রচলিত সোঽহং তত্ত্বের সহিত মহর্ষি মনসুরের তত্ত্বের একটা মৌলিক ঐক্য আছে।

পৃথিবীর যেখানেই মুসলমানগণ ধর্ম বিস্তার করেছে, সেইখানেই শরীয়তী ইসলামের পাশেই সুফী মতবাদ দানা বেঁধেছে। আরব, পারস্য আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে সুফী মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। পাঠানগণ ও মোগলগণ যখন এদেশে বসতি বিস্তার করলেন, তখন তাঁদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সুফী মতবাদও সমাজে প্রচলিত হ'ল. এই সুফীরাই হিন্দুদের সহিত মিলন ভ্রাতৃত্ব ও সদ্ভাবের বাণী প্রচার করেছিলেন। খাজা মৈনুদ্দিন চিশতি, নেজামুদ্দিন আওলিয়া প্রমুখ সুফীগণ ভারতে অধ্যাত্মধর্ম প্রচার করেছিলেন। মহর্ষি দারমদ, সাবক দারা শিকোহ তাঁরাও সুফী মতবাদের ভক্ত ছিলেন।

কি ভাবে বাঙ্গলাদেশে সুফী মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল, এবার সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলব। বঙ্গদেশে তুর্কি বিজয়ের পূর্ব থেকেই বহু বৈদেশিক মুসলমান সুফী গ্রামাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এইসব সুফীগণ ধর্মের উদার আদর্শ ও ও সাধনতত্ত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। এই সব সুফীগণ সাধারণতঃ মুর্শেদী সুফী ও আওলিয়া সুফী বলে অভিহিত হ'তেন যাঁরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে উদারধর্ম প্রচার করতেন তাঁদের অনেকেই সুফী মতাবলম্বী ছিলেন তাঁরা এদেশে এসে ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে বেদান্ত ও তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত পরিচিত হলেন। সুতরাং এদেশের সুফী মতবাদের সহিত ভারতীয় দর্শনের একটা সমন্বয় হতে লাগল এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এ দেশের সুফী মতবাদের উপর বেদান্ত দর্শনের অনেকটা প্রভাব পড়েছে। ক্রিয়া কলাপ, সাধনার জন্য বিশেষ ধরণের আসনের ব্যবস্থা, ওঁকার ও ওঁকারাত্মক ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে জিগির ও ধ্যান সম্বন্ধে একই রূপ ধারণা এইসব প্রমাণ করে যে উভয় দর্শনের মধ্যে বেশ একটা সমন্বয় হয়েছে।

আরবের মুসলমানগণ সেমিটিক জাতির অন্তর্গত আর পারস্যের মুসলমানগণ আর্যজাতি সম্ভূত। সেমিটিক আচার নিষ্ঠার বিরুদ্ধে পারসিক আর্য-মনের প্রতিক্রিয়া হতে তাহাদের সুফী মতবাদ পুষ্টিলাভ করেছে। "সবং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মতবাদ তাহাদের আদর্শ। এই মতবাদই এক শ্রেণীর সুফী সাধক-মনকে প্রেরণা দান করেছে এই শ্রেণীর সুফীগণ মিষ্টিক বা মরমী কবি। তাঁরা ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের ধার ধারতেন না। তাঁরা প্রেম ও ধর্ম এই দুইটিকে এক করে দেখতেন। তাই দেখা যায় যে সুফীদের সহিত এ দেশের হিন্দু যোগী সাধু সন্ত ও মরমী সাধকদের একটা মূলগত ঐক্যভাব আছে। মহাত্মা চৈতন্যের যুগ থেকেই বাংলা দেশে সুফী প্রভাব বিস্তার লাভ করতে

থাকে। সুফীদের মধ্যে দরবেশ বলে এক শ্রেণীর মরমী সাধক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ভ্রাম্যমান। কোন পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ বা বন্ধন তাঁদেরকে কোথাও স্থির হয়ে থাকতে দেয় নি। তাঁরা ছিলেন সত্যের সন্ধানী। ঈশ্বর-প্রেমের মদিরা পানে মত্ত থাকতেন। দূরের আকর্ষণ থেকে তাঁরা বের হয়ে আসতেন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। এদের অনেকেই ছিলেন pantheist বা বিশ্ব-ঈশ্বরবাদী। এই মতবাদের মূল কথা হল, "ঈশ্বরই সব আর সব কিছুই ঈশ্বর"। এই সব সুফী দরবেশদের ধর্ম বিষয়ে কোন গোঁড়ামী ছিল না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সদ্ভাবের পথকে তাঁরা অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন একদিকে দেখি বৈষ্ণব পদকর্তা-গণ আর অপর দিকে দেখি সুফীগণ—এরা সকলেই ধর্মপ্রচারক। কিন্তু সে ধর্ম সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়। তাঁরা প্রচার করতেন "মানব ধর্ম"। তাঁরা ধর্মকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতেন। "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" চণ্ডীদাসের এই সত্যাদর্শকে তাঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সমন্বয়ের অগ্রদূত। এ ছাড়া এক রকমের সুফী ছিলেন তাঁদেরকে 'বাউল' বলা হত। বাংলাদেশে এইসব বাউলগণ সুফী মতবাদের সার কথাই প্রচার করে বেড়াতেন একদিকে পুরাতন সংস্কার ও ধর্মের বন্ধন হতে মানুষকে মুক্ত করে তারা জনসাধারণকে একান্ত আপন করে নিয়ে ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি তাঁরা রক্ষণশীল সমাজের দৃঢ় দুর্গকে ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করেছিলেন। এদের প্রচারের ফলে সমাজ থেকে আচার ক্রিয়া কাণ্ড কমে এল। "মানুষ" এই ভাবটিতেই তাঁরা অধিকতর গৌরব অনুভব করতে লাগলেন। চণ্ডীদাসের সেই "মানুষ সত্য" কথাটা ব্যাপক হয়ে গেল।

বৈষ্ণব কবি, বাউল, সুফী সাধকগণ এমনভাবে বাঙ্গলা গান রচনা করতে লাগলেন, যা যুগযুগ ধরে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রাণে একটা উদার অনুভূতি জাগ্রত করল। তাঁরা একদিকে মরমী ভাবের গানের জন্ম বিধাতা হয়ে উঠলেন। ফলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব শ্রেণীর লোকেরই তাঁরা প্রিয় হয়ে উঠলেন। এখনও যদি কোন বাউল কবি গ্রামাঞ্চলে যান, তবে তিনি সর্বত্র সমাদর পান ও লোক আগ্রহের সহিত তাঁর গান শ্রবণ করে বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিগণ পদাবলী সঙ্গীতের জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে যদি বাউলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনেক বাউল বহু মরমী ভাবের কবিতা রচনা করেছেন। গ্রামাঞ্চলে এখনও সে সব গান গীত হয়ে থাকে। এ ছাড়া তাঁদের তান্ত্রিক সাধক-গণ। তাঁরাও এই ধরণের আদর্শ প্রচার করতেন। এই সকল শ্রেণীর সাধকের প্রভাব বাঙ্গলাদেশের মধ্যে নব ভাবের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল।

বঙ্গ দেশে সুফী মতবাদের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এই সব কথা আমাদেরকে আবার নূতন করে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। যদি বঙ্গে সুফী মতবাদের সমগ্র ইতিহাসটা উদ্ভাসিত হয় তবে তাতে সকল শ্রেণীর মানুষের লাভ হবে। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথের বাধাগুলি অপ-সারিত হবে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় আবার নূতন করে নিজেদেরকে উপলব্ধি করতে পারবে।

অপ্রেম নামক ব্যাধি

—শ্রীমাহমুদীল দাস

অপ্রেম নামক ব্যাধি যদি না
নিশ্চিহ্ন হয় এ জগৎ হতে
তাহলে সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে
মানুষের সুদীর্ঘ প্রয়াস
সুস্থ হয়ে বাঁচবার, গড়ে তোলা
পৃথিবীতে শান্তির আবাস ;
বার বার এই ব্যাধি করে দেবে
এ পৃথিবী বেদনা-জর্জর
কত যুগ যুগ ধরে এ মানুষ
সাধনার কত ঐশ্বর্যের
অধিকারী হল তবু পারল না
এই মহা ব্যাধিমুক্ত হতে
নিমেষে নিঃশেষ করে দিয়ে যায়
জীবনের সমস্ত গৌরব,
সাধনার কত সৌধ হয়ে যায়
ধূলিসাৎ এ মহা ব্যাধিতে

কত মহা মানবের কণ্ঠে ওঠে
প্রেমমন্ত্র ; বাণে বাণে ঘোষে
জগতের এ-মানুষে দিয়ে যায়
জীবনের সব শ্রেষ্ঠ দান ;
প্রেম অন্তর হতে দূর কর
ভালবাসা সকল মানুষে,
নিত্য নানা মতেপাত্র গড়ে তোলা
মানুষের অসম্মান শুধু
কে কথা শোনার জন শোনে
আর মনে মনে উচ্চ হে কারে ;
সেই ঐশ্বর্যের ম পকাঠি
অস্ত্রশালা আর পূর্ণ হয়,
নিমেষে কে ধ্বংস করে দিতে পারে
লক্ষ লক্ষ নিরীহ জীবন—
হায়, কী ব্যর্থতা এই ব্যাধিগ্রস্ত
মানুষের ; কবে এর শেষ ?

মধু বৃন্দাবনে

—শ্রী শিবানী দে

এই মধু বৃন্দাবন ছাড়িতে চাহে না মন
তবু আজ ছেড়ে যেতে হবে সে আমায়,
ফেলে আশা পথ শুধু ডাকে ইসারায়

বৃন্দাবনে প্রতি ধূলে কত না মহিমা রাজে
জলস্থল আজিও সে মাধুরী বিলায়
পিছন ফিরিতে গেলে কে যেন ডাকিয়া কয়
যেও না, পাইবে কতো অমৃত-আস্বাদ।

এখানে বাঁশীর ধ্বনি আজ
রাসমাঝে নাচে আজো হাসা শ্যামচাঁদ
আজিও এ নিধু বনে শ্যাম রাজে হাই মনে
ষোড়শ গোপিনী আজো কলসী ভাসায়,
যমুনা আজিও সেই কলগান গায়।

লোকায়ত দর্শন

– শ্রীবিরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থ সাধারণ মানুষের মত, জনতার দৃষ্টি ভঙ্গী অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোক যে ভাবে চিন্তা করে এবং খুব সম্ভবতঃ পণ্ডিতগণ যে ভাবে চিন্তা করে না। কথাটির মধ্যে আরও একটু অর্থ হয়ত নিহিত আছে— অধিকাংশ মানুষ সহজ সরল ভাবে যেটা তাদের ভাল লাগে বা জীবনে খাটে তাই ভাবে অপর পক্ষে মুষ্টিমেয় পণ্ডিতকুল জটিল পথে চিন্তা করে, যার সিদ্ধান্ত প্রায়ই অগ্রহ্য বা ভাবে না হয় বা জীবনে খাটে না।

এখন এই লোকায়ত দর্শন কি রকম হতে পারে তা দেখা যাক। আমরা অনেক সময় বলি: প্রত্যেক বস্তু দেখে শুনে বিচার করে নেওয়া দরকার। কথাটির দার্শনিক তাৎপর্য এই যে মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এদের দেওয়া জ্ঞান ছাড়া অন্যত্র পাওয়া জ্ঞান গ্রহণীয় নয়। জ্ঞান অন্যের কাছ বা সুধীজনের কথা এবং যুক্তি তর্কের মধ্যে থেকেও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু জগতে কে জ্ঞানী আর কে অজ্ঞানী তা নির্ণয় করা কঠিন আবার যাঁকে জ্ঞানী বলে ভেবেছি, তিনি হঠাৎ এমন কথা বললেন যে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা না বদলে আর চলল না আর যুক্তি তর্কের কথা যেই ধরা তো সকল সময় সম্ভবই নয়; যেই ছেড়ে দিয়ে শুধু সিদ্ধান্তও সব সময় মনঃপূত হয় না বিজ্ঞান বলছে জমান উদ্ভিজ্জ তৈল ও মাখন খাদ্য মূল্যের দিক থেকে সমান। ক জন মানুষ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে? অনেকে বলবেন এই সব যুক্তি তর্কের এবং তাই থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্তেও সূক্ষ্ম ভুল থাকতে পারে। যার জন্য মন খুঁত খুঁত করে। তাও যদি হয় তবুও পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রাখার বিপক্ষে কোন যুক্তি দেখি না।

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে পাওয়া জ্ঞানই যদি সব হয়, তবে এরা যে গুলো সামনে পায় সে গুলো দিয়েই জগৎ তৈরী। আমরা সামনে যে দ্রব্যগুলো অনুভব করতে পারি তা হল জল, বাতাস, আকাশ আর মাটি জগৎ এ গুলো দিয়েই তৈরী। এই চারটি দ্রব্য কখনও মৌলিক অবস্থায় থেকে কখনও পরস্পরের সঙ্গে মিলে এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করেছে। তা জীবন কোথা থেকে এল। মৌলিক পদার্থ গুলোর এক এক ভাবে এক ধর্ম আরেকটির সঙ্গে মিললে অন্য ধর্ম। পান খাওয়ার পর মুখে যে লাল রঙ দেখা যায়, পান, সুপারী, চুন– এদের কারুর একক ভাবে সে রঙ আছে কি? এইভাবে জীবন তথা মানুষের জটিল মনও তৈরী (অবশ্য মন বলে কোন বস্তু যদি আদৌ থেকে থাকে: কারণ মনের প্রকাশ দেখি আচার ব্যবহারে, খোদ মনকে তো দেখি না।

সুতরাং!! সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মা এসব কথা নিরর্থক। প্রধানতঃ জীবন ও মনের উৎপত্তি ও বিকাশের সমস্যা থেকে এই ধারণাগুলোর উদ্ভব। সে সমস্যার সমাধান যে কালে হয়েই গেল তখন এদের অবতারণার শুধু প্রয়োজন নেই তা নয় ক্ষতিকরও বটে। ঈশ্বরস্বর্গ, নরক, পূজার্চনা

ইত্যাদি ধারণাগুলো কূট-বুদ্ধি যাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সহজ সরল মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে কিছু কামিয়ে নেওয়ার জন্য। লোকায়ত দৃষ্টি ভঙ্গী এ বিষয়ে সরল এবং তীক্ষ্ণ। বলা হয় যজ্ঞে যে পশুগুলি দেওয়া হয় তার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়—তা যদি হয় তবে পুরোহিত কেন তার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে যূপ কাষ্ঠে ফেলে হনন করে না? তাহলে তো তাদের সত্বর এবং নিশ্চিত স্বর্গ প্রাপ্তি হয় কিন্তু তা করা হয় না, কারণ পুরোহিত নিজেই নিজের কথা বিশ্বাস করে না।

তাহলে মানুষ বাঁচবে কেন? কেন, খাও দাও, ফূর্তি কর। ভোগের উপকরণ জোটাতে না পারলে ধার কর সুখ, সুখ। যে কোন ভাবে সুখে বাঁচতে চেষ্টা কর যে দেশে দুধ মধু তার ধার ধিয়েও যেও না। সুখের জন্য চাই টাকা (তবে টাকা জমিয়ে রাখার জন্য নয়)। আর সুখ এখনই চাই। অতীতে কি ভেবেছিলাম, ভবিষ্যৎ কি পাব সে সব চিন্তা অর্থহীন, সময়ের সার বর্তমান মরণের পরে তো দেহ চার ভূতে মিশে যাবে, সুতরাং পরকালের চিন্তা বলে কিছু নেই।

এই ধরণের চিন্তা যারা করে তাদের বলা হত চার্বাক। প্রাচীন গ্রীসেও এপিকিউরিয়ন্ নামে অভিহিত কিছু এ ধরণের মানুষ ছিলেন। কিন্তু কি ভারতে কি গ্রীসে কোথাও এই ধরণের চিন্তা মর্যাদা পায় নি। বিশেষ করে ভারতে এদের কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে কেউ সমালোচনা প্রসঙ্গে দু একটা ছত্র তুলে ধরেছে—আর তার থেকেই এই দর্শনের মূল মর্মকথা সংগ্রহ চার্বাকেরা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠায় কতটা চেষ্টা করেছেন জানা যায় না, তবে সমালোচকেরা বিরোধীর ভূমিকা নিয়ে এদের দাবিয়ে দিয়েছেন মানুষের মঙ্গলের স্বার্থেই বোধহয় হা, না মানুষ তার নগ্ন চিন্তার রূপ দেখে ভয় পায়?

চার্বাকদের অনেক বক্তব্য-তাত্ত্বিক তার যৌক্তিকতা অনেক স্থানেই তাদের ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে তবু অন্যভাবে দর্শনে এটাই স্বাভাবিক। অনেক জায়গায়ই এদের কথা ধরে ধরে গোটা গোটা গড়গোলো পড়তে হয়। তবে এক জায়গায় এরা একটা বড় ধরণের স্বতঃবিরোধ সৃষ্টি করে ফেলে পড়েছে; এদের মতানুসারে যুক্তি তর্কের কোন মূল্য নেই, অথচ এরা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি তর্কের আশ্রয় নিয়েছে। আবার সুখই না হয় জীবনের লক্ষ্য হল, কিন্তু অবিমিশ্র সুখ বলে কি কিছু আছে? যে মানুষ লঙ্কার ঝাল খেয়ে ঘন ঘন জল খাচ্ছে তার কি ধরণের অনুভূতি? সুখ না দুঃখ, না সুখের মধ্যে দুঃখ, না দুঃখের মধ্যে সুখ

তবু বলব যতটা উদারতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল লোকায়ত দর্শনকে ততটা উদারতা দেখানো হয় নি। অথচ নিছক ভাবালুতার মুখোমুখী এ ধরণের একটা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী জীবন গঠনের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। এই দুই মতের সমন্বয়েই তো গড়ে উঠবে জীবন। 'জড় অজড় সমন্বয়' যদি না হল তবে পুরুষোত্তম-জীবনের রসাস্বাদ হল কি ভাবে? তা ছাড়া অন্তঃসারহীন নিরন্ন কাতর যে কোন প্রগতিশীল জীবনের পক্ষে বাধাস্বরূপ।

সমন্বয়-তত্ত্বে পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তম-বিশ্ব

(শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের অবধূত-ভাষ্য অবলম্বনে)

শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'আত্মানং বিদ্ধি' আত্মাকে জান, ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ। ব্রহ্ম-বস্তুই আত্মা। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের প্রথম সূত্র দিয়াছেন 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইয়াই আছে কিন্তু অজ্ঞানের ছায়া কাছের থাকায় তাহার ব্রহ্ম হওয়ার জ্ঞান সুপ্ত হইয়াছে। এই সুপ্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে জাগাইতে তাহাকে পুনরায় ব্রহ্ম হইতে হইবে এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ইহাই সূত্রের 'সিদ্ধ'। ব্রহ্মকে পুনরায় জানিতে হইবে ইহাই সাধন। 'যঃ সাধনং স সিদ্ধি'। সাধন সিদ্ধিতে সমবাপ্ত। ভাগবত জীবন একই কালে সিদ্ধ ও সাধ্য দুই ব্রহ্মকে প্রথম পাওয়া 'আমি' হইয়া পাওয়া এবং দ্বিতীয় পাওয়া তাঁহাকে দৃশ্য এবং ভোগ্যরূপে পাওয়া। এই দুই ভাবে তাঁহাকে না পাইলে তাঁহাকে পাওয়ার পূর্ণতা হইবে না। প্রথমে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সেবক হইয়া সেবকের দৃষ্টি-কোণে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে বা ভোগ করিতে হইবে। সেবা যতদিন না সেবকের দৃষ্টি-কোণহইতে নিজকে দেখিবেন ততদিন তাঁহার সেবা বিকল। সেবকের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন প্রথম হওয়ার 'অনন্তর' সেবকের ভিতর এমন একটা কামময় জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত হয় যাহার তৃপ্তির হেতু হইয়া সাধক অনন্ত জিজ্ঞাসার জটিল পথে অনন্ত ছুটিতে থাকে। পুরুষোত্তম-কামে বিশ্বের জন্ম, পুরুষোত্তম-চুম্বনে বিশ্ব জাগ্রত। পুরুষোত্তমে পুরুষোত্তম হওয়ার অন্তর আবার সেই পুরুষোত্তম-কেই সেবকরূপে দৃশ্যরূপে জানিবার কামহেতুতে বিশ্বময় অনন্ত পুরুষোত্তম-জিজ্ঞাসার অন্তহীন আকুলি বিকুলি।

উক্ত আত্মা বলিতে পুরুষোত্তমকেই বোঝেন। সকল দেহীরই আত্মা প্রিয়তম। আত্মার অর্থেই সকল চর অচর জগৎ প্রিয়।

তস্মাৎ প্রিয়তম আত্মা সর্বেষামেব দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্।

ভাগবত ১০/১৪/৫৪

'তদয় এবং ব্যতিরেক ভাবে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-ব্যাখ্যানই ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃতি যখন স্ব স্ব বিশেষত্বের সহিত ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ীভাবে ব্রহ্মের ভিতর মিশিয়া যাইয়া ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দত্ব প্রমাণ করেন, তখন সেই দর্শনই ব্রহ্মপদবাচ্য। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিসমাপ্তি সর্ব জ্ঞানে ও সর্ব কলা বিদ্যায়—'আত্মন্যেব বিজ্ঞাতে সর্বমেব বিজ্ঞাতম্'। ব্রহ্মের আলোকেই সর্ব দর্শন ব্রহ্মঘন দর্শন। সূত্রোক্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ব্রহ্মঘন পুরুষোত্তম-জিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম যখন পরমাত্মা, ভগবান ও পুরুষোত্তম মূর্তিতে ঘন ঘনতর এবং ঘনতম হন তখনই তাহার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সার্থকতা' - পুরুষোত্তমানন্দ।

পুরুষোত্তম-জিজ্ঞাসাই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এই পঞ্চাশলা ধরণীর বুকেই পুরুষোত্তমের আসন। এই ধরণীর অঙ্গরসে সৃষ্ট মানুষই পুরুষোত্তম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—

ইত্যাদি ধারণাগুলো কূট-বুদ্ধি যাজক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। সহজ সরল মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে কিছু কামড়ে নেওয়ার জন্য। লোকায়ত দৃষ্টি ভঙ্গী এ বিষয়ে সরল এবং তীক্ষ্ণ। বলা হয় যজ্ঞে যে পশুগুলি দেওয়া হয় তার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়—তা যদি হয় তবে পুরোহিত কেন তার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে যূপ কাষ্ঠে ফেলে হনন করে না? তাহলে তো তাদের সরল এবং নিশ্চিত স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তা করা হয় না, কারণ পুরোহিত নিজেই নিজের কথা বিশ্বাস করে না।

তাহলে মানুষ বাঁচবে কেন? কেন, খাও দাও, ফুর্তি কর। ভোগের উপকরণ টাকা না থাকলে ধার কর। সুখ, সুখ। যে কোন ভাবে সুখে বাঁচতে চেষ্টা কর যে দিকে দুঃখ আছে তার ধার দিয়েও যেও না। সুখের জন্য চাই টাকা (তবে টাকা জমানোর জন্য নয়)। আর সুখ এখনই চাই। অতীতে কি ছেড়েছিলাম, ভবিষ্যতে কি পাব সে সব চিন্তা অর্থহীন, সময়ের সার বর্তমান মরণের পরে তো দেহ ছাই হয়ে মিশে যাবে, সুতরাং পরকালের চিন্তা বলে কিছু নেই।

এই ধরণের চিন্তা যারা করে তাদের বলা হয় চার্বাক। প্রাচীন গ্রীসেও এপিকিউরিয়ন্ নামে অভিহিত কিছু এ ধরণের মানুষ ছিলেন কিন্তু কি ভারতে কি গ্রীসে কোথাও এই ধরণের চিন্তা মর্যাদা পায় নি। বিশেষ করে ভারতে এদের কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে কেউ সমালোচনা প্রসঙ্গে দু একটা ছত্র তুলে ধরেছে—আর তার থেকেই এই দর্শনের মূল মসলা সংগ্রহ চার্বাকেরা তাঁদের আর প্রতিষ্ঠার কতটা চেষ্টা করেছেন জানা যায় না, তবে সমালোচকেরা বিরোধীর ভূমিকা নিয়ে এদের দাবিয়ে দিয়েছেন মানুষের মঙ্গলের স্বার্থেই বোধহয়?, না মানুষ তার নগ্ন চিন্তার রূপ দেখে ভয় পায়?

চার্বাকদের অবশ্য বস্তু-তান্ত্রিকতার ঝোঁক অনেক স্থানেই তাদের স্খলিত করে দিয়েছে এবং জনতার দর্শনে এটাই স্বাভাবিক। অনেক জায়গায়ই এদের কথা ধরে এগোতে গেলে পশুগোলে পড়তে হয় তবে এক জায়গায় এরা একটা বড় ধরণের স্বতঃবিরোধ সৃষ্টি করে ফেলে পড়েছে। এদের মতানুসারে যুক্ত তর্কের কোন মূল্য নেই, অথচ এরা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্ত তর্কের আশ্রয় নিয়েছে। আমার সুখই না হয় জীবনের লক্ষ্য হল, কিন্তু অমিশ্র সুখ বলে কি কিছু আছে? যে মানুষ লঙ্কার ঝাল খেয়ে ঘন ঘন জল খাচ্ছে তার কি ধরণের অনুভূতি? সুখ না দুঃখ, না সুখের মধ্যে দুঃখ, না দুঃখের মধ্যে সুখ

তবু বলব যতটা উদারতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল লোকায়ত দর্শনকে ততটা উদারতা দেখানো হয় নি। অথচ নিছক ভাবালুতার মুখোমুখী এ ধরণের একটা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী জীবন গঠনের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। এই দুই মতের সমন্বয়েই তো গড়ে উঠবে জীবন। 'জড় অজড় সমন্বয়' যদি না হল তবে পুরুষোত্তম-জীবনের রসাস্বাদ হল কি ভাবে? তা ছাড়া অন্তঃসারহীন নিরন্ন মানুষ যে কোন প্রগতিশীল জীবনের পক্ষে বাধাস্বরূপ।

সমন্বয়-তত্ত্বে পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তম-বিশ্ব

(শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের অবধূত-ভাষ্য অবলম্বনে)

শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'আত্মানং বিদ্ধি' আত্মাকে জান, ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ। ব্রহ্ম-বস্তুই আত্মা। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের প্রথম সূত্র দিয়াছেন 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইয়াই আছে কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় তাহার ব্রহ্ম হওয়ার জ্ঞান সুপ্ত হইয়াছে। এই সুপ্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে জাগাইতে তাহাকে পুনরায় ব্রহ্ম হইতে হইবে এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ইহাই সূত্রের সিদ্ধার্থ। ব্রহ্মকে পুনরায় জানিতে হইবে ইহাই সাধন। 'যং সাধনং তৎ সিদ্ধি'। সাধন সিদ্ধিতে সমব্যাপ্ত। ভাগবত জীবন একই কালে সিদ্ধ ও সাধ্য দুই ব্রহ্মকে প্রথম পাওয়া 'আমি' হইয়া পাওয়া এবং দ্বিতীয় পাওয়া তাঁহাকে দৃশ্য এবং ভোগ্যরূপে পাওয়া। এই দুই ভাবে তাঁহাকে না পাইলে তাঁহাকে পাওয়ার পূর্ণতা হইবে না। প্রথমে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সেবক হইয়া সেবকের দৃষ্টি-কোণে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে বা ভোগ করিতে হইবে। সেবা যতদিন না সেবকের দৃষ্টি-কোণ হইতে নিজকে দেখিবেন ততদিন তাঁহার দেখা বিফল। সেবকের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন প্রথম হওয়ার 'অনন্তর' সেবকের ভিতর এমন একটা কারণ জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত হয় যাহার তৃপ্তির হেতু হইয়া সাধক অনন্ত জিজ্ঞাসার জটিল পথে অনন্ত ছুটিতে থাকে। পুরুষোত্তম-কামে বিশ্বের জন্ম, পুরুষোত্তম-চুম্বনে বিশ্ব জাগ্রত। পুরুষোত্তমে পুরুষোত্তম হওয়ার অন্তর আবার সেই পুরুষোত্তম-কেই সেবকরূপে দৃশ্যরূপে জানিবার কামহেতুতে বিশ্বময় অনন্ত পুরুষোত্তম-জিজ্ঞাসার অন্তহীন আকুলি বিকুলি।

ভক্ত আত্মা বলিতে পুরুষোত্তমকেই বোঝেন। সকল দেহীই আত্মা প্রিয়তম। আত্মার অর্থেই সকল চর অচর জগৎ প্রিয়।

তস্মাৎ প্রিয়তম আত্মা সর্বেষামেব দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলম্ জগদেতচ্চরাচরম্।

ভাগবত ১০/১৪/৫৪

'অন্বয় এবং ব্যতিরেক ভাবে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-ব্যাখ্যানই ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃতি যখন স্ব স্ব বিশেষত্বের সহিত ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ীভাবে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া বাহিরে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দত্ব প্রমাণ করেন, তখন সেই দর্শনই ব্রহ্মপরবাচ। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিসমাপ্তি সর্ব জ্ঞানে ও সর্ব কলা বিদ্যায়—'আত্মনের বিজ্ঞাতে সর্বমেব বিজ্ঞাতম্'। ব্রহ্মের আলোকেই সর্ব দর্শন ব্রহ্মময় দর্শন। সূত্রোক্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ব্রহ্মময় পুরুষোত্তম-জিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম যখন পরমাত্মা, ভগবান ও পুরুষোত্তম মূর্তিতে যত ঘনতর এবং ঘনতম হন তখনই জীবের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সার্থকতা' - পুরুষোত্তমানন্দ।

পুরুষোত্তম-জিজ্ঞাসাই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এই সচাগলা ধরণীর বুকেই পুরুষোত্তমের আসন। এই ধরণীর অঙ্গরূপে সৃষ্ট মানুষই পুরুষোত্তম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—

চণ্ডীদাস। তিনি বন্যায় অবতীর্ণ হইয়া যোগমায়াকারা নিজকে আস্বাদন করিয়া লীলা করেন।

'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণু কর নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ।' চৈতন্যচরিতামৃত

ভক্তের হৃদয়ই পুরুষোত্তমের শেষ বিশ্রাম-স্থল। এই বিশ্বের স্রষ্টা মানুষ পুরুষোত্তম। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই মানুষকেই পুরুষোত্তম নামে আখ্যা দিয়াছেন। এই মাটির মানুষই পুরুষ ধ্যান করিতে করিতে জৈব দেহ ত্যাগ না করিয়াই পুরুষোত্তম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হন।

'কীটঃ পেশস্কৃতা ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ
যাতি তৎ সাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্।'

ভাগবত ১১।৯।২২

পেশস্কৃতদ্বারা তাহার বাসায় প্রবেশিত কীট পেশস্কৃতকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব রূপ ত্যাগ না করিয়াই পেশস্কৃতের সমস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ভক্ত পুরুষোত্তম-ধ্যানে জৈব দেহ ত্যাগ না করিয়া পুরুষোত্তম বনিয়া যান এবং বিশ্ব সম্পদ রূপে পরিগণিত হন। অঙ্গিরা ঋষির সাধনায় অঙ্গীরস বনিয়া গিয়াছেন এবং বৃহস্পতির সাধনায় বৃহস্পতি বনিয়া গিয়াছেন। ভক্ত তাহার খণ্ড নামরূপের মধ্যে অখণ্ড, অনাম, অরূপের আস্বাদন করিয়া সার্থক।

পুরুষোত্তমের সহিত তাঁহার বিশ্বের স্বাধর্ম্য শ্রুতিসিদ্ধ। এই স্বাধর্ম্যপ্রসিদ্ধিকে শ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইহাকে ক্রিয়াত্মক এবং প্রত্যক্ষ করিলেই ইহা প্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই ধামেই নামের রহিবা। নাম ও নামী অভিন্ন।

যে পর্যন্ত নামী নামে অবতরণ না
প্রত্যক্ষ সিদ্ধি লাভ হইবে না
মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'।

ব্রহ্ম 'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' যাহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহাদের কাছে ব্রহ্ম অজানাই রহিয়া গিয়াছেন জানার শেষ নাই এবং অজানারও শেষ নাই। ব্রহ্ম-বস্তু বিরহে অদ্বৈত এবং মিলনে দ্বৈত। এই মিলনের মধ্যেও রহিয়াছে চিরন্তন বিরহ। এই বিরহ হইতেছে ভক্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ জ্বলেন, যায় তাজন' পুরুষোত্তম অনন্ত, তাঁহার প্রেমও অনন্ত এবং প্রেম-সাধকও অনন্ত। অনন্ত প্রেম-সাধকের জন্য অনন্ত দেশে, অনন্ত মূর্তিতে তাঁহার অবস্থান করিতেছেন এবং করিবেন ইহাই যুক্ত।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গ হইতেছে —তাহাই সূত্রের ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম পুরুষোত্তমের সাথে জীবের এক মহাসম্বন্ধ। তিনি জীবের মত জন্মান, বাঁচেন এবং চলিয়া যান যিনি জন্মান না তিনি অপরকে জন্ম দিতে পারেন না। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন, পুরুষোত্তম অনাম সর্ব নাম, অরূপ সর্ব রূপ, অক্ষর ক্ষর, চিৎ অচিৎ, দৃক্ দৃশ্য যুগপৎ। এমনই এক ব্রহ্ম-বস্তু হইতে বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ সম্ভব ও সঙ্গত, তাহা বিশ্বলীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুষোত্তমের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ সবই বিশ্বের ঘটনা তাঁহার জন্ম স্থিতি এবং ভঙ্গকে বিশ্বের মহা সম্পদ রূপে বরণ করিয়া লইলেই বিশ্বের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব হইবে। পুরুষোত্তমের জন্ম দিবা, কর্মও দিব্য। ইহা তত্ত্বতঃ জানিলে কাহারো আর পুনর্জন্ম হয় না এবং তিনি পুরুষোত্তম

বলিয়া যান। শ্লোকের শুরুতেই এই সংযোগ দিয়া। অথচ অনাদি পুরুষোত্তমের সহিত খণ্ড নাম রূপের নিত্যবদ্ধ সংযোগের দৃষ্টান্ত ব্রজ গোপীগণ এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। 'ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্'। ব্রহ্মসূত্রে সামানাধিকরণ্য এবং সমন্বয়াপ্তির প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রজ-গোপীগণ পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত। তাহাদের জন্ম ও কর্ম নিত্যবদ্ধ পুরুষোত্তম-সংযুক্ততায় গড়িয়া উঠিয়াছে দিব্য জন্মে ও কর্মে। অজড় ও জড়ের সম ব্যাপ্তি এবং সামানাধিকরণ্য প্রাণবন্তত পুরুষোত্তমেই যুক্তিযুক্ত। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলিয়াছেন, 'পুরুষোত্তম যখন বিশ্বে দ্বিতীয় বার জন্মেন, পুরুষোত্তম স্থিতিতে যখন বিশ্ব দ্বিতীয়বার স্থিত হয় এবং পুরুষোত্তম লয়ে বিশ্ব দ্বিতীয় বার যখন লীন, তখনই বিশ্বের সত্তা বাস্তব বস্তু-তন্ত্র ব্যাখ্যান। যাহা পুরুষোত্তম সৃষ্টি করেন এবং যাহাদ্বারা তিনি নিজে সৃষ্ট হন না তাহা নিশ্চয়ই 'মহা' প্রাণচৈতন্যের ঈশ্বর হন একান্ত স্রষ্টা, জগৎ একান্ত সৃষ্ট। সামানাধিকরণ্য ছাড়া কিছুতেই বিশ্ব ও ঈশ্বর সত্তা নয়। বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের স্রষ্টা বিশ্ব। দুই যেখানে দুইয়ের স্রষ্টা সেখানেই সত্তা সৃষ্টি। যে সত্তাতত্ত্বে প্রবর্তনে বিশ্ব প্রেমে চক্রবদ্ধ, ঈশ্বরকে হৃদয় করিয়া বিশ্ব ঈশ্বর রূপে উজ্জ্বল হইতে পারে, সেই সত্তাতত্ত্বের মূর্তি হইয়াই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তকৃৎ বেদান্তবিৎ। বিশ্ব ও ঈশ্বর যেখানে সম স্রষ্টা এবং সম সৃষ্ট সেখানেই তাঁহারা সমান কর্তা, সমান কর্ম, সমান করণ, সমান সম্প্রদান, সমান অপাদান, সমান সম্বন্ধ, সমান অধিকরণ। সেখানেই সকল উত্তর মীমাংসা।"

বস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।

সর্ব ভূতের চৈতন্যে' তত্ত্বে ন 'বিজুগুপ্সতে'। যিনি আত্মাতে সর্বভূত এবং সর্বভূতে আত্মা অনুদর্শন করেন, তাঁহার নিকট বিশ্বে এমন কিছু জুগুপ্সিত থাকে না যাহা তাঁহার পক্ষে গোপন করিবার প্রয়োজন হয়।

পুরুষোত্তম কাল ও পুরুষ সমন্বিত সমগ্র। সমগ্র জাতি, সমগ্র কাল, সমগ্র অহিংসাদি, সমগ্র অষ্টাঙ্গযোগ এক কথায় সমগ্র সত্তাতার ঘন বিগ্রহ। এই পুরুষোত্তমকে বুকে লইয়াই ব্রহ্ম-চক্রে গড়িয়া উঠিল রাস-চক্রে, ভ্রমণ পরিণত হইল রাস নৃত্যে। পুরুষোত্তমের ধ্যানে জৈব জন্মের রাখিয়াই দিব্য জন্মে পরিণত হয়, দিব্য কর্মের ধ্যানেই কর্ম তাহার কর্মত্ব পরিত্যাগ না করিয়াই দিব্য কর্মে গড়িয়া ওঠে।

পুরুষোত্তম-বিধানে কাল, দেশ, জড় সকলই নমনশীল। স্থিতিশীল ব্রহ্মের সাধনায় যে অচলায়তন সৃষ্টি হইয়াছিল ভাগবত ধর্মের আপেক্ষিকতাই তাহার মধ্যে গতিশীলতার সৃষ্টি করিয়া স্থিতি-গতি, নিত্য-অনিত্য, জড়-অজড়, জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভৃতি পরস্পর-বিরুদ্ধের মধ্যে সমন্বয়ের সেতু বন্ধন করিয়া বিশ্ব পরিবারে উপস্থিত করিয়াছে। এই সমন্বয় বিধানের উপরই ভারতের ব্রহ্মসূত্র দাঁড়াইয়া আছে। বর্তমান যুগের মনীষী আইনষ্টিন যে তত্ত্ব বিশ্বকে দিয়াছেন তাহার সহিত এই দর্শন এক হইয়া মিলিয়া যাইতেছে। আইন-ষ্টিনের মতে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবধানই সর্বাপেক্ষা কম ব্যবধান। পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে সরল রেখাই সর্বাপেক্ষা কম ব্যবধান। ভাগবতের সিদ্ধান্ত মানুষে মানুষে বিশ্ব ব্যবধান থাকিলেই সর্বাপেক্ষা কম ব্যবধান হইবে। মানুষ তাহার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব,

পিতা, মাতা প্রভৃতি ছাঁটিয়া ফেলিয়া শুধু স্ত্রী লইয়া সংসার চালাইবার যে সহজ পথ গ্রহণ করিল তাহাতে সমস্যা তত্তই বাড়িল বৈ কমিল না।

যেথায় বিহার, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার'—রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বের সাথে যোগে যুক্ত হইয়া চলাই পরম ব্রত-পথ এবং ইহাই আইনস্টাইনের world line। প্রচলিত দর্শনে ব্রহ্ম হইতে জগৎ যত দূরে ব্রহ্ম তত বেশি নির্গুণ। ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের শক্তি কম, দেবতা হইতে মানুষের শক্তি কম, পিতা হইতে পুত্রের শক্তি কম। এই ভাবে শক্তি কমিতে থাকিলে সকলেই শক্তিহীন হইয়া ক্লীবে পরিণত হইবে। ভাগবত শাস্ত্রে ঈশ্বর অপেক্ষা বিশ্বের শক্তি বেশী, দেবতা হইতে মানুষের শক্তি অধিক, পিতা হইতে পুত্রের শক্তি অধিক। ভাগবত পন্থা চলিয়াছে উজান পথে। অন্বেষণীয়ানের বুকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বলিয়াছেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ", যে তাঁহার একাংশকুকু "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। আমি একাংশে এই কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপিয়া আছি, সেই একাংশকুকু কালে আমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও। অন্বেষণীয়ানের পক্ষে কত উচ্চতর এবং মহীয়ান স্তরে ওঠা সম্ভবপর তাহার মূল সূত্রই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। পুরুষোত্তমের আশ্রয়েই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত ও ঘনীভূত। পুরুষোত্তম কাল ও স্বভাবে সমন্বিত বাস্তব ব্রহ্ম-বস্তু। ইহাকে বুকে করিয়াই ব্রহ্ম চক্র গড়িয়া তুলিল রাসচক্রে। তাঁহারই কামের আশীর্বাদ হইয়া আমরা বিশ্ব-কর্মকে লীলায় গড়িয়া তুলিব। তাঁহার চরণ-তলে নিজেদের উৎসর্গ করিয়া পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব-সম্পদ বনিয়া যাইব। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যানন্দের এবং পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সমন্বয় দর্শনের মাধ্যমে ধর্মসাধনের নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়া তাঁহাদের জয় হউক।

"জড়েরই মন্থন-উদ্ভূত যে অমৃত চৈতন্য এবং তাহা জড়াতীত, চৈতন্যেরই ঘনীভূত আস্বাদন যে জড় পুরুষোত্তমের সন্ধিৎ থাকার ফল স্বরূপ জড়-চৈতন্য যে পরস্পরের পরকীয়, স্বাধীন সত্তাযুক্ত—ইহা পুরুষোত্তম জীবনের নিগূঢ় আস্বাদন।

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

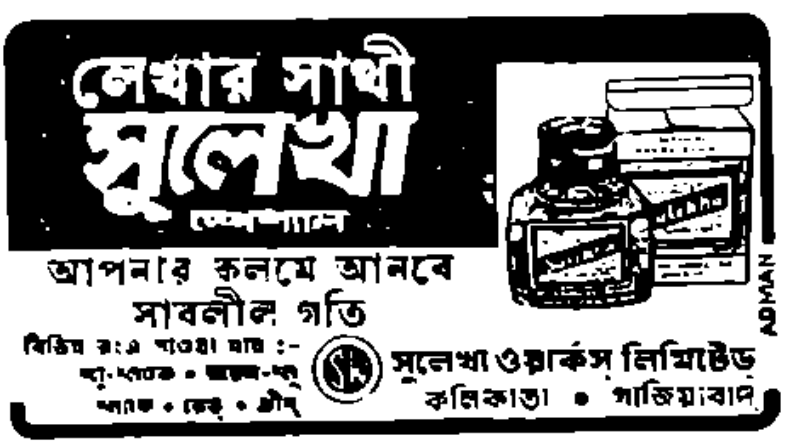

মহতো মহীয়ান শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

যুগে যুগে কত মহামানব, অবতার অবতীর্ণ হয়েছেন অবনীর বুকে। কেউ শৌর্যে স্তম্ভিত করেছেন পৃথ্বীকে, কেউ জ্বেলে দিয়েছেন জ্ঞানের দীপ-শিখা। কেউ বা ধূসর দরিদ্রতার বুক প্লাবিত করেছেন প্রেমের পীযূষ ধারায়। তাই প্রশ্ন জাগে কোন গুণে মানব শ্রেষ্ঠ? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মনের তিনটি বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধানী, সংবিৎ। এই তিনটি যাঁর মাঝে প্রকাশ পায় তিনি শ্রেষ্ঠ মানব। অনেক পাশ্চাত্য মনীষীর অভিমত—শক্তি ও প্রেমের সংমিশ্রণে মানুষ হয় মহামানব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান যোগীকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন—তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।

আমাদের শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সর্ব্ব গুণ মিশ্রিত এক মহামানব। শৈশব থেকেই তিনি এক বিপ্লবী পুরুষ। ক্লীবের মত তাই জীবনে কোন দিন অন্যায় অসত্যকে মেনে নিতে পারেন নি প্রমাণ হিসাবে পবিত্র পুরুষের জীবন-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় খুলে ধরি—শরৎ কুমার কৈশোরের কিশলয়ে তখন উপনীত। অধ্যয়ন করেন ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ে। ছুটিতে এসেছেন বাড়ী। প্রতিবেশীর সঙ্গে দৌলতদারী মামলায় জড়িত পিতা। তাই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রস্তাব আসার সঙ্গে। অস্বীকৃত হন সত্যাশ্রয়ী শরৎকুমার, পিতৃ-ভিরস্কারে বুকভরা বেদনায় গৃহের বহির্ভূত হন। কিন্তু পিতার আহ্বানে আবার আলয়ে আগমন করেন সত্যের ছিলেন তিনি এমনি অনন্য বিগ্রহ

এর কয়েক বছরের পরের ঘটনা শরৎ কুমার তখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষারতী আদর্শ বিদ্যালয়ে রূপায়িত করার তাঁর মনের বাসনা প্রতিষ্ঠানটিকে। কিন্তু আশা লতা তাঁর মুকুলিত হয় না। ছাত্রগণ হয় দুর্নীতির পঙ্কিল সলিলে নিমগ্ন, শিক্ষকগণ হন আদর্শ ভ্রষ্ট। মনোবেদনায় তাই তিনি শিক্ষকতার পদে ইস্তফা দেন। তাঁর কণ্ঠে সেদিন বুঝি উপনিষদের বাণী ধ্বনিত হয়—'অসতো মা সদ্গময়ো। তমসো মা জ্যোতির্গময়।'

অকূল পাথারে ভাসলেন শরৎকুমার। পুরুষোত্তম পথের পথিক পেলেন নতুন পথ। বন্ধুবর্গ সংসারের বাধ্যতায় কিছু গ্রহণ করলেন। বেদান্তের ভাষ্য রচনায় তন্ময় মগ্ন হলেন শরৎকুমার। সেই অমৃত তত্ত্ব একদিন পরিবেশন করলেন কলিকাতার খিওসফিক্যাল হলে। সে ভাবপ্রবাহের আসন টলে না। দিনের পর দিন প্রাণস্পর্শী ভাষায় চলে বেদান্তের আলোচনা। বিবেকানন্দ সমিতি, রামমোহন লাইব্রেরী, ভাটপাড়ায় মানুষ উৎকর্ণ হয়ে শোনে কৃষ্ণকথা।... মধুপানে মাতাল ভৃঙ্গের পক্ষা প্রাপ্ত হয় শ্রোতৃবৃন্দ। এই সময় দেশে আসে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গমে যিনি স্নান করেছেন তাঁর এক স্থানে স্থিতি কোথায়? ব্রজমোহন। এ।

খরস্রোতা তটিনীর মতো বিরামহীন গতি! বরিশালে গিয়ে অধ্যক্ষ মহারাজের চিন্তা নতুন চিন্তার উদয় হল—বেদান্তের যে বাণী-প্রচার তাই তো যথার্থ অসহযোগ আন্দোলন। মাতৃভূমির দুঃখ স্মরণে করলেন নিজেকে উৎসর্গ। দুঃশাসনের শোণিত পাষাণ-দুর্গ-চূর্ণ করতে নিলেন সঙ্কল্প। ব্রহ্মের সকাশে আর্ষা ঋষি যেন প্রার্থনা জানালেন—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।

১৯২০ খৃঃ বরিশালে রাজাবাহাদুরের চারদিকে এক জনসভা হল। শরৎকুমার সেখানে যেন এক বাঙ্ময় পর্বত, আগ্নেয় গিরি। তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী বুঝি জ্বলন্ত লাভা। 'দারুণ আগুনে অন্তরে তৃষা হবে' বরিশালের আবাল বৃদ্ধ বনিতার বিলাতী বস্ত্র বয়কটের জন্য অবশন শুরু করেন অগ্নিহোত্রী শরৎকুমার। গণ-আন্দোলনের আসন টলে ওঠে। প্রমাদ গণে মহাজন সমিতি। বিলাতী বস্ত্র ব্যবসা বন্ধের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় বণিকবৃন্দ। ১৩২৮ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ শিবোজপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের উপর পুলিশের চলে নির্যাতন। রুদ্রমূর্তিতে ধাবিত হন শরৎকুমার। ঋষিক সমিধ দেন মুক্তিযজ্ঞে। দাউ দাউ করে সে হোমশিখা প্রজ্বলিত হয়। ত্রয়োদশটি অরুণ তেজে দীপ্যমান তরুণ কারাবরণ করে। তাদের শক্তিময়ী জননীরা পুষ্পমালা চন্দনে আবাহন প্রাঙ্গণে সম্বর্ধনা করেন। বন্দেমাতরম্, ধ্বনিতে মুখরিত হয় সেখানকার আকাশ বাতাস। বিদ্রোহী কবির বাণী স্মৃতিপটে উদিত হয়—

মাথার উপরে শত বাজপাখী
তবু পায়রার দল;
ঐ পিয়াসী চক্ষু পাখা
মুক্তিরে অবিরল।

চাঁদপুরে আবার অবর্ণনীয় দৃশ্য। অসহায় সুপ্ত কুলীদের বালক বালিকাদের উপর নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন। দুর্দান্ত রেখে উপস্থিত হন বীর সন্ন্যাসী। গুরুগম্ভীর স্বরে তাঁর শুরু হয়—"চাঁদপুরের অসহায় স্ত্রী পুরুষ কি আপনাদের আত্মীয় নয়? তাদের রক্তপাতে কি আপনাদের রক্তপাত হয়নি?" সে অগ্নিময়ী বক্তৃতায় উজ্জীবিত হয় জনগণ। সাড়া পড়ে যায় সর্বত্র। সরকার পক্ষের সঙ্গে যোগ দেন সরকারী অফিসের সাহেব উকিল, মোক্তার, সরকারী কর্মচারীদের স্ত্রী। বিপদ্নি মাতা। বার্থ হয় জীবন দান। তরঙ্গে তরঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠে চাঁদপুর বন্দর। হয় বরিশালের সীমায়। অবাক হয়ে দেখে কুলী খালাসীরা বর্ষাবটের ডাকে। স্বামীজীর অগ্নি মন্ত্রে সেদিন লক্ষ লক্ষ মানব যেন দীক্ষা গ্রহণ করে। তাই তো কবিগুরুর বীণার সুর নিয়ে গাইতে ইচ্ছে করে, 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'। ১৩২৮ সনের ৮ই শ্রাবণ পুরুষ-সিংহ শরৎকুমার কারারুদ্ধ হলেন। মুক্তিযজ্ঞে পড়ল পূর্ণাহুতি।

যৌবনের অধ্যায় ছেড়ে প্রবীণ অধ্যক্ষ মহারাজের মানবপ্রীতি ভগবৎ প্রীতির পথে হস্তক্ষেপ করে। টালিগঞ্জে তখন নরনারায়ণ আশ্রম পুলিন নামে এক জীর্ণ শীর্ণ যুবক একদিন আশ্রমে আগমন করে। স্পষ্ট ভাবে সে মৃত্যু-পথ-যাত্রী; তাই মরণের পূর্বে দেহখানিকে পূত করার জন্য

অবধূত মহারাজের শিষ্য হওয়ার বাসনা। স্বামীজী পুলিনের প্রকৃত অবস্থা অবগত হন। তিনি বলেন, "মন্ত্র পরে দেওয়া যাবে, আগে আশ্রমে আহার করে সুস্থ হও"। সেদিন থেকে পুলিন হয় আশ্রমের আজীবন আশ্রিত জন। দশ মাস পরে আশ্রম স্থানান্তরিত হয় স্বামীজী যুবককে দশ টাকা দান করেন। পুলিনের শরীর তখন হৃষ্ট পুষ্ট। পরিশ্রম করে খাদ্য অর্জনের সামর্থ্য তার হয়েছে। অসহায়ের সুহৃৎ অবধূত মহারাজ এইভাবে পুলিনকে রক্ষা করেন।

নবদ্বীপের ছেলে নিতাগোপাল চক্রবর্তী স্বামীজীর পরম ভক্ত। সে একদিন মঠের মালা ত্যাগ করে। সংসার হয় টলমল নিতাগোপালের পত্নী হেমকণা হরকর্ণে কাতরিমার কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্বামীজী জানান—"মা, তোমার দুঃখ কি, আমার কোলেই তুমি স্থান পাবে"—এই ভাবে কত জনের নয়নের অশ্রু তিনি মুছিয়ে দিয়েছেন সাদুলার অভয় অঙ্গনে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের মানব-প্রীতির কি তল পাওয়া যায়! লিখে সিন্ধুর কথা বিন্দুতে পাইবেদন মাত্র। যাদের দেখে সংসারী মানুষ ঘৃণা ভরে দূরে দাঁড়ায়—সেই পতিতাদের প্রতিও তাঁর কি অসীম স্নেহ! তাদের পল্লীতে গিয়ে ভাগবত পাঠ করে শুনিয়েছেন। বারবনিতাদের মধ্যেও তিনি ফুটাতে চেয়েছেন ব্রহ্মময়ীর অপরূপ রূপ।

যস্যস্যাঃ নব প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীরূপ গোস্বামীর কথায় সাধক প্রেমিকের চিত্ত সত্যই সুদুর্গম। শৈশবে জন্মভূমি ঝাঁকরবার বুকেই শরৎ কুমার শুনতে পান কালিন্দীর কলতান। বকুল ফুল কুড়িয়ে গৃহবিগ্রহ কালাচাঁদের জন্য মালা গাঁথেন, সেই বনমালীর গলায় পরিয়ে দেন সে মালা শ্রীদুর্গা প্রতিমা অপরূপ সেজে দর্শন করেন, বিসর্জন কালে সহযুর অশ্রুবন্যা নামে বুকে। বরিশালে একবার বিল্বমঙ্গল নাটক মঞ্চস্থ হয় তাতে বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় ভক্তিমান বালকের কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে কি রোদন-ধ্বনি! কৈশোরেই শরৎ কুমারের প্রাণে কৃষ্ণ-প্রেমের কি ওলটপালট! একুশ বৎসর বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন—কিন্তু আসক্তির প্রীতি-লেখা কোথায়? বিবাগী ভ্রমর মন উড়ে যেতে চায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মের রেণুমাখার উদ্দেশ্যে। মনের ১৩ই অগ্রহায়ণ চিত্ত সমর্পণ করেন ভগবান শ্রীনিতাগোপালের চরণে। শরৎকুমার উদ্ভাসিত হন নিত্যসুখের কিরণে সবাই তিনি খুঁজে পান আঁধার অন্তরের আলোয় দিশারীকে। ভক্তির দুয়ার একবার খুলে গেলে ভক্ত নিজে সর্বনিষ্ঠার ঘর খুঁজে ফেরেন। যৌবনেই শরৎ কুমার উপনীত হন বনমালীর লীলা-নিকেতন বৃন্দাবনে। রাধাকুণ্ডে কয়েকদিন বাসা বাঁধেন। সেখানে রাধা মাধবের চরণ-চিহ্নিত দুই ছোড়া মিলা। লোক-চক্ষুর অগোচরে তাতে তিনি বার বার চুম্বন করেন। এ যেন অভিসারিকা সেজে রাধিকা বধূর বেশে পরম সুন্দরের সাথে মিলিত হওয়া। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসেন বরিশালে। জীবন-নদীতে বহু স্রোত বয়ে যায়। মনে বাসনা জাগে মোহন-মুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়া। মনে পড়ে যোগী কবি হাফেজের বাণী

When the spirit wakens
It will not have less

Than the whole of life
For its tenderness.

অর্থাৎ হৃদয়-দেবতা যখন জাগে সে থাকে না তখন স্বয়ম্বরা, সেই হয় তখন বিশ্বরূপী নিত্য-গোপালের প্রিয় পার্ষদ পুরুষোত্তমানন্দ। মানব প্রেম স্বদেশ প্রেম থেকে প্রথম অনুপ্রাণিত হল বিশ্বপ্রেমে। অহিংসার পূজারী বাপুজীর ছত্র-ছায়ায় একদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজীর কংগ্রেসের বুকে দেখলেন নানা দুর্নীতি। ১৯৩০ সালের ভাদ্র মাসে সে দল ত্যাগ করে গড়লেন 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ'। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বকল্যাণ ব্রতে ব্রতী হলেন আমাদের অবধূত মহারাজ। বিশ্ব সঙ্ঘ গঠন, বিশ্ব বৃন্দাবন রচনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন পবিত্র পুরুষটি। কিন্তু ব্রজধামে পুরুষোত্তমের পোষণ-ঘন তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে দেখলেন নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের শোষণ। অন্তরাত্মা তাঁর ভুকরে উঠল গোপীর সেবক বৈষ্ণবের কাছে নূতন করে গৌরতত্ত্ব পরিবেশন করতে লাগলেন। বিগলিত হ'ল ব্রজবাসীর প্রাণ একদিনেরে গোপালের ছোঁয়া কূপ থেকে ভিন্ন বর্ণের বৃন্দাবনের কূপগুলিকে স্বাধীনতা লাভের-মুক্ত করলেন। অস্পৃশ্যতা দূর হ'ল

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্

কেনোপনিষদের ভাষায় অবধূত মহারাজ তো সব কিছুতেই ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করেছিলেন। এই বিশ্ব-সংসারকে মধু বৃন্দাবনে গড়ার জন্য প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। যে দিন কাঁদতে শিখেছিলেন মাতার অঙ্গনে কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠ আজ যখন আর সে বাতাসে শুধু অশ্রুতার অট্টহাসি, লাঞ্ছনা যেন আর্থে নাচে, বণিকের দল খায় দুধ তখন মহাত্মা গান্ধীজীর অমৃত পুরুষ অবধূত মহারাজকে বার বার মনে পড়ে। বন্দে পুরুষোত্তমানন্দম্

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রমসঙ্ঘান্তর্গত চারি বিভাগের ১৯৭৬-৭৭ বর্ষের বার্ষিক বিবরণী :—

নরনারায়ণ গ্রন্থাগার :—

বর্তমানে গ্রন্থাগারে মোট বই-র সংখ্যা ক্রমবেশী ৪০০০ খানা। এই বছরে বই সংগৃহীত হয়েছে মোট ৩৯৭ খানা —এর মধ্যে রামমোহন লাইব্রেরী অনুদান হিসাবে দিয়েছে ৩৬২ খানা এবং গ্রন্থাগার থেকে কেনা হয়েছে ৩৫ খানা।

বর্তমান বছরে পত্র পত্রিকার সংখ্যা ৩৭ খানা এ বছরে বই ও পত্রপত্রিকা কেনা হয়েছে ৪৭১'২১ টাকার। দৈনিক আনন্দবাজার, Career Digest, Science To-day, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শুকতারা ও দেশ কেনা হয়, বাকিগুলির কিছু পাওয়া যায় সরাসরি complementary হিসাবে এবং বাকি কিছু আশ্রমের মুখপত্র উদ্বোধনাগারের মাধ্যমে।

এ বছরে সভ্যসংখ্যা ১৮৩ জন। এর মধ্যে সাধারণ সভ্য ১১৩, ছাত্রসভ্য ৬৯ এবং ১ জন আজীবন সদস্য (শ্রীহরিবিলাস বিশ্বাস একটা রোপ্যপদক

সিলিং পাখা প্রস্থাগারে দান করে আজীবন সদস্য হয়েছেন)। উক্ত ১৮৩ জন সভ্যের মধ্যে সভ্যসংখ্যা প্রায় ১৫ জন অনিয়মিত। এ বছরে বই issue হয়েছে ১৭৯৭ খানা।

গ্রন্থাগার-কর্মীদের বেতন বাদে বাকি সব ক্রিয়াকলাপের—বই ও পত্রপত্রিকা কাগজ হিসাবের খাতা ইত্যাদি কেনা, বই বাঁধানো, ইলেকট্রিক খরচ, গাড়ীভাড়া ইত্যাদি সহ অন্যান্য খাতে—গড় প্রস্থাগারে সরকারের মাসিক বরাদ্দ মাত্র ৫০৲ টাকা। এই টাকা ও সভ্যদের মাসিক চাঁদা ১৫০ টাকা এই দুই মিলেও সভ্যদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয় মূলধনের দিকে এ অঞ্চলে এটা একটা প্রাতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার এটা শুধু উপন্যাসের গ্রন্থাগার নয়। ছাত্র-ছাত্রী শিশু ও বয়স্কদের প্রয়োজন মেটাতে এ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। অথচ আর্থিক অসঙ্গতিহেতু এতান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও যেমন আজ পর্যন্ত একটা পাঠাগার-গৃহ তৈরী করা সম্ভব হল না, তেমনি পাঠকপাঠিকাদের প্রয়োজনের চাহিদাও সবটুকু মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এই সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে একটা উন্নয়ন তহবিল করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকে বছরে ২ টাকা করে উন্নয়ন চাঁদা পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে ২ টাকার সংগ্রহ দিয়ে পাঠাগার গড়ে তোলা একটা দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা। আপনারা যদি একক বা যৌথভাবে এই পাঠাগারসহ গ্রন্থাগার-উন্নয়ন কাজে এগিয়ে আসেন তাহলে সমস্যার কিছু সমাধান পাওয়ার আশা করা যায়।

নবনারায়ণ শিক্ষায়তন :—এ বছরের কথা বলতে প্রথমেই এই সেলাই স্কুলের প্রায় ১২ বৎসরের শিক্ষিকা মীরাবতী সাহার অকাল মৃত্যু স্মরণ করে সমবেতভাবে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই এবং ভগবান শ্রীবিতাগোপালের নিকট তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি নূতন শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন কুমারী মালতী সেন। আমাদের স্কুল থেকেই বছর তিনেক আগে তিনি লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা নিয়েছেন। গত কয়েক বৎসর ধরেই অনুভূত হচ্ছিল যে এক-শিক্ষিকায় স্কুলে নানা অসুবিধা—শিক্ষিকার অসুখবিসুখ আছে, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনও আছেই। নানা কারণেই এ বৎসর মার্চ মাস থেকে একজন সহায়িকা রাখা হয়েছে। সহায়িকা শ্রীমতী দুর্গা মুখার্জীও এই স্কুল থেকেই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করেছিলেন বছর তিনেক আগে।

সাধারণ ক্লাস বা সার্টিফিকেট কোর্সে ৩১শে মার্চে ২৫ জন, লেডী ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমায় ১৫ জন ছাত্রী ছিল। সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেয় ১৩ জন, পাশ করে ১২ জন। ডিপ্লোমার ৭ জন পরীক্ষা দেয় এরজনের বি.এস্‌সি পরীক্ষা থাকায় পরীক্ষা দিতে পারে নি, যারা জমা দিয়ে ছিল, তাদের পাশ করে; আরও একজন আবার পাশ করে—পরীক্ষায় পাশ করে নি। এবার ১৭ই এপ্রিল প্রদর্শনী হয়—ঐ দিনে এবং এর উপলক্ষে কিছু দ্রব্য এবার বেশ বিক্রী হয়েছে কিন্তু বছরের মোট বিক্রী কম—এজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। এবার ২২০৭৫ টাকার বিক্রী হয়েছে, ১৯৭৬-এ ৩০১২৫ টাকায়, ১৯৭৫-এ ২০৯৪৩ টাকায়, ১৯৭৪-এ ৩৬০১৫ টাকায় বিক্রী হয়েছিল। বছরে লেডী ব্রাবোর্ণে ছাত্রীসংখ্যা অনেক বছরের থেকেই বেশী এবং এদের মধ্যে অনেকেই স্কুল কাটিয়ে

পাশ করা অবধি কলেজে পড়ছে; আবার সাধারণ ক্লাশে ছাত্রী সংখ্যা জুনের পরীক্ষার পর কমেছে। এ বছরে সেলাই স্কুলের কার্যকাল এক বছরের থেকে পরিবর্তন করেছে — এই বছর বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ক্লাশ হবে, এ বছরের নভেম্বর মাস থেকে বুধ থেকে রবিবার পর্যন্ত ক্লাশ হবে. তিনদিন (মঙ্গল রবিবার) ছোট না. প্রথমত হয় না।

সেলাই স্কুলের স্থানাভাববশতঃ এবং ছোটদের মূলাবৃদ্ধিহেতু অসুবিধা চলেছেই।

নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়: ১৯৭৬ সালে ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা হিসাবে যথাক্রমে

১ম—৫২·২৭ জন		৪র্থ—৪৮·২১ জন	
২য়—৫০		৫ম—২২·২২	,,
৩য়—৪৪·৪৪	,,		

বার্ষিক পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে

১ম—৭৯·৪৪ জন		প্রাক্ শেষ পরীক্ষা পাশ ৫৬	
২য়—৭৮·৯৪	,,	পাশের হার ৯১·৬৪ মধ্যে	
৩য়—৬৮·৮৫	,,	১ম বিভাগে	১৪ ২৮ জন
		২য় ,,	৫৬·৫২ ,,
৫ম—৭৮·৯৪	,,	বি	৪১·৩
		অনুত্তীর্ণ	৩

পড়াশুনা ছাড়া সাফাই ছবি আঁকা সংগীত-প্রতিযোগী সামান্য বাগান সামান্য সূতাকাটা প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের প্রাথমিক পদ্ধতিগুলিও শেখানো হয়। তবে সূতা কাটায় উৎপাদন কিছুই হয় না বলা চলে, বাগানের সামান্য কিছু উৎপাদিত বস্তু বিক্রী হয়। বিদ্যালয়ের আয়তনীয় কয়েকটী দিন ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা উদযাপিত হয়েছে। প্রাক বুনিয়াদী সেলাই স্কুল ও নিম্নবুনিয়াদী মিলে সরস্বতী পূজা করা হয়েছে—ছাত্রছাত্রীদের খিচুড়ী প্রভৃতি প্রসাদ ভালভাবেই খাওয়ানো হয়েছে। প্রাক বুনিয়াদীর ডিসেম্বর যোগদান না করলেও শিশুরা কিছু চাঁদা দিয়ে থাকে, আমেও— শিক্ষামূলক ভ্রমণের সরকারী ব্যবস্থা থেকে ১ম ও ২য় শ্রেণীর 'ফুলীপাইন বাঘাবাইন' ছবি দেখান হয়েছে এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীকে বিদ্যান শিশু-উদ্যানে নিয়ে বন-ভোজন করানো হয়েছে বন-ভোজনের অতিরিক্ত খরচ ছাত্রছাত্রীরা বহন করেছে। ১৯৭৭-এর মার্চ পর্যন্ত ৬ ৩ হয়েছে মোট ৫৫ জন—সমস্যাকুলো ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১০।

প্রথম শ্রেণীতে ২টি বিভাগে ৭০ জন, ২য় ৫৪ জন, ৩য় শ্রেণীর ২টি বিভাগে ৮২ জন, শ্রেণীতে ৪৮ এবং ৫ম শ্রেণীতে ৩১ জন আছে

১৯৭৭-এর ২০ শে মার্চে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা ও খেলাধূলায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী মোট ৭০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানও হয়েছিল. এই অনুষ্ঠানে হেডটীচার স্কুলের টীন-এজার্স সংস্থার সাফল্যে সকলের সহযোগিতা ও সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি ঐ সভায় এও জানান যে সরকারী অনুদান অতান্ত দেরীতে পাওয়ার ঘটনা এখনও একই ভাবে চলছে এবং ডিসেম্বর ঐ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ শিক্ষকশিক্ষিকাদের বেতন ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচ নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এখানে এপ্রিল ১৯৭৬-এ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৭·৮ জন। বছরের শেষে ৩৬ জনকে উত্তীর্ণ করা হয়। ডিসেম্বরে শিশুদের দ্বারা একটি আনন্দ-

অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। জানুয়ারী ১৯৭৭-এ মোট ৪৮ জন ভর্তি হয়—সব সাকুল্যে বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫৮ জন। সরকারের মাসিক ৫০ টাকার সঙ্গে অভিভাবকদের দান যোগ করে কিছু টিফিন ফিডারের দৈনিক দেওয়া হয়, বিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচও এই থেকেই চালাতে হয়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় অসুবিধা চলছেই।

চাঁপি বিভাগের এই বার্ষিক প্রতিবেদন সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

With Best Compliments Of

CALCUTTA PACKING COMPANY

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিবাদন

গ্রহণ করুন।

সুভাষ লাইব্রেরী

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

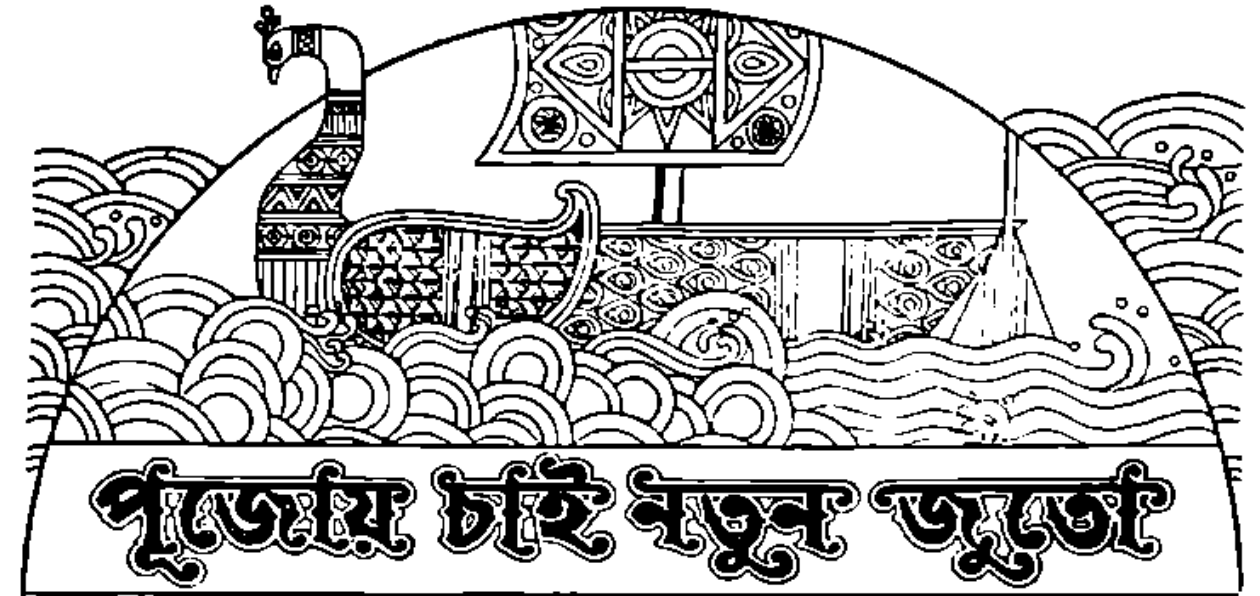

পূজোয় চাই নতুন জুতো

অ্যাডমিরাল ৫৭

মোকাসিনো ১৩

এক্সিকিউটিভ ১৭

কোয়াড্রিস ০৬

জীনস্ ৬৭

ট্রপার্স ৩৬

লোফা ১৫

স্যান্ডা ১৪

সিনড্যারেলা ৭৮

রিলাক্স ৭২

লিলিপুট ১৪

লিলিপুট ৪৪

ডলফিন ০৪

স্পু মক ৫৪

Bata

Bata understands shoes

Please consult with

Building

SAMAR RAY

Engineer, Builder, Contractor
2-20, S. K. Deb Road
Calcutta—48

With best Compliments from

Continental Commercial Co. Ltd.

PHONE
GRAM : JAYABE
RESIDENCE. 24-7150

Kapany Engineering Co. Private Ltd.

Distributors of : M/s. Balmer lawrie & Co. Ltd.
Generating Sets, Diesel Engines, Tramping Serew Spares
2, Ganesh Ch. Avenue, Commerce house (Basement)
CALCUTTA-700013

BRANCH:
HAROA BAZAR
P. O. HAROA.
24 PARGANAS NORTH.

গীতায়ন

। সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ সুযোগ ।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, খেয়াল, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, ভজন, পল্লীগীতি, আধুনিক, ইত্যাদি সমস্ত রকম সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে ইহা ছাড়া নূতন ও তবলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে

খোঁজ করুন :—

যোগেশ কুমার চক্রবর্তী
পোঃ অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

জনগণ ও সরকার

পশ্চিম বাংলায় জনগণের রায়ে এই রাজ্যে যে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে জনগণেরই সরকার, এই সরকারকে জনগণই প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন : বামফ্রন্ট সরকার শোষিত মানুষের সংগ্রামে সর্বদাই তাদের পাশে পাশে থাকবে।

* বেনামী উদ্বৃত্ত জমি বার করার কাজে সরকার জনগণের সাহায্য চান।

* কিনে খাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার

জে শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।

* পরীক্ষার টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয় ভবিষ্যৎ সমাজকেও পঙ্গু করবে। পরীক্ষার্থীরা তাই নিজেরাই এই টোকাটুকি বন্ধ করুন।

* জনগণের সঙ্গে সরকারও বলতে চান আয়ের ভিত্তিতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অবিলম্বে বেঁধে দেওয়া হোক।

সুখী ও সমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলা গড়ে তুলতে জনগণের সহযোগিতাই জনগণের কাম্য।

পশ্চিম বিভাগ

পূজার দিনে ধ্যান

— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ —

অধিবাস : মা, আমার আমি, আমার মনবুদ্ধি, আমার প্রতিমন-প্রাণ, আমার জীবনে ব্যবহার-যোগ্য সকল বস্তুকে অধিকার করিয়া তোমার বাসস্থান হউক।

সপ্তমী পূজা : অতীতের সুখ ও দুঃখ স্মৃতি যেন নূতন সৃষ্টির পথে বাধা না হয়; প্রতিটি আবেষ্টনে 'at home' অনুভব করিতে হইবে, কোন আবেষ্টনেই পরাজিত হওয়ার অধিকার সপ্তমী-পূজার সাধকের নাই।

অষ্টমী পূজা : বিশ্বের সব কিছুকে অন্তরঙ্গভাবে পাওয়া, প্রত্যেক সৃষ্টিকণিকে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে এক হইয়া নবত্ব-রচনা অষ্টমী দিনের সাধনা।

নবমী পূজা : কাম-ক্ষেত্রে বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে চাহিলে কিছুতেই সে কামুকের কাছে মাথা নত করিবে না। মাটি জল অগ্নি বায়ু শূন্য প্রকৃতি, প্রতিক নারী বস্তুকে কিছুতেই ভোগ করা চলিবে না। ওজনার ভিতর দিয়া শাসন করার সাধনা নবমী পূজা দিনের।

বিজয়া : বিশ্বের শৃঙ্খলা ও পরস্পর-ভাবনার মধ্য দিয়াই বিজয় লাভ হয়।

তুমাকে তুমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, তুমাহীন তুমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। তুমাকে বরণ করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সম্বন্ধে আরও নীচের বইগুলি দেখুন।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would go to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে বিশ্ব-জগৎ বদলাবার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ॥

॥ মুদ্রিত ॥

ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)
১ম খণ্ড (৪টি সূত্র)
২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)
৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)
ঈশোপনিষৎ
কেনোপনিষৎ
কঠোপনিষৎ
প্রশ্নোপনিষৎ
ঐতরেয়োপনিষৎ
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
মুণ্ডকোপনিষৎ

৯। শ্রীনিতাগোপাল—দর্শনে ও জীবনে
১০। স্বরাজের পূর্ণরূপ
১১। গীতাজয়ন্তী
১২। উপনিষদের শিক্ষা
১৩। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচনা ৩·০০
(গান্ধী স্মারকনিধি কর্তৃক প্রকাশিত)
১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২·০০

॥ পাণ্ডুলিপি ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১ ছান্দোগ্য উপনিষৎ
দশ বৎসরের বিশ্বপঞ্জী, পত্রাবলী ভাষণ
ইত্যাদি।

॥ ও প্রতিষ্ঠা বাবের ॥

নারী-প্রগতির ভূমিকা ৩·০০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিতাগোপাল চক্রবর্তী ও শিষ্যা সুধা সরকার কথা।
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ৫·০০

॥ শ্রীযুক্তা রেণু মিত্রের ॥

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন

ভলিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত

৪। রবীন্দ্র-দর্শন ৫·০০
৫। প্রাথমিক শিক্ষা ৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটী, অশ্বিনীনগর, (ডাক—দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা ৫৯) ২৪ পরগণা।

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাগুইআটী, পো: অশ্বিনীনগর কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o জে, বি, লাইব্রেরী) হাতিয়াড়া হইতে মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যা ১·০০ বার্ষিক ১২·০০

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রতিষ্ঠিত
নরনারায়ণ আশ্রমের মুখপত্র

"আমি বিশ্ব নাগরিক"

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-বাণী ॥

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার
সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়।
আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব সমন্বয়।"

এই বিশ্ব-ই আমার মহাতীর্থ

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৭ সম্পাদিকা-বেণুমিত্র ত্রিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"জীবনে প্রতিবিম্ব জিনিষটি কি? আমি তোমাকে যেভাবে যাহা বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাই তোমার আমার জীবনে প্রতিবিম্ব। তোমার এই প্রতিবিম্ব তোমার বিম্বের প্রতিরূপ না-ও হইতে পারে। আমি যে চক্ষে তোমাকে দেখিয়াছি, যেভাবে ভাবিয়াছি (reflect), তাহাই তো তোমার প্রতিবিম্ব (reflection)। তোমার সম্বন্ধে আমার ভাবনা তো তোমার স্বরূপ প্রকাশ না-ও করিতে পারে। আমার রাগদ্বেষবশবর্তী মনে তোমার যে প্রতিবিম্ব পড়িবে তাহা তোমার বিম্বের সত্য বাস্তব রূপের প্রতিবিম্ব নিশ্চয়ই নয়। ....দেখার প্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে বিম্ব প্রতিবিম্ব এক না ভিন্ন। পুরুষোত্তম যদি এই জগৎকে অনন্ত রূপে দেখেন ও আস্বাদন করেন, জগৎও যদি পুরুষোত্তমে 'অনন্ত' ভাবেই অবস্থান করেন, তখন বিম্ব প্রতিবিম্ব এক, অভিন্ন।....."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ,
—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ভাষ্য

উজ্জ্বলভারত

অগ্রহায়ণ পৌষ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীঃ ১৯৭৭ ত্রিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিপ্লবী সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ

– শ্রীসুনীতি সান্যাল

ওঁ নমো ভগবতে নিতাগোপালায়

নমো পুরুষোত্তমানন্দায় ॥

আজ নরনারায়ণ আশ্রমের আনন্দ উৎসবের দিন। আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জন্মোৎসবের দিন, তাঁর জন্ম দিনে সকল মানুষের সঙ্গে বসে তাঁর জীবন-কথা আস্বাদন করবার দিন। আজ তাই এই শুভলগ্নে নতমস্তকে আমার ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করি পরম গুরু আশ্রম দেবতা শ্রীশ্রীনিতাগোপাল দেবকে। জানাই আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে। আর তাঁরই প্রিয়জন আপনাদের জানাই আমার সাদর আহ্বান।

শাস্ত্রে আছে মহামানবদের জীবনের পুণ্যকথা শ্রবণ করলে পাপ দূর হয়, অর্থাৎ জীবনে মনুষ্যত্বের অগ্রগতির পথ খুলে যায়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের সারা জীবনখানি অনুধ্যান করলে বাস্তব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণের পাথেয় আমরা লাভ করতে পারব।

মনীষী হীরেন দত্ত মহাশয় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছিলেন—'He has a life, he has a call of life, he feels the life.....' তাঁর জীবন-দর্শনের আলোকে যেমনি পরিবার জীবনের সমস্যার সমাধান মেলে, তেমনি সমাজ জীবন, সন্ন্যাস-জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, বিশ্ব-জীবন এমনকি বিশ্বাতীত জীবন, যাপনের সমস্যার সমাধান মেলে।

অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার কাঁকরধা গ্রামে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জন্ম। পিতৃদত্ত নাম শরৎকুমার। রূপবান শিশুর বয়স বাড়তে থাকে কিন্তু মুখে কোন কথা ফোটে না। শরৎকুমারের মা মুক্তকেশী দেবী পুত্রের মুখে কথা ফোটাতে কৃচ্ছ্র সাধনায় ব্রতী হলেন। সাত বছর বয়সে মায়ের তপস্যার সাধনায় সিদ্ধি মিলল—শরৎকুমারের মুখে কথা জুটল আর তো তিনি বলতেন মায়ের তপস্যায় পাওয়া তাঁর সারা জীবনের মুখের কথা দিয়ে জগন্মাতা আর জগজ্জনের সেবা করাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শিশুকাল থেকে শরৎকুমারের প্রতি ঘটনার ভেতরেই একটা বিপ্লবী মনের সূচনা পরিলক্ষিত হত। বালক বয়সে একখানা ছবি দেখেছিলেন যে ছবিতে ছিল একটা মানুষ পৃথিবীটাকে সামনের দিকে ঠেলছে। বালক শরৎকুমারের ভেতরে নাড়া দিল পৃথিবীটাকে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার অত্যুগ্র বাসনায়। এই বাসনা তাঁকে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়েছিল বিশ্বের মানুষের সকল জড়তার বন্ধন, সংস্কারের বন্ধন মুক্ত করতে, সকল দ্বন্দ্বের সমাধান মূর্তি পুরুষোত্তম-যাত্রা পথের পথিক করতে। তাই রেখে গেলেন দার্শনিক জগতে এক নূতন আলোক-সরণিকা। ছোট বেলা থেকেই অন্যান্য ছোটদের মত শরৎকুমারের জীবন অতিবাহিত হয় নি। কেমন

একটা উদাসীনতা, অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পেত। খুব লাজুক ও কুনো প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মায়ের প্রতি অসীম ভালবাসা ছিল—গৃহস্থালী কাজে মায়ের সাহায্য করতেন। বাড়ীতে কালাচাঁদ বিগ্রহ ছিলেন। প্রত্যেক দিন মালা গেঁথে বিগ্রহের গলায় পরিয়ে আনন্দ পেতেন। কিন্তু সবকিছু অনুষ্ঠানের ভেতরে কী একটা কথা যেন আছে উদাস ভাবে তাই খুঁজে বেড়াতেন। তাই কৈশোরের চাঞ্চল্য তাঁর জীবনে দেখা যায় নি, একটা আপন ভোলা ভাব তাঁকে যেন ঘিরে থাকত। শিশুকাল থেকেই জামা কাপড়ের কোন রকম পারিপাট্যের ঝোঁক তাঁর ছিলনা। শীতকালে কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়েই শীত কাটিয়ে দিতেন। এই ছিল তাঁর শৈশবের চিত্র।

গ্রামের পাঠশালায় পড়া শেষ করে বরিশাল এলেন। শরৎকুমার মিছরি খেতে ভালবাসতেন বলে তাঁর মা লোক মারফত মিছরি পাঠাতেন। আর শরৎকুমার মিছরি খেতে খেতে মায়ের স্নেহের কথা মনে করে অঝোর নয়নে কাঁদতেন। মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে বরিশাল থেকে ভিয়ানো মাছ মায়ের জন্য মাথায় করে বয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়ী যেতেন। এমনি কত যে ছোট ছোট ঘটনা তাঁর ছোট বেলার জীবনে ছিল যা নাকি বর্তমান কিশোর সমাজের কাছে একান্ত শিক্ষাপ্রদ।

পাঠ্যাবস্থায় বরিশাল থাকাকালীন আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কালীশ পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষীগণ শরৎকুমারের গুণাবলীতে সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন। অতটুকু বয়সেই জগদীশ বাবু শরৎকুমারকে দিয়ে গীতার ক্লাশ করাতেন। যে মানুষটী দশজন মানুষের সামনে কথা বলতেও লজ্জা পেতেন সেই মানুষটী নিয়মিত গীতা ব্যাখ্যা করে শিক্ষক-ছাত্র শ্রোতাদের নিয়মিত আনন্দ দিতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আজ গীতার সর্ব্ব সমন্বয়বাদের অপূর্ব্ব ভাষ্যকার। বয়স যতই বাড়তে থাকে শরৎকুমারের অন্তরের তীব্র ভক্তি ও বৈরাগ্যের তীব্রতায় পিতা নীলকমল ঘোষ ভাবিত হয়ে পড়েন। তিনি পুত্রকে বিবাহ দিয়ে সংসারী করার উদ্দেশ্যে ১৩১০ সনে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে সুন্দরী কন্যা উষাঙ্গিণী দেবীর সহিত বিবাহ দিলেন। যিনি বিশ্বনাথের বিশ্ব-সংসার করতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, ছোট সংসার কি তাঁকে ধরে রাখতে পারে? তাই বিবাহ করেও ঐ সংসার তাঁকে বাঁধতে পারল না অথচ প্রচলিত বৈরাগীর মত তিনি ছোট সংসারকে দূরছাই করে ত্যাগও করেন নি। রাখা এবং ছাড়া এ দুটো দিকের তাঁর জীবনে সমান মূল্য ছিল। উনিশ বৎসর বয়স্ক যুবক শরৎকুমারের বিবাহের পর স্ত্রীকে প্রথম পরিচয় পত্রে লিখিত কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ করছি:—

"আমরা তো কামের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হই নাই ....স্থির জানিও যে দিন আমি সকলের হইব, সেই দিনই আমি প্রকৃতপক্ষে তোমার হইলাম...জগতকে যে ভাল না বাসে সে কি কখনও নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে? শুধু তোমাকে ভালবাসা মোহ, জগৎকে ভাল বাসিতে বাসিতে তোমাকে ভাল বাসার নাম প্রেম। যত খানি জগৎকে ভাল চক্ষে দেখিয়াছি, তোমাকে ততখানি সুন্দর দেখিয়াছি। যতটুকু জগতের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া ভালবাসিতে পারিয়াছি; তোমার সঙ্গেও ততটুকু পারিয়াছি —ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহার নাম মোহ। তুমি,

ভগবান ও জগৎ এমন ভাবে যুক্ত একটাকে বাদ দিয়া অপরটাকে ভালবাসিতে গেলে উহা ভালবাসা না হইয়া মোহ হইয়া যায়। একটাতে আটকাইয়া থাকিবার নাম মোহ আবার শ্রীভগবানে আটক হইয়া থাকিবার নাম প্রেম। কারণ জীব কোন একটা বিশেষ বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া থাকে, কারণ কাম স্বার্থযুক্ত আর প্রেম নিষ্কাম স্বার্থশূন্য—কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে আসক্ত না করাইয়া শ্রীভগবানের ভিতর দিয়া জগতের সঙ্গে মিলন করায়। আগে স্বামীকে জগতের কাছে অর্পণ কর পরে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে অর্পণ কর। যে দিন জগৎ আমাকে আদর করিবে সেই দিনই আমি তোমার মাঝে বিহার করিব। উপরোক্ত তাঁর এই কথাগুলি থেকেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁর জীবনে চলার পথ ও চলার উদ্দেশ্য কোন্ ভাবধারার উপর ছিল।

বিবাহের কিছুদিন পর শরৎকুমার যখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য কলকাতায় এলেন তখন থেকে তাঁর জীবনে আরম্ভ হল নতুন আরেক অধ্যায়। ভগবৎ প্রেমের উন্মাদনায় শরৎকুমার স্থির থাকতে পারেন না, পড়াশুনায়ও মন দিতে পারেন না—এমতাবস্থায় জনৈক ভক্ত তাঁকে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভের সহায়ক রূপে নিয়ে যান ভগবান শ্রীশ্রীনিতাগোপাল দেবের কাছে নবদ্বীপস্থ আশ্রমে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পিতৃপিণ্ডদানে গয়ায় গদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শনে একেবারে ভাবান্তর হয়ে ফিরে ছিলেন দেশে—শরৎকুমারের জীবনেও শ্রীশ্রীনিতাগোপাল-দর্শনে কেমন এক নতুন দৃষ্টির প্রেরণা এল অন্তরে। অবধূত শ্রীনিতাগোপাল তাঁকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করলেন। শ্রীনিতাগোপাল-স্পর্শে ওই লাজুক আর কুনো মানুষটী ক্রমে গড়ে উঠলেন বিপ্লবী রূপে।

শরৎকুমারের প্রাণের যত বিরাট প্রাণকে যিনি সর্ব্বস্তরের মানুষের সেবায় লাগিয়ে দর্শনের জগতে সকল বিপরীতের সমন্বয়ধর্মী দর্শনের ভাষ্যকার রূপে রূপান্তরিত করে গড়ে তুলেছিলেন, সেই শ্রীশ্রী-নিতাগোপাল দেবকে আজ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্ম-বাসরে আমার ভক্তি-অর্ঘ্য জানিয়ে বলি তাঁর কথা যিনি আজও অনেকের কাছেই অপরিচিতই হয়ে আছেন। প্রথম সাক্ষাৎকারে পরমহংসদেব বলে-ছিলেন 'নিতা, তুই এসেছিস্, আমিও এসেছি।' সেদিনকার সমস্যার এই দুই জনের অবতরণ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। আল্লা, যীশু, কালী, কৃষ্ণ সমস্তই সমন্বয় দেখিয়ে পরমহংসদেব মানুষের একদিকের মূলসংকটকারী সমাধান দিয়ে গেলেন আর শ্রীনিতা-গোপাল জীবনের বাস্তব ও পারমার্থিক সকল পথেরই ব্রহ্ম-মূল্য প্রমাণিত করে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সর্ব্ব সমস্যার সমাধান দিয়ে সমস্ত বিপরীতের মিলন-সূত্র রেখে গেলেন। তাই তো পরমহংসদেব বলেছিলেন 'ট্যাঁকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিতাগোপালেই সম্ভব'। ট্যাঁকে টাকা রেখেও যে বিশ্বের অতীত সত্তায় ডুবে যাওয়া যায় এ কৌশলের খবর শ্রীনিতা-গোপালই দিতে পারেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'আমি তো বেঁচে গুছে নেব, নিতা পচা গোবরে ঘুঁটে দেবে'। বর্ত্তমান বিশ্বের সকল দ্বন্দ্বের বিকৃতিতে যে পচন ধরে গেছে—তাতে শ্রীনিতাগোপাল জীবন-দর্শন আজ সর্ব্ব স্তরের মানুষের কাছে অপরিহার্য্য। যে জড় জগৎ ছিল অধ্যাত্ম জগতে 'মিথ্যা' স্বরূপ, তিনি তাকে ভাগবতী মূল্যে প্রমাণিত করে বললেন, 'ব্রহ্মও যেমন সত্য, জড় জগৎও তেমনই ব্রহ্মেরই নতুন নিত্য সত্তা'। এমন করে জড়-অজড়, বিদ্যা-অবিদ্যা, ব্রহ্ম-মায়া, নিত্য-অনিত্য, চৈতন্য-অচৈতন্য, সাকার-আকার

-নিরাকার এবং ত্রিগুণের ক্ষেত্রে সত্ত্ব-রজ-তম-র যে মূল্য স্বীকার করে শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক বিচার ওপরে দাঁড় করিয়ে সর্ব সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করে এক-বিশ্ব রচনার common platform তৈরীর সূত্র রেখে গেলেন। ঐ মুহূর্তেই সন্ন্যাসিপ্রবর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন, 'আমি বিশ্ব-নাগরিক, এই বিশ্বই আমার মহা মঠ।' তিনি এমন বিশ্বজনীন দর্শনের সমন্বয়ের আলোকে বহু গ্রন্থরাজি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আজ থেকে প্রায় শত বৎসর আগে তাঁর লিখিত জাতি-তত্ত্ব গ্রন্থখানি হিন্দুর প্রচলিত সমাজে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তিনি সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র মথিত করে জাতি বিচার বা অস্পৃশ্যতা যে শাস্ত্রসম্মত নয় তার প্রমাণ লিপি-বদ্ধ করে গেছেন আজকের দিনে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ আন্দোলনে এই পুস্তকখানি খুবই মূল্যবান পাথেয়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁরই জীবন-স্পর্শে নিজের জীবনকে নিবেদিত করেছিলেন ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বকে এই দর্শন নয় ছাঁচে গড়বার কাজে। প্রয়াত সাহিত্যবিনোদ চুনীলাল মিত্র উজ্জ্বল ভারতের সপ্তদশ বর্ষের ১০-১১শ সংখ্যায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমা-নন্দ প্রবন্ধে লিখেছেন 'মহাপণ্ডিত ও জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কাণ্টের কথা স্মরণে রাখিয়া মনীষী হোয়াইটহেডের সহিত একমত হইয়া বলা যায় যে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে মহামতি প্লেটোর পর কোনও তেজস্বী দার্শনিকের বলিষ্ঠ মতবাদ সৃষ্টি হয় নাই—পরন্তু সবই প্লেটোর উপরই মন্তব্য, টীকা ও ব্যাখ্যা। এই ভাবে আমরাও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে প্রাচ্য ভূখণ্ডে আচার্য শঙ্করাচার্যের পর কোনও সৃজনী প্রতিভার দ্বারা তেমন সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ দর্শন গড়িয়া ওঠে নাই। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ এই বিরাট অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত তত্ত্বাদিক গ্রন্থ, তাঁর কর্মবহুল দীর্ঘ জীবনের কর্ম ও ভাষণ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক কথায় তপস্বী-ঋষি ও পণ্ডিত, সন্ন্যাসী ও আদর্শ সমাজী শ্রীমৎ পুরুষো-ত্তমানন্দ সমন্বয়ের আদর্শ জীবন যাপনে জনকের জীবন যাপন করেন। তাঁহার ভাষা ও প্রকাশের অপূর্ব সংযমশ্রেণী দীপ্তিময় সুনিশ্চিতকা ও তেজস্বিতার ভাস্বর।'—

'তিনি ছিলেন নিজেই একটা Institution—প্রতিষ্ঠান, শুধু একজন ব্যক্তি নন। তাইতো তাঁর জীবনালোচনায় পাওয়া যায় মানুষের জীবনে হওয়ার পরিপূর্ণতার ছন্দ ও কৌশল।' আজন্ম সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সমস্যাকে এড়িয়ে একান্ত আত্মমুক্তির উপাসনা কোন দিনই করেন নি। তাঁকে কোন এক বিশেষ উপাধি-তেই ব্যাখ্যা করা যায় না। সামগ্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল তাঁর জীবন! সমস্ত রকম শোষণের ক্ষেত্রে তা ধর্মই হোক্ রাষ্ট্র-নীতিই হোক, পরিবার-নীতিই হোক তিনি নির্ভিক চিত্তে মূর্ত প্রতিবাদ রূপে সদাই সক্রিয়মান ছিলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি কিছু দিনের জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে ছিলেন। বৃন্দাবনে থাকা কালীন ভক্ত পুরুষোত্তমানন্দ একদিকে যেমন রাধা-কৃষ্ণ প্রেমে হা কৃষ্ণ হা রাধা বলে অঝোরে কেঁদে ভাসাতেন আবার আরেক দিকে তিনি শুনলেন বৃন্দাবনে ধোপা, ডোম, মেথর প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিরা তথাকথিত কূয়োর জল স্পর্শ করতে পারেনা। তাদের পানীয় জলের দারুণ কষ্ট। পুরুষোত্তমানন্দের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি তখনকার বৈষ্ণব

মণ্ডলীর কাছে গৌর-তত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাদের চিত্ত জয়ীভূত করে অস্পৃশ্যদের প্রতি এই অন্যায় আচরণ বন্ধ করতে সক্ষম হলেন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন তিনি মাধুকরী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন একদিন এক গোপা বাড়ী তিনি মাধুকরী করতে গেছেন তারই বর্ণনা দিয়ে লিখছেন—"প্রথমবার যখন বৃন্দাবনে মাধুকরী করিতাম, একদিন এক গোপা-বাড়ীতে মাধুকরী করিতে যাই; তাঁহারা বলিলেন, আমরা গোপা, এখানের কোন বাবাজী আমাদের এখানে আসেন না—আপনি নিবেন? আমি বলিলাম সকলেই কৃষ্ণের জন। আমি জাতি কুলের বিচার করিতে আসি নাই। আপনারা মাধুকরী দিন। তাঁহারা দিলেন—আনন্দ পাইলাম। বৈকালে দেখি বহু গোপা আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সোনার গৌরাঙ্গের সামনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত—আমি সেখানে থাকিতাম। তাঁহারা প্রাণের আদর সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছেন। আমি তাঁদের আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম ও কাঁদিতে লাগিলাম। আমিও তৃপ্ত হইলাম, তাঁহারাও তৃপ্ত হইলেন। কিসের জাতি? বিশ্বে সব এক পুরুষোত্তম-জাতি।"

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্রিটিশের শোষণের বিরুদ্ধে। সিংহ গর্জ্জনে ভারতের বিশেষ করে বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার বক্তৃতার মাধ্যমে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জন সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটী বক্তৃতায় তিনি মানুষের রাজনৈতিক চেতনার সাথে সাথে ধর্ম্ম নীতি, পরিবার নীতি, সমাজ নীতি অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিকতার বোধকে জাগ্রত করবার প্রয়াস পেতেন। ব্রিটিশ সরকার কয়েকবার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল তিনি কারাগারের অভ্যন্তরে বসে প্রাণধন পুরুষোত্তম-দর্শনের ভিত্তিতে শ্রীনিতাগোপাল-জীবনাদর্শের আলোকে সামগ্রিক সমন্বয় চিন্তাধারায় এগারখানা প্রধান উপনিষদের ও গীতার ভাষ্য রচনা করে দর্শনের জগতে এক বিরাট অবদান রেখে গেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে কংগ্রেসকে বুকের রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন তার ভেতরে যেদিন দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ তার থেকে সরে দাঁড়ালেন। এমনি করে সংঘ-জীবন স্থাপনকারী পুরুষোত্তমানন্দ সত্যব্রত সমিতি, গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী, স্বরাজ সেবক সংঘ, বিশ্ব-কল্যাণ সমিতি প্রভৃতি নিজে গড়ে তুলেছেন আবার যখনই তাতে আদর্শ-চ্যুতি দেখেছেন তখনই সরে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের বিশুদ্ধি আনবার জন্য পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ বহুবার অনশন করে তাঁর ব্রত পালনে জয়ী হয়েছেন। ব্রিটিশ আমলে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে একুশ দিন অনশন করেছিলেন। পরাধীন ভারতে সিনেমা বয়কট আন্দোলনে ৪০ দিন, বিলাতী বয়কট আন্দোলনে ২৮ দিন, দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাবার আগে ৪ দিন, সরকার কর্তৃক বক্তৃতা দিতে নিষিদ্ধ হওয়ায় ৭ দিন, জেলের ভেতরে রাজ-বন্দীদের ন্যায্য সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে ১৮ দিন অনশন করেছিলেন। তাঁর সারা জীবনে বিপ্লবী পদক্ষেপের সামান্যতম তথ্য আমি এখানে বিবৃত করলাম। ভাগবতের নিমি রাজা প্রার্থনা করেছিলেন: "আর্ত্তিং প্রপদ্যে দেহোঽইহল ভাজাম্"—তিনি

প্রার্থনা জানালেন জগতের দেহধারীদের আকির প্রপন্ন যেন হতে পারি। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবনেও দেখেছি দুর্গত মানুষের দুর্গতি নিজের জীবন দিয়ে শুষে নেবার কী অদ্ভুত আর্তি তাঁকে বলতে শুনেছি মাংস খেতে হাড়ের মধ্যে যে greeze থাকে তাকে খেতে হলে যেমন চুষুক দিয়ে একটান মেরে ভেতরে নিতে হয় তেমনি মনে হয় জগতের সমস্ত নরনারীর প্রাণের বেদনাকে একটান মেরে শুষে নেই। প্রাণ-সাধক পুরুষোত্তমানন্দের এই-ই ছিল সারা জীবনের চিত্র।

এমনই একজন মানুষের জীবন-দর্শন ও তাঁর পবিত্র দেহকে বুকে করে নরনারায়ণ আশ্রম বসে আছে জগতের সর্ব্ব মতবাদক্লান্ত মানুষের মিলন সেতু রচনার আশায়। তিনি জীবন-সায়াহ্নে বলেছিলেন "আশ্রম রইল, বিশ্বের ব্রহ্মবিদ্যা এইখান থেকে প্রচারিত হবে"। তাঁরই জন্ম বাসরে তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাই—পুরুষোত্তমানন্দ-জীবন জয়যুক্ত হোক্, পুরুষোত্তমানন্দের বিশ্ব ও বিশ্ববাসী জয়যুক্ত হোক।

জীবন-প্রেমিক পুরুষোত্তমানন্দ

—শ্রী শান্তশীল দাশ

কত-না মানুষ দেখি প্রতিদিন: অতৃপ্ত সবাই; বিকৃত জীবনধারা বয়ে চলে—বিভ্রান্ত জীবন; এলোমেলো পথ চলা, কোথা যাবে কিছুই জানেনা —কারো মুখে বিষণ্ণতা, উচ্ছৃঙ্খল কত শত জন।

আড়ম্বর বাড়ে শুধু, আলো-ঝলমল চারিধার, বিলাস বিভব কত, অজস্রতা, তবু কী রিক্ততা! দুবেলা জোটে না অন্ন, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, কত জন্ম পথে পথে, সেই পথে জীবনের শেষ!

এদের মুখের পানে চেয়ে মনে জাগে কি বেদনা! 'দিন যাপনের গ্লানি' 'প্রাণ ধারণের গ্লানি' নিয়ে এই চলা, এই খাসা—বেঁচে থাকা, এই কি জীবন! জীবনকে জানলো না, পেল নাক জীবনের স্বাদ।

সংখ্যায় অনেক এরা, জীবন-প্রেমিক কেউ নয়; সার্থক হ'ল না তাই ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে। অতৃপ্তির বহ্নিজ্বালা বুকে নিয়ে শেষ হয়ে গেল এমনি ক'রে শেষ হচ্ছে প্রতিদিন অসংখ্য জীবন।

এই সব মানুষের জনতায় দুই একজন আসে এই পৃথিবীতে, কী প্রসন্ন জীবন তাদের। সেই প্রসন্নতা তারা ছড়ায় চলার পথে পথে, দূর করে দিয়ে যায় প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি।

অন্ন সেই মানুষের মাঝে ছিলে তুমি একজন, জীবনকে ভালবেসে, উষ্ণতার স্পর্শ দিয়ে গেলে অগণিত মানুষকে, সেই স্পর্শে ধন্য হ'ল তারা; শিখলো তোমার কাছে, এ জীবন অর্থহীন নয়।

বসন গৈরিক ছিল, প্রেমপূর্ণ ছিল ও-হৃদয়; নিমেষে আপন করে নিতে তুমি সকল মানুষে; তোমার উজ্জ্বল মুখ, আর ওই বাণী প্রাণময় ভুলবে না কেউ তারা, যে তোমায় পেয়েছে।

লোকোত্তর মানব শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

—শ্রীহৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

অবনীর এ-অঞ্চলে যাঁদের পদাঙ্কে আঁকা আলপনা আঁকা তাঁরা হলেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অমিতাভ বুদ্ধ। মানবের মনোমন্দিরে মনিময় সিংহাসনে এঁরা অধিষ্ঠিত। আমরা এঁদের অবতার জ্ঞানে অর্চ্চনা করি। বৌদ্ধদের চিন্তাভাবনায় এঁরা আবার লোকোত্তর মানব। এঁদের স্পর্শ স্পর্শমণির স্পর্শ। সে স্পর্শে সব কিছু সোনা হয়ে যায়। এঁদের চরিত্রে কিন্তু আবার পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণও দৃষ্ট হয়। নাট্যকার ভবভূতির কবিতায় লোকোত্তর মানবের লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোঽপি বিজ্ঞাতুমীশ্বর ॥

আমি আজ এ' প্রবন্ধে আমাদের অবধূত মহারাজকে ঐ পবিত্র পঙ্‌ক্তিতে আনার প্রয়াসী। তাঁর চরিত্র চিত্রণে স্বতঃই তিনি প্রতিভাত হন কুলিশের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল। প্রমাণ দিই—পুণ্যস্মৃতি বাসরে স্বর্ণ-লেখ কথা তুলে ধরে। ১৩৩১ সনের ঘটনা। বরিশালের ব্রজমোহন জাতীয় বিদ্যালয়। পরিচালকবৃন্দ তাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি করেন। কুটিল ভাবধারায় পরিচালিত বিদ্যাপীঠ অবধূত মহারাজের বরদাস্ত হয় না। ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তিনি আর একটি জাতীয় স্কুল স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। আত্মবিশ্বাসের স্বর্ণসূর্য উঁকি দেয় হৃৎ-গগনে। মনোবীণায় ঝঙ্কার তোলে ভগবানের বাণী—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ ॥

১৩৩১ সালের ১লা পৌষ অনশন ব্রতে ব্রতী হন অবধূত মহারাজ। চমকে দাঁড়ায় বরিশালবাসী। নিরাশা-সাহারার বুকে হঠাৎ করে পড়ে যেন চেরাপুঞ্জীর দু ফোঁটা বৃষ্টি। চারণ কবি মুকুন্দদাস, গোপেশ্বর সাহা দুই সহস্র মুদ্রা হস্তে এগিয়ে আসেন। জনগণের জড়তার ঘুমঘোর কেটে যায়। মুষ্টি মুষ্টি দানে সৃষ্টি হয় বিদ্যাপীঠ। বরিশালের বুকে স্বামীজীর বিজয় বৈজয়ন্তী ধ্বজা উড্ডীন হয়। ধর্ম্মপ্রাণ জনগণের স্বজনের ধর্ম্মে অমরত্ব লাভ করেন অবধূত মহারাজ—

ক্ষীয়ন্তি কে রাজরথা সুচিন্তা
অথো সরীরং পি জরং উপেতি
সতং বচো ন জরং উপেতি।

এবার পুরুষোত্তমানন্দের কুসুম কোমল প্রাণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। স্বামীজীর শিষ্যা সুধা। কলেজের তিনি ছাত্রী। কলেবর দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে। একদিন জানা যায় বুকে বাসা বেঁধেছে শিবের অসাধ্য ব্যাধি ক্ষয়রোগ। স্বামীজী সে সংবাদে বুকভরা বেদনায় সিরাজগঞ্জে রওনা হন। কদিন সেখানে অবস্থান করেন। আঁধার অন্তরে শিষ্যা পান আলোর দিশারীকে। বিদায় বেলায় সুধা গুরুর চরণ বন্দন করেন তপ্ত অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে। সে কাতরিমার কান্নায় স্বামীজীর বক্ষও

প্লাবিত হয় অশ্রুর সহস্র-ধারায়।

স্মরণের আর একটি ঘণ্টধ্বনি মুক্ত করি। ১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ। প্রতিভা রায়ের নাসিকা থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। সূর্যোদয় থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত স্বামীজী শয্যাপার্শ্বে জননীর ন্যায় বিরাজমান। অপর একদিনের ঘটনা—অসহ্য যন্ত্রনায় ঘাষাতুরা রায় শিল্পী। যামিনীর তখন তৃতীয় যাম। পায়ধানা গিয়াছেন শিল্পী। সে দ্বারে দণ্ডায়মান গুরু। রাত্রির স্তব্ধ শান্ত পলগুলি বিনিদ্র নয়নে কেটে যায়। কোমল প্রাণের আর কত প্রমাণ উল্লেখ কোরব? মধুরের মত ছন্দের শাখা মেলে ব'লতে ইচ্ছে হয়—

কভু হিমাদ্রি অচল অটল কভু গলে সুধা-বান
সে স্রোত-সিনানে কত তাপিতের স্নিগ্ধ শীতল প্রাণ।

লোকোত্তর মানব মাত্রই হন প্রতিভাবান তাঁদের মাঝে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি দেখা যায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মশায় প্রতিভা প্রসঙ্গে বলেছেন—"প্রতিভা অনেক প্রকারের থাকে। দুরতিক্রম বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া কার্যকরী হওয়াই প্রতিভার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান, নিঃস্বার্থতা ও পূত চরিত্রের মহিমা বর্ত্তমান থাকে তবে তাহা পুষ্পবৃষ্টিরই মত বিধাতার আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আবির্ভূত হয়"। আমাদের অবধূত মহারাজকে উদ্দেশ্য করেই যেন মিত্র মশায়ের এ উক্তি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ নিঃসন্দেহে এক প্রতিভাধর পুরুষ। তাঁর ভাস্বর প্রতিভার ভাস্কর তো বেদান্তভাষ্য ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯৩০ সনে তাঁর প্রতিভার ইন্দু-ছাড়িতে উদ্ভাসিত হয় প্রয়াগের কুম্ভমেলা। ১লা ফেব্রুয়ারী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমে আবার হয় ভাষণ। সে অমৃত কথায় আবাল বৃদ্ধ বণিতার আঁখি হয় অশ্রু সজল। মায়ের দল তাঁকে ডেকে বলেন,—"বাবা, তুমি কেঁদে জগৎকে মাতিয়ে তোল। তোমাকে দিয়ে জগৎ শিখুক, তারা কি ছিল, কি হয়েছে, কি হ'তে হবে।" এমনি তাঁর প্রতিভার বিভা যেখানে গিয়েছেন সে স্থানই আলোকিত করেছেন। আর বিশ্বজনীন প্রেমে তো স্বামীজী লীন হয়েই ছিলেন। নিখিল বিশ্বখানি তাঁর জীবনে ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মর্ত্তোর মানবের জন্য কি স্নেহ মমতা! সাবিত্রী কাব্যে শ্রীঅরবিন্দের যে বাণী তা যেন অবধূত মহারাজের প্রাণের কথা—

In me the spirit of immortal
Stretches its arms out to embrace mankind.

লোকোত্তর মানব হন বিপ্লবী। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন মহাবিপ্লবী। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জীবনের পর্বে পর্বেও আমরা বিপ্লবের স্ফুরণ দেখতে পাই। তাঁর কৈশোর কালের কথাতে আসি। আমাদের সবাবিত্ত সংসারে উপাদেয় খাদ্যের সিংহ ভাগ পুরুষদের ভাগেই জোটে। ঘোষ পরিবারেও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। শরৎকুমার অধ্যয়ন করার জন্য দূরে থাকেন। একবার ছুটিতে বাড়ী এসে দেখেন বৌদিদের খাদ্যের তেমন ব্যবস্থা নাই। তিনি জেঠিমার উপর উষ্মা প্রকাশ করেন। হঠাৎ আগ্নেয়গিরির যেন অগ্নুৎপাত ঘটে। এক ঘুমন্ত বিপ্লবী মন জেগে উঠে। তিনি অবধূত সন্ন্যাসী হয়ে সংসারী সেই তো এক মহা বিপ্লব। বৃন্দাবনের

কূপে অস্পৃশ্যদের অধিকার দিয়ে আর এক বিপ্লব সাধন করেন।

অগ্নিমন্ত্রেও দীক্ষা দেন লোকোত্তর মানব। একটি প্রদীপ শিখা থেকে যেমন শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়ে দীপাবলীর উৎসব ঘটায় তেমনি তাঁদের সংস্পর্শে সহস্র সহস্র প্রাণ-প্রদীপ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। আমাদের স্বামীজীও ঐরূপ এক স্বর্ণদীপ। তাঁর শিখায় প্রজ্বলিত হয় বরিশালের আপামর জনের প্রাণ। তারা স্বামীজীর নিকট লাভ করে আত্ম-জাগৃতির অমোঘ-মন্ত্র। অগণিত তরুণের মুখে অরুণের আভা আভাসিত হয় জড়তার পাষাণ ফলকে প্রতীপ হয় জ্যোতির্ছটা। কুলী, মজুর, জাহাজের খালাসীরা পর্যন্ত বর্ণমালা আরম্ভ করে। কবি-গুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ব'লতে ইচ্ছে জাগে—

এ যেন বিপুল অগ্নিকুণ্ড
আকাশে আলোড়ি শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিতে তুণ্ড
কৃষার দহন জ্বালিয়া।
নর নারী সবে আনিয়া তূর্ণ
প্রাণের পাত্র করিয়া পূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
জীবন আহুতি ঢালিয়া॥

লোকোত্তর মানবের মাঝে দেখা যায় স্বদেশ প্রেম। অবধূত মহারাজের স্বদেশ প্রেম সে তো নিকষিত হেম। দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে আপনার প্রাণপুষ্পটি তিনি উৎসর্গ ক'রেছিলেন। সাধারণ দেশ-নেতার মত তিনি শুধু আলোকোজ্জ্বল অলকা-পুরীতেই, বক্তৃতা দেন নি। সুদূর নিরক্ষর পল্লী-গ্রামেও তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল। স্বয়ংসিদ্ধ নেতা সেজে তিনি কোন স্বরাজনীয় পথেও পা বাড়ান নি। তাঁর স্বদেশ প্রেমের কথা স্বর্গীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চাঁদ মুখেই বলি—"প্রেমের অরবিন্দ ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ চরকারূপী রবিকর যার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো অগ্রবর্তী হয়ে ভারতকে স্বরাজ লাভের পথে মুক্তি-রাজ্যের পথ দেখিয়ে চলবে—তাকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন, ইহা দূর থেকেও আমার হৃদয়ে আশা ভরসার সঞ্চার করে"।

নতুন সমাজ সৃজনের প্রেরণাও থাকে লোকোত্তর মানবের। 'The old order changeth yielding place to new,'— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দও পচা গলা সমাজকে নতুন ছাঁচে গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের পার্ষদ। পরিচয়ের ছিলেন নিত্যগোপাল। তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। তারাপদ নামে এক ভদ্রলোক কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে উপনীত হন। পরমহংসদেব তার কিছুই স্পর্শ করেন না। পরন্তু ভদ্রলোক চলে গেলে সে স্থানের মাটি তুলে ফেলে গোবর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দেন। ভদ্রলোক সে কথা জেনে আত্মহত্যায় উদ্যত হন। ভগবান নিত্যগোপাল অভয় দান করে তাঁকে আপন আশ্রমে আশ্রয় দেন। শ্রীগুরুর ঐ জীবন-দর্শন বুকে নিয়েছিলেন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ। ধনীবাবুর অনুনয়ী রক্ষিতার হাতের অন্ন সন্ন্যাসী হয়েও তাই তিনি গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। বাহুবনিতার আলয়ে ভাগবত পাঠ ক'রে তাদের পুরুষোত্তম-পথে আনতে চেয়েছিলেন। বৃন্দাবনে অস্পৃশ্যদের এনে দিয়েছিলেন কুয়োতে জল আনার অধিকার।

তিনি চেয়েছিলেন নতুন সমাজ সৃষ্টি ক'রতে। তাঁর ছিল সাধ ছিল মর্ত্যের বুকে স্বর্গ নামিয়ে আনার। আমার অনুভূতিতে অবধূত মহারাজ যথার্থই লোকোত্তর মানব। তাঁর পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে একটি কবিতার কলি অঞ্জলি দিয়ে বক্তব্য শেষ করি

প্রভু, তোমার জীবন-সিন্ধু মথনে উঠে শুধু সুধা
পান ক'রলে পেট ভরে না জাগে আরো মনের ক্ষুধা
আরতি আজ তোমার একটি মাটির প্রদীপ আলি।
ও অমৃতলোক নিবাসী দাও হে কোটা আশিস্ ঢালি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের প্রাণ

—শ্রীজীবন কানাই রায়

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলেন জীবনের সাধনা দুই মুখী। একটী শরণাগত হওয়ার, অপরটী জীবনের সমগ্রতার সাধনা বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে মিলের। দুইয়ে মিলিয়া এই সমগ্রতার সাধনা। আমরা নিতে পারিনা এবং নিতে চাই না কারণ ইহাকে বড় কঠিন মনে হয়। সমগ্রতার সাধনা নিলেই সমস্ত কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয় যেমন জীবত্ব, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, নরত্ব, নারীত্ব, স্বামীত্ব, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, পরিবারিকতা, জাতীয়তা, বিশ্বনাগরিকতা, ইহকাল ও পরকালের সত্তা—এই সব কিছুর সমমূল্য দিয়া আবার নিজের মূল্যও রক্ষা করিতে হইবে। তাই আমরা ভাবি ইহা অপেক্ষা ঘরের কোণে ঠাকুরের সামনে ধ্যানে বসিয়া উদাসীন হইয়া থাকা অনেক ভাল, আমার চোখের সামনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবে তাহার উপর দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আসে না। কিন্তু শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ঐ সমগ্রতার প্রাণের পথ বাছিয়া লইয়া কত দুঃখ কষ্ট বেদনা তাঁহার জীবনে হজম করিয়া মানুষকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীনিতাগোপালকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন, ঠাকুর তোমার কৃপায় মাটির দাবী ও আকাশের দাবী এক করিয়া এই মাটির জগৎকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম গোলোক বৈকুণ্ঠে। পথ আমার নিরাপদ, বুদ্ধি আমার নাই, তাই ধনজন আমার নাই। সম্বল শুধু প্রাণ। প্রাণের তাড়নায় মানুষ পাইবার জন্য তাহাদের কামেষ্টনের মধ্যে, তাহাদের সকল সমস্যার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি, তাহাদের সঙ্গে এক হইতে চাহিয়াছি, তাহাদের দায়িত্ব বহিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি যদি তাহাতেও তাহাদের পাই এই লোভে। কী না করিয়া গিয়াছেন এই স্বামীজী মানুষের জন্য। স্বামীজী হইয়াও স্বামীজীর মত করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার সামনে যে লোকই আসিয়াছে কি নারী কি পুরুষ, যে যেরকম দুঃখ

নিয়া আসিয়াছে তাহাকে সেই দুঃখের থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নিজের জীবনকে পণ করিয়াছেন কিন্তু তাহা শুধু তাহার নিজের জন্য নয়। এমন করিয়া মানুষের দুঃখ কষ্ট বেদনার সাথে এক হইয়া যাওয়া কোন স্বামীজী কোন মহারাজ কোন গুরুর মধ্যে তো দেখিতে পাই নাই। আমাদের দেশ এত উন্নত হইয়াছে তবুও না। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এক জায়গায় বলিতেছেন, গুরুগিরি ব্যবসাগিরি স্বামীগিরি করিতে পারি নাই। করিলে প্রচুর শিষ্য করিতে পারিতাম, মানুষের বা অর্থের দুঃখ থাকিত না। প্রণাম লইতাম, পাদোদক খাওয়াইতাম, টাকা পাইতাম। সংসারীদের চেয়েও সুখে থাকিতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে দুঃখের পথের যাত্রী। তুমি আমি সংসারে সুখ ভোগ করিতে আসি নাই। সত্যই তো তাই। তিনি যদি গুরুগিরি করিতেন তাহা হইলে অনেক অনেক শিষ্য করিতে পারিতেন। আমরা শুনিতে পাই একজন শিষ্য বলে আমার গুরুদেবের ৫০০০ হাজার শিষ্য, আরেক জন বলে আমার গুরুদেবের ১০,০০০ হাজার শিষ্য। এই শিষ্য সংখ্যা দিয়া বিচার করা হয় তাহাদের গুরু কত বড়। একবারের জন্যও ভাবিয়া দেখে না তাহারা জীবনে কি পাইয়াছে। সত্যই কি কিছু পাইয়াছে? এমন করিয়া আজও কেহ গুরুর সম্বন্ধে ভাবে না। ভাবিলে উপযুক্ত গুরু হইতে কিছু পাইয়া নিজের জীবনকে বাড়ানোর চেষ্টা করা হইত। তাই তো পুরুষোত্তমানন্দ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জন দাস অশ্বিনী কুমার দত্ত আরো দেশের বড় বড় লোকের সাথে একত্র হইয়া হাজার হাজার বক্তৃতা দিয়াও রাজনীতি ছাড়িতে একবারের জন্য দ্বিধা বোধ করেন নাই। রাজনৈতিক গদিতে বসার জন্য তো তিনি রাজনীতি করেন নাই, করিয়াছেন দেশের মানুষের মুক্তির জন্য। কিন্তু শেষে রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেন, তবে দেশের কাজ তো ছাড়েন নাই। এই দেশে যাহাদের কেউ নাই, তাহাদের সকল সমস্যার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এত বড় একজন মানুষ হইয়াও ৭০ বৎসর বয়সে একটি মেয়েকে cat but পড়াইতে পারিয়াছেন যদি সেই অনাথ মেয়েটির কোন একটি সুব্যবস্থা হয়। এমন করিয়া কত লোককে কত ভাবে ভাল করার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। স্বামীজীর কাজের যেন শেষ নাই। ভাবিলে বিস্ময় লাগে! যদি তাঁহার কথা মন প্রাণ দিয়া ভাবিতে পারিতাম বা তাঁহার লেখাগুলি প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারিতাম আর কিছু না হউক নিজের জীবনকে চালাইতে কষ্ট হইতো না। আজ আমরা সংসারের চাপে সমাজের চাপে মানুষের চাপে এমনকি নিজের মনের চাপে পড়িয়া কত হাবুডুবু খাইতেছি। কারো কথা কারো সহ্য হয়না, কারো কাজ সহ্য হয় না, কারো ব্যবহার কারো সহ্য হয় না মিলিতে যেন কোন ভাবেই আমরা কারো সাথে পারিতেছিনা অথচ একসাথে আমাদের সবারই থাকিতে এবং চলিতে হইবে। তবু আমরা মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারি না ইহার চেয়ে দুঃখের আর কি আছে? আমি যে এই বিশ্বে এই সংসারে একা চলিতে পারিব না এই কথা আমরা একেবারেই ভাবি না, যদি ভাবিতাম তাহা হইলে এই বিশ্ব ও সমাজ সংসারের কাছে আমি যেমন পাইতে চাই

আমারও আবার এই বিশ্বকে সমাজকে সংসারকে কিছু দেওয়ার আছে তাহা ভাবিনা কেন? তাহা আমরা ভাবি না। হয়ত অনেকে বলিবেন আমি তো কিছু করিয়াছি তাহার তো কোন ফল পাই নাই। এই ফল নিয়াই তো যত সমস্যা। আমি যদি ভাবিতাম সমাজ সংসারের জন্য যাহা করিতে পারিলাম তাহা সমাজ সংসারের আমার কাছে পাওনাই ছিল বা ঠাকুর আমার হাত দিয়া সমাজের জন্য সংসারের জন্য যাহা করাইলেন তাহা দিয়া আমাকে ধন্য করিলেন। কিন্তু আমরা যখন নিজের অহংকারের উপর দাঁড়াইয়া ভাবি এই কাজ আমিই করিলাম—তাহার পরই আসে দুঃখ। তাই তো অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন আমি এই সংসারের জন্য এত করিলাম, আমি অমুকের জন্য এত করিলাম এখন আমার জন্য কেহই নাই। তাই ভাবি যদি ঠাকুরের ইচ্ছায় এমন একটি মনপ্রাণ করিতে পারিতাম যে ঠাকুর যাহা কিছু করাইতেছেন এবং যদি করান সেই কাজ আমাকে দিয়া করাইয়া ঠাকুর আমাকেই ধন্য করাইলেন তাহা হইলে জীবনটা অনেক সহজ হইয়া আসিত। তাই যদি না হইবে ঠাকুর আমাকে দিয়াই বা করাইবেন কেন। আমি ছাড়া কি এই বিশ্ব চলিবে না? এই সমাজ সংসার চলিতেছে না? চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং এবং চলিবেও। তবে আমাকে দিয়া যেটুকু ঠাকুর করান তাহা যেন ঠাকুরের কৃপা বলিয়া মনে করিতে পারি। তাই ত মনে পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার মধ্যে আছে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সময় বলিতেছে আমার এই ভার কে লইবে? বিশ্বের সকলে যখন এই ভার লইতে সাহস পাইলেন না, তখন সামান্য মাটির প্রদীপ বলিতেছে, স্বামি, আমার যতটুকু শক্তি আছে সেইটুকু দিয়াই আমি আলো দিব। মাটির প্রদীপ যদি তাহার শক্তি দিয়া সাধ্যমত আলো দিতে পারে, আমার শক্তি সাধ্যমতও তো আমি পারি। আমাদের মনে যদি আসিত আমার সাধ্যমত যতটুকু পারি এই সমাজ সংসার, মানুষের কল্যাণের জন্য করিব, আমার কাছে তাহাদের ইহা পাওনা, তাহা হইলে সংসারে অনেক শান্তি আসিত।

কাজ করিতে গেলে কিছু কামেলা আসিবেই সব লোকই তো নিজের মত হইবে না, তাহাদের সাথে মিলিয়া তাহাদের সাথে চলিয়া তাহাদের সমস্ত কিছু হজম করিয়া আবার তাহাদের নিজের মত করিতে হইবে। তাই তো শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলিতেন—কবে তৃষিত এ মরু গড়িয়া তুলিব তোমারি রসাল নন্দনে। তিনি ছাড়িয়া যাইব বলিতেন না। এই তৃষিত মরু ছাড়িয়া যাওয়ার দলে তিনি নন। কেমন করিয়া এই সমস্ত দুঃখ কষ্টকে হজম করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, এই ছিল তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা। তাই তো মানুষ মানুষ করিয়া কাঁদিয়াছেন এই পুরুষোত্তমানন্দ।

কেমন করিয়া মানুষকে মানুষের মত করিয়া তৈরি করিবেন তাহাই তাঁহার চিন্তা ছিল। তাই তো তাঁহার জীবনে যেমন ছিল নারায়ণের পূজা তেমন সমভাবে ছিল নরের পূজা। নর ছাড়া যে নারায়ণের পূজা হয়না তাহা তিনি বুঝিয়া ছিলেন। সেই কারণেই তাঁহার এই আশ্রমের নাম দিয়াছেন নরনারায়ণ আশ্রম। আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জন্ম উৎসব পালন করার জন্য যাহারা একত্রিত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন

তাঁহার যেন স্বামীজীর এই আশ্রমকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া নিজেকে ধন্য করেন। এই আশ্রমের এবং স্বামীজীর কথাগুলি মানুষের জীবনে বড় প্রয়োজন, কি ছোট কি বড় সমস্ত লোকের জন্যই তাঁহার কথা। তাই তো নরনারায়ণ আশ্রমের আমার মত একজন মূর্খ লোকও স্বামীজীর কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে। তরসা শুধু স্বামীজীর কৃপা যিনি ছোট বড় সমস্ত লোককেই বুকে টানিয়া নিতেন। এমন একটি মহান লোকের কথা কার না ভাবিতে ইচ্ছা করে। তাই বার বার অনুরোধ আপনাদের নিকট আশ্রমে আসুন এবং স্বামীজীর বই পড়ুন, দেখুন জীবনে চলার পথে ইহার প্রয়োজন আছে কি না।

আমি যেদিন হইতে নরনারায়ণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছি সেদিন হইতেই আমার মনের মধ্যে এই চিন্তাটি ছিল যে আমাদের এই আশ্রমের মন্দিরে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সমাধির উপর যদি ভগবান শ্রীশ্রী নিতাগোপালের একখানা মূর্তি থাকিত তাহা হইলে খুবই ভাল লাগিত। তাই আট মাস আগে তাঁহাদের উপর ভরসা করিয়া শ্রীনিতাগোপালের একখানা মূর্তি বানান আরম্ভ করিলাম। সেই মূর্তিই এবার শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দজন্ম-উৎসবে নরনারায়ণ আশ্রমের মন্দির-বেদির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই কাজ যে আমার হাত দিয়া হইবে তাহা কোন দিন কল্পনাও করি নাই। ঠাকুরেরই ইচ্ছা যে আমার হাত দিয়া তিনি প্রকাশিত হইবেন। তাই ইহা হইয়াছে। তাহা না হইলে আমার এমন কোন যোগ্যতা নাই যে এই মূর্তি আমি করিতে পারি। এই মূর্তি তৈরি করিতে যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছে, সেই আমার স্ত্রী অঞ্জনা, আমার তিন পুত্র অনন্ত, পার্থ এবং প্রশান্তর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের আলোকে আমি ও বিশ্ব

—শ্রীবিমলকুমার চক্রবর্তী

ওঁ নমো নিতাগোপালায়। শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী, একই সূর্য প্রতিদিন যে সুপ্রভাত নিয়ে আসে সে চির পুরোণো। তবু তার প্রতিদিনের প্রথম রশ্মিপাতে পরিস্নাত হয় যে জাগতিক পৃথিবী তা নিত্য নতুন রূপ পরিগ্রহ করে রসে রূপে গন্ধে। তাই সে চির নতুন। শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের এই ৯৫তম জন্মজয়ন্তীর স্মরণ-সভায় বসে সেই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছে। এই তো সেদিন একবছর আগে এমনি একটা উৎসবের দিনে তাঁকে স্মরণ করেছি তাঁরই কল্যাণময়ী ইচ্ছাকে বুকে নিয়ে। আজও আবার তাঁকেই স্মরণ করছি উৎসবের আঙিনায়। কিন্তু যে আমি গত বছরের এই পুণ্য দিনটিতে অর্ঘ্য সাজিয়েছি তাঁর বেদীতলে, সেই আমির সাথে আজকের আমি কি এক? যদি সেই একই আমির ঘূর্ণনের মধ্যে আমার আমি সীমায়িত হয়ে থাকে

তাহলে এই দিনটিতে তাঁর পূজার অধিকার আমার নেই। একই মানুষের জন্ম-জয়ন্তীর আবর্তনে তাঁকে স্মরণ করবার অর্থই হচ্ছে আমার প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তিত আবেষ্টনে, ভাবে ভাষায় তাঁকে আস্বাদন করা আর তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিদিনের বদলানো পরিবেশের মতো কোরে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তা যদি না হয় তাহলে যত কেন জন্ম-জয়ন্তীর সহস্র সভায় মিলিত হই, সেই মানুষটি একটা ব্যক্তি-মানুষ হয়েই রইলেন। সকলের মানুষ হিসেবে পৌঁছালেন না সকলের প্রাণের দুয়ারে। একে সকলের কোরে উপস্থিত করবার তাগিদেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় প্রস্থান ত্রয়ের অবধূত ভাষ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত জীবন মথিত কোরে বের হয়ে এসেছিল যে গীতা, আর্ষ ঋষিদের কণ্ঠস্বর থেকে নিঃসৃত হয়েছিল যে উপনিষৎ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দিয়েছিলেন যে ব্রহ্মসূত্র তা যদি অবধূত-ভাষ্যদ্বারা নতুন চিন্তায় ব্যাখ্যাত না হতো তাহলে বস্তুবাদী দর্শনের যে সত্যতা নিঃশেষে হজম হয়েছিল ভারতীয় অধ্যাত্ম-বাদী দর্শনের সর্বগ্রাসী গহ্বরে, তার মুক্তি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হতো না। এই যে বিশেষকে সকলের মধ্যে কুড়িয়ে তোলবার প্রাণপণ ইচ্ছা তাই স্বামীজীর অন্তরতম সাধনা, সারা জীবনের সাধনা। সেই সাধনা যদি তাঁর জন্মতিথির পুণ্যলগ্নে আমাদের আজ্ঞর কোরে নিত্যই নব নব হয়ে না ওঠে, তাহলে এই উৎসবের আঙিনায় তিনিই রইলেন অনুপস্থিত।

ছোট বেলায় 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' পাঠ্যাংশে পড়েছিলাম তপোবন-স্থিতা শকুন্তলার প্রসঙ্গে মহর্ষি কণ্ব শিষ্য শার্ঙ্গরবকে বললেন,—'আমরা বনবাসী বটে কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নই'। সেদিন এই কথাটা মনের মধ্যে প্রশ্নের ঝড় তুলে ছিল এ কেমন কোরে সম্ভব। আমাদের প্রচলিত সনাতন ধর্মে শুনেছি সন্ন্যাসীর ঘর নেই। তা যদি হয় তাহলে লৌকিক ব্যাপারে তার অনভিজ্ঞ হবারই কথা। তারপর সুদীর্ঘ অবকাশে যখন শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন-আলেখ্য পড়লাম তখন দেখলাম এ যেন মহর্ষি কণ্বেরই প্রতিধ্বনি। স্বামীজীর শেষ জীবনে জেল থেকে বেরিয়ে সম্বর্ধিত হবার পর যখন প্রশ্ন করা হল 'আপনি থাকবেন কোথায়'? তখন তিনি নির্দ্বিধায় উত্তর করেছিলেন 'আমার নিজের বাড়ীতে'। এটা সনাতনী চিন্তাধারায় নিঃসন্দেহে একটা বিস্ময়। এ বলা তারই সাজে যার ঘর-বার, আপন পর, পার্থিব অপার্থিব সব একাকার হয়ে গেছে। তার কাছেই ঘর হয় পরবাস, যে ঘরের প্রতিদিনের সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে বাইরের মত কোরে গড়তে না পেরে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যে-মানুষ বিশ্বের বাঁশীর ধ্বনি শুনে সারা বিশ্বে নিজের ঘরে সীমাকে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার ঘর কেরাটোপ হয়ে ওঠে না, পরবাস হয়ে ওঠে না। স্বামীজীর নিজের ভাষায় বলি, "একটা নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন ধর্ম এক কথায় মানুষের জন্য একটা নূতন সভ্যতার কাঠামোর ইঙ্গিত পৃথিবীর আকাশে বাতাসে হাতছানি দিয়া মানুষকে ডাকিতেছে,—আমাদের বুকের মধ্যে সেই ডাকেরই গুরুগম্ভীর ধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছে। সেই ডাকেরই আহ্বানে নিকটের দূরের, আপনের-পরের শত বিরুদ্ধতা শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আমাদের চলিতে হইতেছে, কেননা আমরা বংশীধ্বনিও শুনিতে

পাইয়াছি।" এই বাঁশীধ্বনিই প্রাণসাধনার ভিত্তি। এই বাঁশীধ্বনি যার কানে প্রবেশ করে না তার সব কিছুতেই নেতি নেতি, সব কিছুতেই সংশয়। তাই সে সর্বদাই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় মনে মনে কোণে। তারা বোঝে না ঘরের বাঁধনকে অস্বীকার কোরে নিজেকে আবার নতুন কোরে বেঁধেছে বনের সীমায়। কিন্তু যে মানুষ বুঝেছে 'বাহিরের মধ্যে ঘরকে এবং ঘরের মধ্যে বাহিরকে গলাইয়া দিয়াই আজ তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে' তাকে বাঁধবে কোন সংকীর্ণতার বাঁধ? তাই সন্ন্যাসোত্তর জীবনেও ঘর তাঁর জীবনে চলার পথকে পিছল করতে পারে নি। কারণ সে বাঁশীধ্বনিতে ছিল বিশ্বাত্মবোধের তান, প্রাণ-দর্শনের তান যে "প্রাণ-দর্শন শিখাইয়াছে এ বিশ্বের প্রতিটি কণাই বিশ্বরূপ।"

যে ভারতবর্ষ একদিন শুনিয়েছে পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং উহা পূর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্ম পূর্ণ, ইহা পূর্ণ অর্থাৎ নামরূপাদি জগৎ পূর্ণ সেই ভারতবর্ষেই আর একদিন উদাত্ত স্বরে ঘোষিত হয়েছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' এ কেমন কোরে সম্ভব হল? যদি দুটোই হয় পূর্ণ মূল্যে স্বীকৃত তাহলে একটা যদি সত্য হয় অপরটা মিথ্যা হয় কেমন কোরে? জাগতিক সত্য-আস্বাদন ছাড়া শুধুমাত্র অতিন্দ্রিয় সত্য-আস্বাদন আমার মতে আমি এ সত্য সনাতনী চিন্তাধারায় দীর্ঘ দিনি ছিল অনুপস্থিত, তাই ঘরের ডাকে ঘরের মধ্যে ঈশ্বর নেমে আসেন নি; মানুষ ঘরকে অস্বীকার কোরে ছুটেছে একাকিত্বের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধানে। বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের সন্ধানে মানুষ এক মুহূর্ত সময় ব্যয় করেনি অথচ দীর্ঘ সময় দিয়েছে বিশ্বের বাইরের বিশ্বেশ্বরের সেবায়। তারপর একদিন এলেন শ্রীনিত্যগোপাল। ভাবী কালের অন্তরে দিলেন নতুন ঘোষণা,—"এই বিশ্বই আমার মহামঠ। আমি বিশ্ব-নাগরিক"। দিলেন প্রাণদর্শন। এই প্রাণদর্শনে বস্তু-জগৎও সত্য হয়ে উঠল, ব্রহ্মও দূরের সামগ্রী হইল না। যেন দুয়ের মধ্যে মিতালি চল। যেদিন মানুষ ভেবেছে, "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে" সেদিন কি অকৃতজ্ঞতাই না দেখিয়েছে এই পৃথিবীর উপরে। পুরুষোত্তমানন্দের ভাষায়,—"আমার বিশ্বরূপতা বুঝিতে লৌকিক বুদ্ধিই তো যথেষ্ট। লক্ষ লক্ষ লোকের সেবা যত্নে অন্ন জলে পুষ্ট হইয়া আমি আজ ৭২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি—এ ঋণ কি শোধ করা সম্ভব হইবে? আমার জন্য যে যাহা কিছু করিয়াছে সে তাহা যদি আজ ফেরৎ চায়, আমি যে হরির লুট হইয়া যাইব! আমি তো বিশ্বের খাইয়া পরিয়াই আজিকার 'আমি' হইয়াছি। আমি অর্থ কি বিশ্ব নয়? ঐ যে কৃষক রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া শীতে বস্ত্র না পাইয়া শীতে কাঁপিয়া আমার জন্য অন্ন সৃষ্টি করিতেছে, সে কি আমারই অঙ্গ নয়? খাওয়াইবে পরাইবে বিশ্ব, আর আমি একা যাইব বিশ্বেশ্বরের খোঁজে? এই অকৃতজ্ঞতা কি আমার সব সাধনা পণ্ড করিবে না?...আমি জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে ও পরে বিশ্বের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ যোগে যুক্ত হইয়াই চলিয়াছি।..... বিশ্বই আমার কাছে বরং প্রত্যক্ষ। বিশ্বেশ্বরই আমাদের কাছে আনুমানিক। শ্রীনিত্যগোপাল এই ক্ষেত্রে শুনাইয়া গিয়াছেন, "প্রত্যক্ষাপেক্ষা

অনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়।' প্রত্যক্ষ জগৎ অস্বীকার করিয়া, প্রত্যক্ষ কৃতজ্ঞতা-গুণ মুছিয়া ফেলিয়া আমি চলিব কোন্ অনুমানের খোঁজে? কেন বিশ্বসেবা কি বিশ্বেশ্বরের কাছে সাধককে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না? বিশ্বের অন্তরে বাহিরে তো তিনিই আছেন। বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সঙ্গে এমন একটি প্রাণ-যোগ (organic relation) আছে যে, একটিকে ধরিলে অপরে আপনা আপনিই পৌঁছানো যায়।" অথচ প্রাণ-দর্শনের এই সত্য ধরতে না পেরে শুধু মাত্র বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে কত বড় সত্যকে নির্বাসিত করেছিল নিজের সত্তা থেকে!

আজ আমাদের কাছে এসেছে সেই প্রাণ-দর্শনকে প্রাণের সাথে যুক্ত করবার দিন। আজ আমাদের সামনে এসেছে শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন-বেদকে বর্তমানের বাস্তব পরিবেশের উপযোগী কোরে প্রকাশের দিন যে জীবন-বেদে আছে 'বিশ্ববাসী সকলের সব 'হওয়ার' পরিপূর্ণ সার্থকতা'— যার মধ্যেই সব ক্ষেত্রের, সব স্তরের ও সব জাতির মহা মিলন। বর্তমান যুগ সেই প্রেরণাই অন্তরে বাইরে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করছে। জীবনকে বাদ দিয়ে শুধু বুদ্ধির স্তরে সর্বাঙ্গীণ মহামিলনের 'এক জগৎ' গড়ে ওঠা কোনদিনই সম্ভব নয়। "একমাত্র আত্মশক্তি-সাধনাই সে পথের নির্দেশ দান করিতে পারে।"

সনাতনী চিন্তাধারার মধ্য দিয়েই তো চলছিল দিন। হঠাৎ কোরে কি বাঁশী বেজে উঠল নরনারায়ণ আশ্রমের অন্তর থেকে। চলতি পথের সব চিন্তাকে ভাসিয়ে দিয়ে নতুন সুরের তরঙ্গ উঠল হৃদয়, মন, প্রাণ জুড়ে। সে সুর মানুষের মাঝে পুরুষোত্তমকে দেখবার সুর, শ্রীনিত্যগোপাল ও পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-বেদে বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মিলনঘন রূপ। তাই আজকের এই অনুধ্যানের দিনে আমার সমস্ত শ্রদ্ধা দিয়ে স্মরণ করি প্রণাম করি তাঁদের, আর প্রার্থনা করি তাঁদের প্রতিটি জন্ম-জন্মান্তরে যেন নতুন থেকে নতুনতর আস্বাদনে তাঁদের ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে পারি। আমাদের জীবনে তাঁদের প্রকাশ যেন বাস্তব হয়ে ওঠে। তাঁদের প্রণাম, বার বার শতবার প্রণাম। ওঁ শান্তি।

॥ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ॥

—শ্রীবিষ্ণু পদবায়

পৃথিবীতে মানুষের জন্মলাভ বিধাতা পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দিয়ে যাবার জন্য। এ বিশ্ব-প্রকৃতির যেদিকে তাকাই তাই শুধু দেখছি বাঁচবার ও বাঁচাবার একটা ঐকান্তিক প্রয়াস। ইতর জীব থেকে মানুষ অবধি প্রত্যেকেই

বাঁচতে চায় কিন্তু প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মে কেউই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না। তবে যথার্থ মানুষের জীবনের ইতিহাসে দেখতে পাই তারা তাঁদের স্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথিবীর জন্য বা তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য কিছু রেখে যান। এক লতা, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্বে রেখে যায় তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের। মানুষও রেখে যায় তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের এবং সে আরও কিছু বেশীই রেখে যায় যেমন শিল্প, কলা, দর্শন, সাহিত্য ভাস্কর্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এই জন্যই বুঝি মানুষ জীবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। যে মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, শুধু উদরান্নের জন্য দিবারাত্র খেটেই জীবন-লীলা শেষ করে আমরা তাদের বন্ধ্যা বা ব্যর্থ জীবনের অধিকারী বলে অভিহিত করে থাকি। এই বন্ধ্যা জীবনের মুক্তির জন্যই আমরা অতীতবর্তী গুণী মনীষীদের প্রদর্শিত পথে চলবার প্রয়াস করি।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ এই অতীতবর্তী গুণী মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। আজকের এই শুভ দিনে তাঁরই জীবন-তত্ত্ব কিছু বলবার চেষ্টা করব। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে আমি অত্যন্ত কাছে থেকেই দেখেছি। এক হিসেবে তিনিই আমার জীবনের ধারক ও বাহক। স্বামীজীর মত সরল ও সহজ মানুষ আমার জীবনে দ্বিতীয়টি এখনো চোখে পড়ে নি। এত সহজ বলেই বুঝি তিনি আজও পর্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে আছেন। এ জগতে মনে হয় যে বস্তু যত সহজ সে বস্তুটি সব চাইতে কঠিন ও দুর্বোধ্য। সহজ জীবন লাভ করাও বুঝি দুর্লভ। যে যাই বলুন আমার বিশ্বাস স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ সেই দুর্লভ সহজ জীবনের অধিকারী ছিলেন। তা না হলে এবই জীবনে গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস সমন্বয় হয় কি করে! তিনি সন্ন্যাসী হয়ে রাজনীতি করেছেন, সংসার করেছেন, দেশের মুক্তির জন্য কারাবরণ করেছেন—আবার সেই একই মানুষ গীতা উপনিষদের ভাষ্য ও রচনা করেছেন। একই জীবনের মধ্যে এই যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের ও কর্মের সমন্বয় এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী নেই। পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের উপলব্ধিগত সত্যের মণি মাণিক্য ছড়ান রয়েছে তাঁরই বিরচিত ভাষ্যভূমিতে। তিনি যা আচরণ করেছেন, যা উপলব্ধি করেছেন তাই-ই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

পুরুষোত্তমানন্দ-দেহধারী যে সহজ মানুষটিকে আমরা দেখেছি তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে কেউ-ই বুঝতে পারি নি। পারি নি বলেই তাঁকে নিয়ে আমাদের সংশয় এবং বিতর্ক। এই বিতর্কিত জীবনালেখ্যই আজ আমাদের ভাববার ও জানবার বিষয়বস্তু। তিনি কি ভাবে জীব-জগৎকে দেখেছেন কোন্ মন নিয়ে প্রকৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে ছায়াহাসিক নৈনিকের মত বিচরণ করেছেন—সে-টিও যথার্থ ভাবে জানবার প্রয়োজন রয়ে গেছে। স্বামীজীর দীক্ষান্তের পূর্ববর্তী জীবন এবং পরবর্তী জীবন একই জীবনের দুটি অধ্যায় মাত্র। দীক্ষান্তের পরবর্তী যে জীবন —সে জীবন ছিল ভাগবত রসে রসসিক্ত, প্রবল বিশ্বাসে ও তেজস্বিতায় পূর্ণ। এই অধ্যায়ের মধ্যে স্বামীজীর জীবন পুরুষোত্তম-জীবনের সার্থকতাময় সোপান রূপে চিহ্নিত একদিন মায়াবাদী শাস্ত্রের সংস্কারে যে সংসারকে তিনি ভয়ের চোখে দেখেছিলেন, যে নারী ও সংসারকে তিনি সাধন পথের অন্তরায় মনে করেছিলেন দীক্ষান্তের পরবর্তী

জীবনে দেখা গেছে সেই শরৎ কুমার ঘোষ তথা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ পতিতালয়ে গিয়ে গীতা পাঠ করতেন। তিনি পতিতাদের বলতেন বাজারের মা। রাজনীতিকে বলতেন রাধানীতি। তাঁর অভিযান ছিল শোষণের বিরুদ্ধে। তিনি তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় হাজার হাজার মানুষকে কখনো কাঁদিয়েছেন, কখনো হাসিয়েছেন, কখনো উদ্দীপ্ত করেছেন। একদিন এই নটবর পুরুষকে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন 'পতিতালয়ে গীতা পাঠ একমাত্র শরৎ ঘোষই পারে'। কেমন করে তিনি পারলেন সমাজের নিম্ন স্তর থেকে শীর্ষ স্থান পর্যন্ত বিচরণ করতে! কি ভাবে, কোন্ মনে এই বিপ্লবী সন্ন্যাসী কাছে কাছে, পথে পথে রাখলেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ পাঁচটি প্রাণীকে—এ ভাবা যায় না।

স্বামীজীর দীক্ষান্তের পরবর্তী অধ্যায়ে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের দেহে ও মনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়। তাঁর মানসিক কাঠামোতে এ পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপ্টা নামতে শুরু করে। যা বাইরে থেকে সহজে বোধগম্য ছিল না। (এ সাধনার প্রবর্তক শ্রীনিত্যগোপাল স্বামীজীর গুরুদেব) দীক্ষান্তের পর স্বামীজী কঠিন ভাবে শরণাগত হলেন শ্রীনিত্যগোপাল দেবের শ্রীচরণে। এই শরণাগতির ফলে তাঁর দেহে ভাগবতী তনুর মহিমা ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। গুরুগত-প্রাণ পুরুষোত্তমানন্দ এর পর উন্মাদ হয়ে উঠলেন মানুষকে বুকে পাবার জন্য। মানুষকে বুকে পাবার জন্য তিনি অসম্ভব কাঁদলেন কিন্তু কোনও মানুষই এল না তাঁর দিব্য জীবনকে ও দর্শনকে বরণ করে নিতে। এটাই হ'ল স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। স্বামীজীর জীবনে সন্ন্যাস সংসার এক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ভাষ্যাবলীর মূল বক্তব্য একই সমগ্র জীবনের একাংশ সন্ন্যাস অপরাংশ সংসার। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন 'মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়'। স্বামীজী তাঁর গুরুদেবের মহাসিদ্ধাবস্থার সাধনার ধারাকে জীবনে অক্ষুণ্ণ ও অটুট রেখে চলে ছিলেন বলে সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁকে বোঝা সহজ হয় না।

স্বামীজী এই দিব্য জীবন লাভ করবার একটিমাত্র উপায় বলে গেলেন—তা হ'ল শরণাগতি। যে অখণ্ড দিব্য জীবনে পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় আছে, সেই জীবনের পদমূলে শিষ্য শরণাগত হলে শিষ্যও পুরুষোত্তম জীবন বা সমগ্র জীবন লাভ করতে পারে এই বিশ্বাস স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন মনের স্তরে সমন্বয় সম্ভব নয়। মন Either-or-এর ভাষায় কথা বলে। মন কখনো সমগ্র বা অখণ্ড জীবনের ধারণা করতে পারে না। তিনি প্রাণ-চুম্বিত মনের কথা বলতেন। প্রাণ-চুম্বিত মনের দ্বারা সমন্বয় সম্ভব এ ছিল তাঁর উপলব্ধি-গত ধারণা। মন-প্রধান মানুষেরাই জগতে বেশী দলাদলি করে, সংগঠনে তাদের দ্বারা শুধু ফাঁকিরই সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাণ-প্রধান মানুষের দ্বারা সংগঠন হয় বটে তবে বুদ্ধি-শক্তি দুর্বল হলে তাও বিপর্যয় ঘটায়। কাজেই একান্ত মন বা বুদ্ধি কিংবা একান্ত প্রাণের দ্বারা সংসার-জীবন সুষ্ঠুভাবে চলেনা, প্রয়োজন উভয়ের সংহতি বা সমন্বয়। স্বামীজী বলতেন শাস্ত্রে বলে মানুষকে অতীতের সঞ্চিত প্রারব্ধের ফল ভোগ করতে হয় কিন্তু

শরণাগত ভক্তের সঞ্চিত প্রারব্ধের ফল ভোগ করতে হয় না। তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ বলতেন তাহল এই—যদি প্রস্রাব গঙ্গা জলে কোন ক্রমে মিশতে পারে তবে সে আর প্রস্রাব থাকে না সে তখন গঙ্গাজলই প্রাপ্ত হয়। এ আশার বাণী তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ আর দশটি সন্ন্যাসীর মত নন এটা প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে—তা হলে তাঁকে বোঝার পথ আমাদের কাছে সহজতর হবে। পুরুষোত্তমানন্দ আজ আর দেহে উপস্থিত নেই, কিন্তু তিনি যে জীবনের ছন্দ সৃষ্টি করে রেখে গেছেন সেই জীবন ও দর্শন আজ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বিশেষ প্রয়োজন এ সত্য আজ ক্রমশঃ ভাস্বর হয়ে উঠছে। শ্রীনিতাগোপাল স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ আগামী দিনে প্রকট হবেন এই বিশ্বাস আমার মনে ক্রমশঃ গভীর হয়ে উঠছে। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠুন আজকের দিনে এই কামনা করি।

স্বামীজী স্মরণে

—শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও ভাই বোনেরা,

আজ আমরা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের ১৪-তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। বিগত ২২ বৎসর এই আশ্রম এই উৎসবটী আয়োজন করে আসছে, আমরাও এই সময় তাঁর অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দ মিলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করি। প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে এই মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর কর্মজীবনের, তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্ম-জীবনের আলেখ্য আপনাদের জানা আছে। তাঁর বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ। বোধ হয় বিপিন পালের পর তাঁর মত বাগ্মী খুব কমই জন্মেছেন। শুনেছি তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনৈতিক বলুন, আধ্যাত্মিক বলুন—বিষয়ে বলে যেতেন—তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তা হৃদয়ঙ্গম করতেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমি এর কিছু কিছু আভাস পেয়েছিলাম। তিনি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, বেদবেদান্ত উপনিষদ্, পুরাণ মন্থন করে তিনি শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। আপনার যে কোন প্রশ্নের সদুত্তর এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বলতেন। যারা আগ্রহী তাদের পক্ষে তরসাস্থল ছিলেন তিনি। তিনি শাস্ত্রবেত্তা হয়ে কিন্তু শুষ্ক বৈদান্তিক ছিলেন না, তিনি জ্ঞানমার্গে বিচরণ করলেও তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীনিতাগোপালের সমন্বয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি ভক্তিরসে সিঞ্চিত ছিলেন—এই খানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তাদেরই টেনে নিয়েছে। প্রথমে

এই আশ্রম যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সে আজ থেকে ২২ বৎসর আগের কথা, তখন এখানে আসা কষ্টসাধ্য ছিল। রাস্তাঘাট ছিল না বললেই হয়। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদাজল ভেঙে আসতে হতো। আমি মাঝে মাঝে এই মহাপুরুষের আকর্ষণে এখানে এসে হাজির হতাম। এলে পর তিনি যেভাবে জড়িয়ে ধরে কোল দিতেন, এখনও ভাবলে আমার শিহরণ জাগে। অবশ্য এ গ্রামে এসে মাত্র দুই বছর তিনি তাঁর স্থূল দেহে এখানে বিচরণ করেছিলেন। স্থানীয় যেসব ভাগ্যবান তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, আশাকরি সকলেই তাঁরা আমার মত কৃতার্থ বলে নিজেকে বিবেচনা করবেন তাঁর জ্ঞান প্রজ্ঞা এবং হৃদয়বত্তা অপরকে আকর্ষণ করার এক মস্ত যন্ত্রস্বরূপ ছিল।

অপরাপর ধর্মে একটী শাস্ত্র-গ্রন্থ তাদের পরিচালনা করে, কিন্তু আমাদের ধর্ম বা দর্শন-শাস্ত্র অগাধ, অনন্ত। আমাদের বেদ-বেদান্ত কোন মানুষের সৃষ্টি নয় বলে আমরা দাবী করি সুতরাং ঈশ্বর যেমন অনন্ত অসীম, তেমনি বেদ-বেদান্ত পুরাণের জ্ঞানরাশিও অনন্ত, উহা জগৎ সৃষ্টির সঙ্গেই সৃষ্ট হয়েছিল—আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা ইহা আবিষ্কার করেছেন মাত্র। সেই জ্ঞানশাস্ত্র মন্থন করে আহরণ করা দুঃসাধ্য, তাই যুগে যুগে অবতার পুরুষগণ সে জ্ঞানের ভাবরাশি নানাভাবে সহজ সরল করে সাধারণের কাছে পরিবেশন করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, অপরকে মারার জন্য ঢাল তরোয়াল চাই, কিন্তু নিজকে হত্যার জন্য একটী নরুণই যথেষ্ট। এর তাৎপর্য এই যে আধ্যাত্মিক উন্নয়নে আপনার পক্ষে যে কোন একটী পথ বেছে নিয়ে একাগ্র চিত্তে অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু আপনাকে আচার্য হতে হলে, লোকশিক্ষা দিতে হলে ঈশ্বরানুভূতি শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য প্রয়োজন। পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে ভগবানের জন্য তাঁর একাগ্রতা, রাধারাণী বলে তাঁর আকুতি, সর্ব সময় তাঁর হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে আক্ষেপ দেখে চমৎকৃত হয়েছি, আবার শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ও তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা আমাদের মুগ্ধ করেছে। প্রথম জীবনেও তিনি শিক্ষকতায় করতেন—শতিকার আচার্য হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল। জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে তিনি ধন-মান-যশ-প্রতিপত্তি কিছুই চান নি—তাই এই বাগুইআটি গ্রামের এক কোণে এসে এই আশ্রম স্থাপন করে নিত্যগোপালের দার্শনিক তত্ত্ব সমন্বয়বাদ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন এবং বাস্তবে আশ্রমিকদের জীবন-যাত্রা সেই ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর এই আশ্রম সাবলীল ধারায় তাঁর অভীষ্ট চিন্তা-ধারার আলোকে চলতে চেষ্টা করছে। যদি আশ্রমটি প্রদীপের সলতের মত জ্বালিয়ে অস্তিত্ব রাখতে সমর্থ হয়, তবে তাঁর ভাবধারা কোন না কোন দিন ব্যাপ্ত হবে। আজ সর্বশেষে উপস্থিত ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের সঙ্গে আমি আমার প্রাণের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি প্রার্থনা, জগতের প্রতিটি মানুষ হোক হৃদয়বান প্রেমিক, ঈশ্বর মুখীন ; দুঃখভারাক্রান্ত জগৎ রূপান্তরিত হোক স্বর্গধামে, কল্পনা মূর্ত হোক বাস্তবে।

'জীবন-বল্লভ সাধন-দুর্লভ'

—শ্রীবেণুস্মিত্র

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ১৫-তম জন্মকে স্মরণ করিয়া তাঁহার জীবন ও দর্শন আলোচনা ক'রবার জন্ত আমরা তাঁহার পুণ্য দেহ রাখা আছে যে স্থানে সেই স্থানে আজ সমবেত হইয়াছি। আপনাদের সকলের সঙ্গে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে, আমাদের সমবেত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণাম জ্ঞাপন করি। এই সঙ্গে তাঁহার জীবন-দেবতা 'জীবন-বল্লভ সাধন-দুর্লভ' শ্রীশ্রীনিতাগোপালকেও আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

থিওসফিষ্ট এবং মনীষী হীরেন দত্ত যাঁহার বেদান্তের আলোচনা শুনিয়া ১৯২০-তে বলিয়াছিলেন, 'বক্তার শাস্ত্রের ভিতর এক নূতন দৃষ্টি খুলেছে', সেই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত—সেই সময়ে শরৎকুমার ঘোষ—সত্যিই শুধু জীবনের উপাসক ছিলেন। তাই সমস্ত শাস্ত্রকে তিনি নূতন রূপে, নূতন ভাষায় পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল তাঁহার অন্তরের অনুভূতি—এই অনুভূতির সঙ্গে তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীনিতাগোপালের স্পর্শলাভের পর প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রচ্ছুরিত হইয়াছিল কোন বাঁধাধরা পথে এ গতি-বেগ চলে নাই—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহা নূতন খাতে বহিয়া ছিল। মুখস্ত করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যেমন একটী কথাও বলেন নাই বা লেখেন নাই, তেমনি মুখস্ত করা বাঁধা পথে এক পা-ও তিনি চলেন নাই। তিনি বার বার বলিয়াছিলেন, লিখিয়াও গিয়াছেন যে তাঁহার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত শ্রীনিতাগোপাল ছাড়া আর কিছু নাই—তাঁহার সকল কথা শ্রীনিতাগোপালের জীবনের কথা, তাঁহার সকল চলা শ্রীনিতাগোপালের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু একটী শব্দও শ্রীনিতাগোপাল বাহিরের মুখ দিয়া তাঁহাকে বলিয়া যান নাই বা শিখাইয়া যান নাই। শ্রীনিতাগোপাল-আশীর্বাদে জীবনের উপলব্ধি যেভাবে পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল তাহাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে সম্পূর্ণ নূতন ভাষায়, নূতন পথে এবং প্রচণ্ড আবেগে। তাঁহার সারা জীবনের ১৪ হাজারেও বেশী বক্তৃতায় তিনি হাজার হাজার মুগ্ধ শ্রোতা পাইতেন কিন্তু তাঁহার বক্তব্য বিষয় এতই নূতন ছিল যে লিখিতেরাও তাহা ধরিয়া রাখিয়া পুনঃ প্রকাশ করিতে পারিত না। তাঁহার রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত সময়কার বক্তৃতাগুলি মুখ্যতঃ রাজনৈতিক হইলেও তাঁহার বক্তব্য সব সময় থাকিত মানুষের জীবনের সামগ্রিকতাকে কেন্দ্র করিয়া—জীবনের সকল দিকের শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁহার বিদ্রোহ। তাঁহার রচিত গীতার ভাষ্য -প্রদীপে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য নীচের যে ভাষায় তিনি দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার জীবনের ভাষা—"কলি-যুগ বিদ্রোহের যুগ, নির্বিকল্প যুগ। যে বেদ বেদান্ত, যে দেবপিতৃপূজা মানুষকে স্রষ্টা না করিবে সে শ্লীব

শাস্ত্র ভাঙিয়া বীর্যবান অস্ত্রবান শাস্ত্র প্রদানই আমার প্রয়োজন। সর্ব ক্ষেত্রে দাসত্ব প্রবর্তনের বিরোধী আমি। মানুষ আমার দাস হয়—ইহা আমার অসহ্য। আমাকে বিশ্ব হইতে তুলিয়া দিবার দুঃসাহস লইয়া যে পুরুষ আমাকে ভালবাসিবে, সেই পুরুষেরই আমি বশীভূত"। এই বিদ্রোহের সামগ্রিকতা বোঝা সহজ নয়। যে কারণে হাজার হাজার মানুষ মুগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিত, সেই কারণেই তাঁহার বক্তব্য স্মরণ রাখিয়া গুছাইয়া লইয়া পুনঃ প্রকাশ করিতে পারিত না। সেই কারণটী হইল বক্তব্য বিষয়ের সামগ্রিকতা এবং সেই হেতু ইহার নূতনত্ব। তিনি রাজনীতি বলিতেন, ধর্ম-নীতি বলিতেন, সমাজ-নীতি বলিতেন, তিনি জ্ঞানের কথা বলিতেন, কর্মের কথা বলিতেন, ভক্তির কথা বলিতেন, প্রেমের কথা বলিতেন—কোন একটার কথা বলিতেন না—কেননা তিনি ছিলেন জীবনের উপাসক, জীবন কোন একটিকে লইয়া চলে না। জীবনের উপাসক বলিয়াই বুদ্ধি তাঁহার পাথেয় ছিল না—তাঁহার পাথেয় ছিল জীবনের মূল যাহা সেই প্রাণ—যে প্রাণ বায়োলজিক্যালি ও সাইকোলজিক্যালিও জোর ও শ্রেষ্ঠ। এই উভয়ধর্মী মূল প্রাণ তাঁহার intuition রূপে যে ভাবে তাঁহাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। এই জন্যই সম্পূর্ণ এক নূতন পথে তাঁহার সকল বলা ও বলা যেমন মানুষকে প্রীত করিয়াছিল তেমনি সকলের নিকট দুর্বোধ্যও করিয়াছিল। এই জন্য মানুষ অন্তরে অন্তরে তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইত, কিন্তু বক্তৃতা অন্তে বুদ্ধি দিয়া তাহা নিজের অভ্যস্ত চিন্তার সঙ্গে মিলাইতে পারিত না। বুদ্ধি দিয়া মাপ করিয়া তাঁহাকে কেহ বুঝিতে পারে নাই, তাই তাঁহার কথা যতই ভাল লাগুক, মানুষ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই দেখিয়াছি পাঁচ, দশ, পনের বৎসর পরেও অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে, কিংবা সবটুকু দিয়া ধরিতে না পারিলেও তাঁহাকে অনেকে ছাড়িয়া দিতেও পারে নাই। শ্রীনিতাগোপালের সামগ্রিক জীবন-তত্ত্বকে নিজের আচরণে ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করিয়া কেন যে তিনি দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার রচিত 'শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে' পুস্তক হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিলেই তাহা আরও স্পষ্ট হইবে।

"প্রজ্ঞা-চুম্বিত প্রাণধারা আজ বিশ্ব-সঙ্ঘ-রচনার জন্য আবির্ভূত।... বিশ্ব বিশ্বেশ্বরকে সৃষ্টি করিবে—ইহাই প্রাণ-সাধনার চরম পরিণতি। বিশ্বনাথ আজ বিশ্বের রক্তমাংসে নিংড়াইয়া দিবার জন্য নিবেন, চৈতন্য জড়ের বুক মথন করিয়া জড়ের কোলে প্রকাশিত হইবেন, স্রষ্টা আজ সৃষ্টের দ্বারা সৃষ্ট হইবেন—ইহাই প্রাণধারার বিশেষত্ব।.....সব সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হইবে বিশ্বকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা, বিশ্বেশ্বরকে সৃষ্টি করা। যতদিন বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর জীবের সাধনার ভিতর দিয়া না জন্মিতেছেন, ততদিন বিশ্বের জ্বালা, বিশ্বেশ্বরের তপস্যা কিছুতেই সার্থক হইবে না।.....পিতা যেমন পুত্রকে সৃষ্টি করেন পুত্রের পূজ্য হইবার লালসায়, বিশ্বপিতাও তেমনি বিশ্ব-জীবনের পুত্র রূপে সৃষ্ট হইবার জন্য বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাণ-সাধনা এই সৃষ্টির কথা বলিয়াই বন্ধ। একদিন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বিশ্বকে, এইবার বিশ্ব সৃষ্টি করিবে বিশ্বেশ্বরকে। এই উভয় সৃষ্টির সমন্বয়ের খবর পৌঁছাইয়াই

শ্রীনিত্যগোপাল অদ্বিতীয় দ্রষ্টা। কম্যুনিজম জড় হইতে চৈতন্যের সৃষ্টি-কথা শুনাইয়াছেন, হেগেল শুনাইয়াছেন চৈতন্য হইতে বিশ্ব-সৃষ্টির কথা। কোনও একটিই একান্ত সত্য নয়। দুই-এর সমন্বয়ই পূর্ণ সত্য, পর সত্য। শ্রীনিত্যগোপাল এই পর সত্যের প্রচার করিয়াই বিশ্বের সর্ব সমস্যার একমাত্র সমাধান-কর্তা। ইহাই তাঁহার জড়-অজড় সমন্বয়ের গভীর তাৎপর্য। তিনি মার্কসের জড়বাদ ও হেগেলের অজড়বাদের সমন্বয় করিয়া জগতে এক নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মার্কস্ ও হেগেল সমন্বিত-মূর্তি'। পৃ: ১৭-১৮।

সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষ দীর্ঘদিন হেগেলকে অনুসরণ করিয়া ভাবিয়াছে, তাঁহাকে বুঝিয়াছে, আবার বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসর হয় মানুষ মার্কস্‌কে বুঝিতেছে, তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিতেছে—কিন্তু মার্কস্-হেগেল সমন্বয়, জড়—অজড় সমন্বয় বোঝা কি আজই সম্ভব? শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এই তত্ত্ব লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবন এই উভয়ধর্মী ঘটনায় পূর্ণ, তথাপি এই সমন্বয়ের কথা তিনি কাহাকেও বলিয়াও যান নাই, শিখাইয়াও যান নাই। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের স্পর্শলাভের এক বৎসরের মধ্যে বদলাইয়া যাইতে থাকিলেন—ক্রমে পূর্বের একটী লাজুক কুণো মানুষ জীবনের সর্ব স্তরে বিপ্লবী হইয়া উঠিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দর আজন্ম পূজ্য শ্রীহুর্গানামে দীক্ষা প্রদান কালে শুধু বলিয়া দিয়া ছিলেন, 'এক বৎসর পরে বদলে দেব'। পরবর্তী কালে একদিন ধর্ম ও দর্শনের আলোচনাকে আর না চালাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুমি কি জান না ভগবান অন্তর্যামীরূপে তোমার যখন যা দরকার বুঝাইয়া দিতেছেন'। তাই দেখি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব স্তরের বিপ্লবকে অনুভূতি বা intuition-এর দ্বারা দিয়া পাইয়াছিলেন, সমাজ রাষ্ট্র ব্যক্তি জীবনের কাছে সে সামগ্রিক বিপ্লবকে উপস্থিত করার জন্য সারা জীবন পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন কিন্তু এমন আমূল পরিবর্তন গ্রহণ করার উপযোগী পরিবেশ তখনও সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া সারা জীবন সে বিপ্লবের আগুনে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার সে তপস্যার আগুন

পরিবেশকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে

[illegible] রাখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব উদ্ধৃতিতে হেগেল মার্কস তথা অজড় ও জড়ের সমন্বয়ের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখিতে পাই জ্ঞান কর্ম ভক্তি প্রেমের সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই একদিকে তাঁহাতে ছিল দুর্লভ ভগবৎপ্রেম, শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁহার নিত্য এবং অপর দিকে সমাজ রাষ্ট্রের জনসাধারণের যাহারা তথাকথিত বিপর্যস্ত বঞ্চিত তাহাদের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদিগকে সর্ব প্রকার শোষণ হইতে মুক্ত করিবার ব্রতে নিজেকে সর্বতোভাবে বিলাইয়া দেওয়ার মত বিরাট প্রাণ। আজ বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান এইখানে যে, মানুষকে যাহা কিছু সহজাত বৃত্তি দিয়া ভগবান তৈরী করিয়া এ বিশ্বে পাঠাইয়াছেন সে সবেরই সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে। কোন একদিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলেই সমস্যার সৃষ্টি হইবে। ভগবানের সঙ্গ অদ্বৈতবোধ বাদ দিয়া শুধু সংসার করিয়া গেলে মহতের ব্যাপক

গভীর আস্বাদন জীবনে পাওয়া যায় না, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সংসার বাদ দিয়া ভগবান লাভের চেষ্টাতে যে পলায়নী মনোবৃত্তির প্রাবল্য আছে তাহাও জীবনের লক্ষণ নয়। এতদিন যাহাদের বিপরীতধর্মী বলিয়াই শুধু জানা গিয়াছিল তাহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত সহজ হইয়া গিয়াছিল, তাই সহস্র মানুষের সঙ্গে তিনি যেমন প্রাণ ভরিয়া মিশিয়া যাইতে পারিতেন একেবারে একান্ত আপন জনের মত, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিতাগোপালের প্রতি ভক্তি ও প্রেমের একান্মতায় আকারে কাঁদিতে পারিতেন, সংসারে কোন কিছুরই জন্য তাঁহার কোন প্রয়োজন-বোধ ছিল না। শ্রীভগবানের সঙ্গে অদ্বৈতবোধের স্বতঃসিদ্ধতা তাঁহার জীবনে থাকায় ভগবানকে পাইবার জন্য তিনি কাঁদেন নাই, কিন্তু মানুষকে উচ্চতর স্তরে মানুষের মত পাইবার জন্য সারা জীবন কাঁদিয়াছেন। তিনি ভগবানের প্রতি প্রেমের একান্মতায় কাঁদিয়াছেন, কিন্তু মানুষকে সুন্দর রূপে পাইবার জন্য কাঁদিয়াছেন।

আমরা যদি পৃথিবীর বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই না যে বিশ্ব জুড়িয়া পরস্পরের মধ্যে বোঝা-পড়া বা সামঞ্জস্যদ্বারা মিলিয়া মিশিয়া বাস করার দিকে একটা প্রবণতা দেখা যাইতেছে? যতই এ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারী হউক না কেন, প্রত্যেক দেশ ও জাতির সাধারণ মানুষ ভিতরে ভিতরে সকলের সঙ্গে মিলিবার প্রবণতাই বোধ করে শত পার্থক্য ও বিরোধীতা সত্ত্বেও। কিন্তু সে মিলের পথ কোথায়? ইহার উত্তর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের নীচের লেখায় আছে-'প্রত্যেকের ধর্মই সকলের ধর্ম, প্রত্যেকের দর্শনই সকলের দর্শন, প্রত্যেক ইষ্টই সকলের ইষ্ট, প্রত্যেক পথই সকলের পথ। প্রত্যেক মানুষ যখন প্রত্যেক ধর্মকে, প্রত্যেক ইষ্টকে, প্রত্যেক পথকে নিজেরই বলিয়া আস্বাদন করিতে হইবে তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকার মিলন সম্ভব। অন্যথা তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার—এ অবস্থায় মিলন একান্তই বাহিরের জিনিষ হইয়া পড়ে। সমন্বয় বলিতে অতখানিই বুঝায়। জীবনকে অতখানি গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেখিলেই অধ্যাত্ম জগতে ও বাস্তব জীবনে একই নীতি অনুসরণের ফলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি মানুষকে একই সঙ্গে এতখানি গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করিতে পারে না। একমাত্র প্রাণের উদার ঔদার্যের মধ্যেই মানুষ এত খানি বড় হইতে পারে। এই পৃথিবীতে এক সময় মানুষ প্রাণসাধক ছিল, কিন্তু সভ্যতার ফল দিয়া ক্রমে সে একান্ত বুদ্ধিমান হইয়া উঠে, তাই ডিপ্লোমেসি আজ আর শুধু রাজনীতিতে নাই—পিতা পুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিবারে পরিবারে ঘরে বাইরে সর্বত্র। এই ডিপ্লোমেসির স্থলে বুদ্ধিকে পরিপাক করিয়া যে প্রাণ-ধর্ম উপনিষদে কীর্তিত হইয়াছে, সেই প্রাণ-ধর্মকে আজ আবার সভ্যতার মধ্যে আনিতে হইবে। ইহাই নিতাগোপালের জীবন-দর্শন।'—(১৩৬২ পৌষ)

স্বজাতীয় বিজাতীয় বিরুদ্ধজাতীয় মানুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস করার প্রবণতা মানুষের মধ্যেই আছে—কেমন করিয়া করা যায় তাহাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রাসলীলা মাধ্যমে প্রস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেখানে যাহা আছে তাহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া

যায় যে প্রতি দুইটী ব্যক্তি সোজাসুজি মিলিতে পারে না যদি তাহাদের মাঝখানে ভগবানকে না রাখা যায়। এই ভগবান বলিতে কতকগুলি কথা বুঝিতে পারি—দুই ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যাপক গভীর কোন সত্তার অস্তিত্ব। ভগবৎ-অবতরণকে সোজাসুজি যদি জীবনে ধারণ করা যায় তাহা হইলে তো আর কথাই নাই কিন্তু সেটা তো খুব সহজ নয়—কিন্তু ইহা ছাড়াও ভাগবতী সত্তাকে আমরা পাইতে পারি—অর্থাৎ ব্যাপকতা গভীরতা সমন্বিত যাহা যতখানি সামঞ্জস্যতা-গুণযুক্ত, তাহাতে ততখানি ভগবৎ-প্রকাশ। প্রতি দুই জনের মাঝখানে যদি পরিবারকে রাখি, সমাজকে রাখি, রাষ্ট্রকে রাখি, বিশ্বকে রাখি—তাহা হইলে পরস্পরের মিলন অনেক সহজ হইবে। যতবেশী ব্যাপকতা ও গভীরতার সমন্বিত সত্তা পাইব, ততই মিলন আনন্দময় হইবে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাই দৃঢ় ভাবে বলেন যে প্রতি মানুষ তাহার ব্যক্তি-সত্তাকে যতই বিকশিত করুক, তাহার বিশ্বরূপ সত্তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত না করিলে কিছুতেই মানুষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, জীবনের আনন্দও তাহার গভীর হয় না। আবার মানুষ যতটা বিশ্বাত্মা হইবে, ততটাই অভয়ও হইতে পারিবে।

জীবনকে এইভাবে দেখিলে ও আচরণে আনিতে পারিলে শোষণহীন সমাজ স্বাভাবিক ভাবেই গড়িয়া উঠিবে—বাহিরের কোন চাপের দ্বারা নয়। জীবনের তাপে জীবন যদি সৃষ্টি হয় আইনের কঠিন নিগড় যেখানে প্রধান নয়, তাহা হইলে সেই জীবন দিয়া যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে তাহা অধিকাংশেই শোষণহীন হইবে, কেননা সব কিছুর সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই সভ্যতা ভেদ-প্রসবিনী বুদ্ধি-ভিত্তিক নহে, উহা হৃদয়ের স্বতঃস্ফূরণ দ্বারা সকলকে গ্রথিত করিবে। হৃদয় শোষণ করিতে পারে না, হৃদয়কে জাগ্রত রাখিতে পারিলে শোষণ আপনিই বন্ধ হইবে। বুদ্ধি ও আসক্তি আপন পর ভেদ করিয়া বিরোধের বীজ বপন করে, কিন্তু অবিকৃত হৃদয় সর্বত্র আপনার কল্যাণ-হস্ত সম্প্রসারণ করিবার ক্ষমতা রাখে অথচ সেই সঙ্গে মানুষ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিষ্কর্মা সুবিধাবাদী হইয়া না পড়ে হৃদয় তাহাও দেখিবার মত যোগ্যতা রাখে। তাই আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে স্মরণ-মননে তাঁহার যে সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রহিয়াও প্রাণের প্রাচুর্য—তাঁহার সেই বিস্ময়পূর্ণ প্রাণকে স্মরণ করি, বার বার স্মরণ করি; মনন করি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ব্যক্তি-সত্তা কেমন করিয়া ব্যক্তি থাকিয়াও নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় পরিণত হইয়া তাঁহাকে পরম সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছিল তাঁহার সেই চিত্তকে। এই স্মরণ ও মনন আমাদিগকে আনন্দ শক্তি ও অভয় দান করিয়া মানুষকে তাহারই অংশীদার করিবার ব্রতে শক্তি দান করিবে। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ নিজেকে সর্বতোভাবে শ্রীশ্রীনিতাগোপালের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আলাদা কোন সত্তাই ছিল না বলা চলে। তাই তাঁহাকে স্মরণ করা অর্থ শ্রীশ্রীনিতাগোপালকেই স্মরণ করা। জীবনের উপাসক, অপরূপ প্রাণ-মাধুর্যের ঐশ্বর্যে ভরপুর নিতাগোপালময় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবনবল্লভকে সাধনা করিয়া পান নাই, তাই নিজেও তিনি সাধনার বস্তু নন। সমস্ত মানুষের কাছেই তিনি একান্ত আপন জন ছিলেন—

আমরা তাঁহাকে সাধনা করিয়া পাই নাই—তিনি আমাদের ডাকিয়া লইয়া ছিলেন—তাঁহার জীবন-বল্লভ সাধন-দুর্লভ শ্রীনিতাগোপালকে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন বর্তমান জগতীর বিশ্বের সমাধানরূপে। সেই সমাধান-বার্তা হেগেল-মার্ক্স সমন্বয়, জড় ও জড়ত্ব সমন্বয়। সেই বার্তা রক্ষা করিতে ও মানুষের কাছে উপস্থিত করিতে যে দায় তিনি দিয়া গিয়াছিলেন, বুড়ি বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল তিনি দেহে নাই, আপনাদের সহযোগিতায় সে দায় বহন করিয়া চলিয়াছি। জীবনের বাকি দিনগুলিতে সে দায় বহন করিবার জন্যও আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। সামঞ্জস্যের সুষমা বর্তমান যুগ-পিপাসা—তাহারই পথ-প্রদর্শক শ্রীনিতাগোপাল-শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আপনাদের কাছে প্রকাশিত হউন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ'র সাধনা

—সন্তোষকুমার অধিকারী

গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে একদিন যিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে অহিংস সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সেই শরৎকুমার ঘোষ তাঁর পরবর্তী জীবনে শ্রীনিতাগোপালের চরণাশ্রয় সম্বল করে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ নামে জীবন সাধনার ব্রত ধারণ করলেন। রাষ্ট্রীয় মুক্তির সংগ্রাম তাঁকে সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রচেতনার ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখে নি; তাঁর হৃদয়কে জীবনের সকল কিছু বন্ধন থেকে পরম মুক্তির সাধনার দিকে অগ্রসর করে দিয়েছে।

ভারতবর্ষ তার ইতিহাসের প্রথম যুগেই সেই সত্য-সন্ধানের সাধনায় ব্রতী হয়েছিল, যে সত্যের আস্বাদন মানুষকে অনাদি ও অনন্ত এক পরম জীবনের উপলব্ধির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে। হিন্দু ভারতের ধর্মবাণী 'গীতা'র যিনি দ্রষ্টা তিনিই পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ। হিন্দু-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সেই অনন্ত ঈশ্বর, যাঁর সীমা নেই, আকার নেই; যিনি নিরপেক্ষ এবং অব্যয়, অথচ লীলা-রসের অন্তহীন উৎসোত্তার মধ্যে তাঁর স্থিতি। কালাশ্রয়ী অথচ কালাতীত সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশেই সর্বজ্ঞানী অর্জুন কর্মকেই জীবন বলে অনুভব করে হাতে গাণ্ডীব তুলে নিয়েছিলেন।

শরৎকুমার সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের গীতার দর্শনকে তাঁর জীবনে তুলে নিয়েছিলেন। তাই শুধু সামাজিক বা ধর্মের বন্ধন নয়, চিন্তার এবং চেতনার সীমা থেকেও তিনি মুক্ত হ'তে চেয়েছিলেন। তিনি জীবনের বৈষয়িক ভোগ থেকে যেমন সরে গিয়েছিলেন, জ্ঞানীর মুক্তির অভিমান থেকেও তেমনি দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। জগতের সঙ্গে যুক্ত থেকেই জগতের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর সাধনা পুরুষোত্তমানন্দর সাধনা।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মের অভিমুখী করেছিলেন। যে কর্ম দেশ ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত। কর্ম-

ইন ভ্যান যে গীতার কথা নয়, এই সত্য তিনি যে-কারণে চোখেছিলেন আমাদের দেশ দীর্ঘকাল মায়াবাদের আচ্ছন্ন থেকেছে। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যাময়, কাজেই জীবনও মায়া। এই বোধ মানুষকে নিষ্ক্রিয় কর্মহীন করেছে। তার ফলস্বরূপ আমাদের সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছে শুধু ক্লেদ এবং গ্লানি। আমাদের জ্ঞানের সীমা কর্মের সঙ্গে বিযুক্ত হ'য়ে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। নদীতে স্রোত না থাকলে নদী সমুদ্রাভিমুখী হ'তে পারে না। বালির চরায় বদ্ধ তার জলে জন্মে শ্যাওলা। জীবনে কর্ম না থাকলে সে জীবনও তেমনি আটকে যায় সঙ্কীর্ণতা এবং সংস্কারের বেড়াজালে। অনন্ত মুক্তির সমুদ্র তার কাছে স্বপ্ন হ'য়ে দাঁড়ায়।

ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ একদিন মানুষকে চলার সাধনা দিয়েছিল, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীকে দিয়েছিলেন আসক্তিহীন কর্মের অনন্ত প্রেরণা। কিন্তু তবুও মধ্যযুগীয় ভ্রান্তি এবং মনের সঙ্কীর্ণ কদাচার একদিন জীবনের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে ফেললো। এই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি না পেলে তো জীবনেরও বিকাশ নেই। তাই পুরুষোত্তমানন্দের সাধনা সমন্বয়ের সাধনা।

সেই সমন্বয় চ'লো সত্যের সঙ্গে সত্যের। অর্থাৎ এক সত্যের সঙ্গে আর এক সত্যের যোগ। জ্ঞানের সত্যের সঙ্গে কর্মের সত্যের মিলন, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এবং ক্ষণিকের সঙ্গে অনন্ত কালের একাত্ম অনুভব।

ভারতবর্ষের মানুষকে এই সমন্বয়ের মন্ত্রে দীক্ষা-দিতেই স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের আবির্ভাব। তিনি 'উজ্জ্বল ভারত'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার চেতনায় জীবনের অখণ্ড রূপ প্রতিভাত হওয়া চাই। 'উজ্জ্বল ভারত'-এর চিন্তা 'কাল'-এর মধ্যে 'কালাতীত'কে পাওয়ার চিন্তা।

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-তিরোভাব-উৎসব : বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ বুধবার (৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৭) কার্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের অবধূত-ভাষ্যকার বিপ্লবী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ১৪-তম তম উপলক্ষে অবধূত মহারাজের পুণ্য সমাধি বাগুইআটি-স্থিত নরনারায়ণ আশ্রমে তাঁহার জীবন-দেবতা ভগবান শ্রীশ্রীনিতাগোপাল দেবের (যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত) সেবা-পূজা হয় এবং মধ্যযুগীয় ভ্রান্তি এবং মনের সঙ্কীর্ণ কদাচার একদিন জীবনের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে ফেললো। এই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি না পেলে তো জীবনেরও বিকাশ নেই। তাই পুরুষোত্তমানন্দের সাধনা সমন্বয়ের সাধনা।

সেই সমন্বয় চ'লো সত্যের সঙ্গে সত্যের। অর্থাৎ এক সত্যের সঙ্গে আর এক সত্যের যোগ। জ্ঞানের সত্যের সঙ্গে কর্মের সত্যের মিলন, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এবং ক্ষণিকের সঙ্গে অনন্ত কালের একাত্ম অনুভব।

ভারতবর্ষের মানুষকে এই সমন্বয়ের মন্ত্রে দীক্ষা-দিতেই স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের আবির্ভাব। তিনি 'উজ্জ্বল ভারত'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার চেতনায় জীবনের অখণ্ড রূপ প্রতিভাত হওয়া চাই। 'উজ্জ্বল ভারত'-এর চিন্তা 'কাল'-এর মধ্যে 'কালাতীত'কে পাওয়ার চিন্তা।

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-তিরোভাব-উৎসব : বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ বুধবার (৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৭) কার্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের অবধূত-ভাষ্যকার বিপ্লবী শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ১৪-তম তম উপলক্ষে অবধূত মহারাজের পুণ্য সমাধি বাগুইআটি-স্থিত নরনারায়ণ আশ্রমে তাঁহার জীবন-দেবতা ভগবান শ্রীশ্রীনিতাগোপাল দেবের (যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত) সেবা-পূজা হয় এবং তাঁহার জীবন-দর্শন স্মরণ করা হয়। এই উপলক্ষে ৬ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৭ রবিবার সকলের সঙ্গে সহযোগে অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। সকাল পাঁচটায় সমবেত প্রার্থনা, ৮ টার মধ্যে শ্রীশ্রীনিতাগোপালের বাল্যভোগ সমাপনান্তে নরনারায়ণ আশ্রমের লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা উত্তোলন, দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীনিতাগোপালের পূজা ও ভোগ অন্তে প্রসাদ বিতরণ, বৈকাল ৪ ঘটিকায় সভায় শ্রীশ্রীনিতা-গোপালের সর্বসমন্বয়-দর্শন এবং উহা কিভাবে শ্রীমৎ

পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা হয়। অধিকাংশ আলোচনাই বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। সভার সভাপতি শ্রীমদ্ভোষ কুমার অধিকারীর মনোজ্ঞ ভাষণ শ্রোতাদের আনন্দ দান করে। বর্তমান রচনায় তাহার স্বল্প প্রকাশিত হইল। দুই স্থলের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী প্রায় সাত শত মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সকাল ৯ টার পর হইতে বিভিন্ন ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের বাণী পাঠ দ্বিপ্রহর একটা পর্যন্ত হইয়াছে।

"মর্ত্য আজ অমৃতকে সৃষ্টি করিতেছে, পচাগলা ধরা আজ গোলোক বৈকুণ্ঠকে পর্যন্ত সৃষ্টি করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিতেছে। মর্ত্যই আজ দেবলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক গোলোক, সর্বলোক-সমন্বিত পুরুষোত্তম-লোক, ব্রজধাম। ইহাই অতিসৃষ্টি, সব সৃষ্টির অতিশয় সৃষ্টি, সৃষ্টির চরম ও পরম সার্থকতা।"

— শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ,
—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ভাষ্য

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা টিপ্পনী ভাষ্য ইত্যাদি ও বিস্তৃত মূল্যবান ভূমিকাসহ। শঙ্কর, শ্রীধর, বলদেব, বঙ্কিম, তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গীতাচার্যগণের মতালোচনা পূর্বক সম্পাদিত। অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা ও ভক্তিমূলক উপসংহার। বৃহত্তম আকারে ও বড় টাইপে মুদ্রিত নূতন সংস্করণ জ্যাকেট সহ কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০ টাকা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, জ্যাকেট সহ ১২·০০ টাকা।

শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শ্রীগীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। "যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলাভাষায় শ্রীজগদীশ চন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে জগদীশচন্দ্রের শ্রীগীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।"—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

গীতার অন্যান্য সংস্করণ

বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	নিত্য পাঠ্য গীতা	
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	সদাপাঠ্য ক্ষুদ্র গীতা	
পদ্য গীতা	২·০০		

জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৫·০০	ভারত-আত্মার বাণী	
কর্মবাণী	১·০০	Soul of India speaks	

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	মানুষের মত মানুষ	
বিজ্ঞানে বাঙালী	৭·৫০	বিদ্যাসাগর	
বাংলার কথা	৭·৫০	ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের	
বাংলার বিদুষী	৪·০০	শরীর ও শক্তি	
রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৮·০০	সরল যোগ-ব্যায়াম	৩·০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	যোগ-ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৩·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত

ব্যবহারিক শব্দকোষ

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিধান অভিধান। শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রে সি ডে সি লা ই ব্রে রী ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—৭৩

Central Regd. No. R. N. 2571/57 Phone No. 57-2540 UJJWALBHARAT

ভূমাকে ভূমির মধ্যে উপলব্ধিই উপলব্ধির পূর্ণতা। দেহহীন আত্মা যেমন অবাস্তব, ভূমিহীন ভূমার উপলব্ধিও তেমনিই অর্থহীন। দুইকে একত্র করিয়া পাওয়াই পাওয়ার চরিতার্থতা। সে সংবাদ আছে নীচের বইগুলিতে।

"On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this world-community. Religious men will be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man namely the exploitation of man by man.

Occasional Speeches—Radhakrishnan

—ধার্মিক কি করে বিপ্লবী হতে পারে, কি করে একজগৎ রচনার কাজে, মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ দূর করার কাজে নিযুক্ত হতে পারে, তার খোঁজ পাবেন নীচের বইগুলিতে—

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ॥

॥ মুদ্রিত ॥

১।	ব্রহ্মসূত্র (অবধূত ভাষ্য)	
	১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	৫·০০
	২য় খণ্ড (২য় অধ্যায় পর্যন্ত)	১২·০০
	৩য় খণ্ড (৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত)	১০·০০
২।	ঈশোপনিষৎ	৩·০০
৩।	কেনোপনিষৎ	২·০০
৪।	কঠোপনিষৎ	৫·০০
৫।	প্রশ্নোপনিষৎ	২·০০
৬।	ঐতরেয়োপনিষৎ	২·০০
	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৭।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	
৮।	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	
	মুণ্ডকোপনিষৎ	
৯।	শ্রীনিতগোপাল—দর্শনে ও জীবনে	১·০০
১০।	স্বরাজের পূর্ণরূপ	·৫০
১১	গীতাজয়ন্তী	·৫০
১২।	উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ (পুস্তিকা)	·৫০
১৩।	মহাত্মাজীর গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-দৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচনা (গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত)	৩·০০
১৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০

॥ পাণ্ডুলিপি ॥

১। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ

৩। দশ বৎসরের দিনপঞ্জী, পত্রাবলী ভাষণ ইত্যাদি।

॥ ৺ প্রতিভা রায়ের ॥

১।	নারী-গতির অন্তকথা	৩·০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-শিষ্য নিতাগোপাল চক্রবর্তী ও শিষ্যা সুধাদত্তর কথা	·৩১
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

॥ শ্রীমতী রেণু মিত্রের ॥

১।	সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিতগোপাল	২·০০
২।	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে	১·০০
৩।	শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত

৪।	রবীন্দ্র-হৃদয়	৫·০০
৫।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাঁশুই আটী, পো: অশ্বিনীনগর, (ভাষা-দেশবন্ধুনগর কলিকাতা ৫৯। ২৪ পরগণা

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম বাঁশুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর কলিকাতা-৫৯ হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং সেন্টার (C/o জে, বি, লাইব্রেরী) পো: হাতিয়াড়া হইতে মুদ্রিত।